মেয়েদের নিজস্ব পত্রিকা

সুকন্যা

১৬ – ৩০ এপ্রিল ১৯৮৫

কর্মরতা মেয়েদের আবাসন সমস্যা

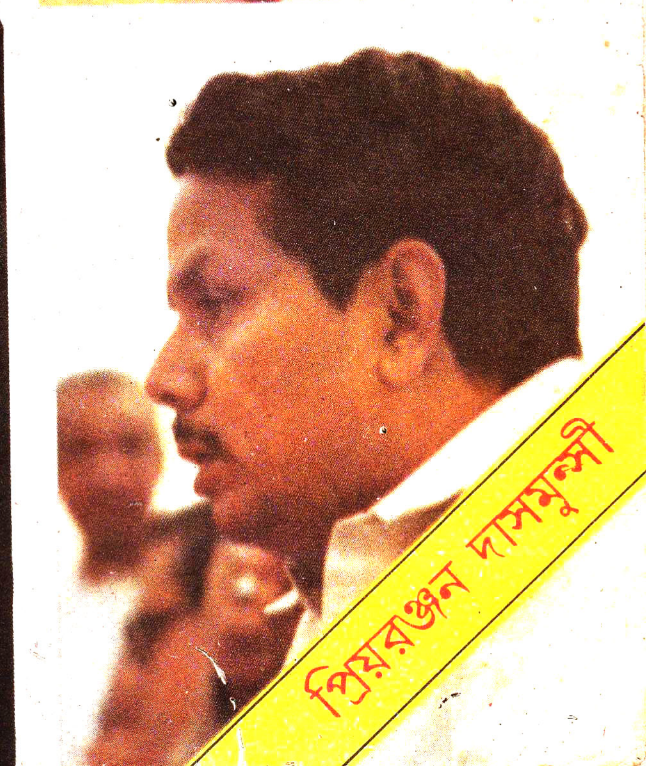
মুসলিম মেয়েরা অনেক স্বাধীন

এন্টারটেইনার রবি শাস্ত্রী





খ্যাতির আড়ালে জ্যোৎস্না দত্ত



প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ নিলয় হাজরা

স্ক্যান ঃ দেব কুমার দেব

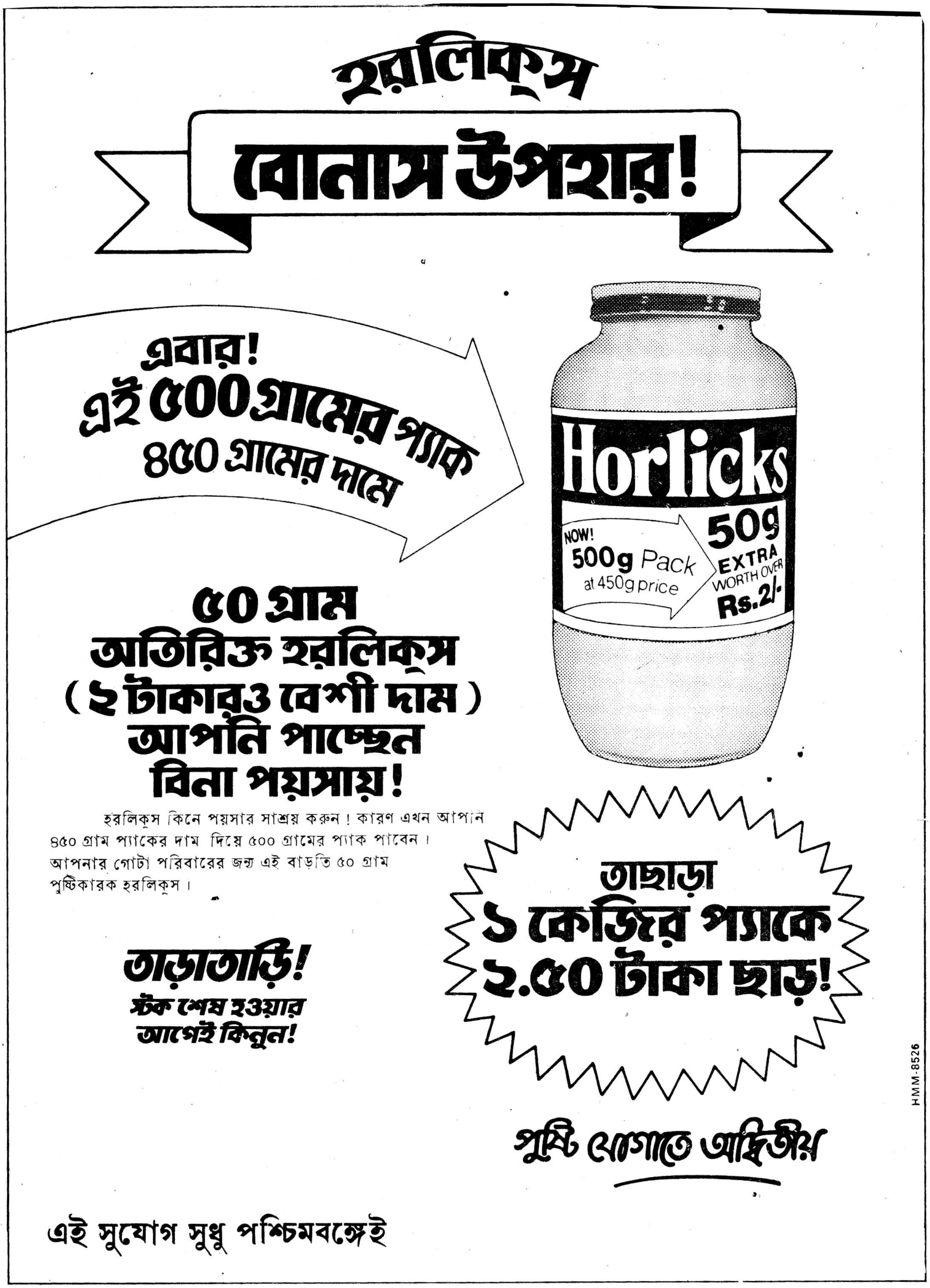
এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com


'ঠোঁটদুটি মোর হাসিমাখা যেন পাকা টুকটুকে চেরীফল,
অন্তর মম খুশি-উচ্ছল সদ্যফোটা শতদলে।'
ল্যাক্‌মে লিপস্টিক।
সবচেয়ে বেশী রকমের রঙের সম্ভার !
মেট্যালিক্‌স্‌, গ্লীমার্‌স্‌ আর এক ধরনের
বিশিষ্ট ন্যাচারাল ! আরো মোলায়েম—মসৃণ,
আর সবচেয়ে সমান গ্লস। সবচেয়ে সুন্দর
ঠোঁটের মিষ্টি হাসির জন্যে — ল্যাক্‌মে !
রূপ ঝলমল, অন্তর খুশি-উচ্ছল করতে ল্যাক্‌মে।
Lakmé
Rediffusion/L/2815a BN



হরলিক্স
বোনাস উপহার!
এবার!
এই ৫০০ গ্রামের প্যাক
৪৫০ গ্রামের দামে
Horlicks
NOW!
500g Pack
at 450g price
50g
EXTRA
WORTH OVER
Rs.2/-
৫০ গ্রাম
অতিরিক্ত হরলিক্স
(২ টাকারও বেশী দাম)
আপনি পাচ্ছেন
বিনা পয়সায়!
হরলিক্স কিনে পয়সার সাশ্রয় করুন ! কারণ এখন আপনি ৪৫০ গ্রাম প্যাকের দাম দিয়ে ৫০০ গ্রামের প্যাক পাবেন । আপনার গোটা পরিবারের জন্য এই বাড়তি ৫০ গ্রাম পুষ্টিকারক হরলিক্স ।
তাড়াতাড়ি!
স্টক শেষ হওয়ার
আগেই কিনুন!
তাছাড়া
১ কেজির প্যাকে
২.৫০ টাকা ছাড়!
HMM-8526
পুষ্টি যোগাতে অদ্বিতীয়
এই সুযোগ সুধু পশ্চিমবঙ্গেই

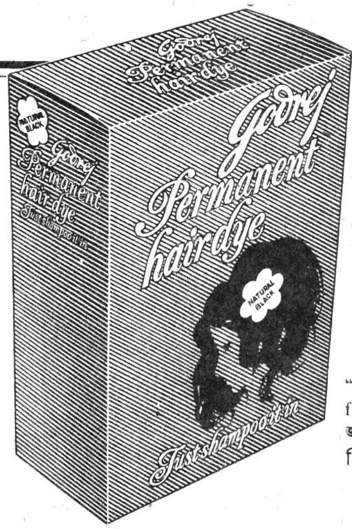
গোদরেজ হেয়ার ডাই

নিমেষের মধ্যে আপনাকে কম বয়সী দেখানোর এক সহজ উপায়

নিমেষের মধ্যেই যদি অনেক কম বয়সী আর অনেক বেশী সুন্দর দেখাতে পারা সম্ভব হয়, তাহলে আর বয়সের জন্যে চিন্তা ভাবনা কেন ?

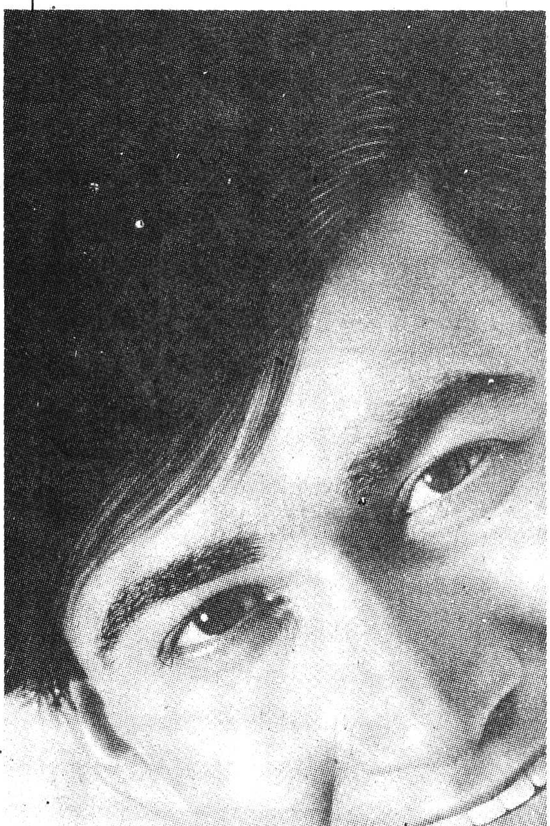
গোদরেজ আপনাদের জন্যে এনেছে এই আপনা থেকে ছড়িয়ে পড়া একমাত্র হেয়ার ডাই। না মাখামাখি, না হাঁকাহাঁকি. না ঝামেলা-ঝক্কি, এই গোদরেজ আপনা থেকে চুলের একেবারে গোড়া পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

আপনার পছন্দমতটি বেছে নেবার জন্যে পাবেন, স্বাভাবিক কালো ও গাঢ় খয়েরী রঙে, যা দিয়ে আপনার চুল হয়ে উঠবে তারুণ্যপূর্ণ ও স্বাভাবিক সুন্দর। আর, এর অপরূপ সুগন্ধিত কণ্ডিশনার আপনার চুলকে ক'রে তুলবে সুরভিত ও স্বাভাবিক দোলদোলানো!



Godrej
পার্মানেন্ট
লিকুইড হেয়ার ডাই

"How Godrej takes away your worries from hair dyeing" বিনামূল্যে এই পুস্তিকার জন্যে DEPT:CPD/SU তে নীচের ঠিকানায় লিখুন—





ভারতের সবচেয়ে বেশী বিক্রীর হেয়ার ডাই!

গোদরেজ সোপস্ লিমিটেড, কনজিউমার প্রডাক্টস্ ডিভিশন, ইস্টার্ণ এক্সপ্রেস্ হাইওয়ে, ভিক্রোলি বম্বে-৪০০ ০৭৯

CLARION/21/244 BEN

সুকন্যা

বর্ষ ১ সংখ্যা ২১/১৬ – ৩০ এপ্রিল ১৯৮৫/৩ – ১৭ বৈশাখ ১৩৯২

সম্পাদকীয়

নারীর অধিকার নিয়ে আমরা গত সংখ্যায় কিছু আলোচনা করেছিলাম। আমরা উদাহরণস্বরূপ গার্গী, লক্ষ্মীবাঈ, দুর্গাবতী প্রমুখের কথা উল্লেখ করি। অনেকের ধারণা হয়েছে আমরা কেবল হিন্দু সমাজের কথাই বলতে চেয়েছি। এর সহজ উত্তর দেওয়া যেত : হিন্দু, না ওরা মুসলিম ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন।

উত্তর না দিয়ে আমরা এই সংখ্যায় মুসলমান মেয়েদের সম্পর্কে একটি তথ্যপূর্ণ রচনা প্রকাশ করলাম। ছোট হলেও এই রচনা প্রচলিত অনেক ধারণাই ভেঙে দেবে। পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ শত শত বছর আগে মুসলমান মেয়েদের সম্পর্কে নানা বিধান দিয়ে যান। পয়গম্বর সম্ভবত তৎকালে তাঁর সমাজে নারীদের নানা দুঃখ দুর্দশা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কোরানে কী লিখিত আছে, আর তা কতটুকু সমাজ মানে তিনি তাও প্রত্যক্ষ করেন। এবং তদনুযায়ী তিনি নির্দেশ দেন।

পয়গম্বরের কথা শুধু মুসলিম সমাজ নয়, আমাদের ধারণা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীকেও সুস্থ ও সুখী হতে সাহায্য করবে। আমরা কোরান পড়ি, আমরা গীতা পাঠ করি, পড়ি রামায়ণ, মহাভারত; পড়ি বাইবেল। মাঝে মাঝে মনে হয় – কেন নিয়মিত এসব পাঠ ! এসবের নির্দেশ, আদর্শ যদি লঙ্ঘন করি তবে সবই বৃথা।

যুগে যুগে মানব বা মানবী রূপ নিয়ে এসেছেন ঈশা মুশা, খ্রিস্ট, হজরত, মীরাবাঈ, রামকৃষ্ণ প্রমুখ। এঁদের আবির্ভাবের বহু আগে যা-কিছু ভাল ছিল, যা-কিছু কল্যাণকর ছিল নানা কারণে মানুষ তার ভুল ব্যাখ্যা, ভুল নির্দেশে চালিত হয়ে বিপথে যাচ্ছিল। এঁরা এসে বললেন, আসল পথ কী। বললেন সত্য ও ন্যায়ের কথা। জানালেন নারী কখনও পুরুষের পদানত নয়। তারা ভোগের সামগ্রী নয়, তারা নয় দাসী। কিন্তু পরিতাপের কথা, বেদনার কথা – আমরা আজও সচেতন হইনি। তা না হলে কেন আর একজন সুতপা নাগকে দেখব এই জীবন্ত ('মুমূর্ষু' নয়) কলকাতায় ! সচেতন হলে, গীতা, কোরান, বাইবেল মানলে নারী নির্যাতন, বধূহত্যা হতে পারে না। কিন্তু কবে সেই সুদিন আসবে !

১ মে সুকন্যা সাজসজ্জা ও পোশাক সম্পর্কে আকর্ষণীয় নানা রচনা ও রঙিন ছবির সম্ভার নিয়ে 'বিশেষ সংখ্যা' হয়ে বের হবে। রূপকে ফুটিয়ে তোলার নানা অজানা তথ্য থাকবে এই সংখ্যায়।

সূচীপত্র

সম্পাদিকা : গীতা চৌধুরী

শিল্প-উপদেষ্টা : নিতাই ঘোষ

প্রতি সংখ্যা তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা
বিমান মাশুল পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা, ভারতের অন্যান্য স্থানে ৪০ পয়সা

সম্পাদকীয় দপ্তর ও রেজিঃ অফিস : ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০৭২,

দিল্লি অফিস : সূর্যকিরণ ভবন, ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, ফ্ল্যাট ১২১২, নতুন দিল্লি ১১০ ০০১ ফোন : ৩১ ২০২৪

মতামত

মুসলিম নারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলাম

অনুদার মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় মুসলিম নারীগণের প্রতি অনাদর, অবহেলা ও দাবিয়ে রাখার ঘটনা, অথবা এ নিয়ে আলোচনা বিভিন্ন দৈনিক কাগজে ও পত্রিকায় বহুবার করা হয়েছে। এবার নীনা আতাহার-এর 'এই বাংলার মুসলিম নারীসমাজ' প্রতিবেদনটি ১৬-১৮ ফেব্রুয়ারির 'সুকন্যা'য় পড়লাম। লেখাটি ভালো লাগলো এবং মুসলিম নারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলাম।

আমাদের মহল্লায় কিছু মুসলমান আছেন, যাঁরা স্ত্রীর প্রতি একটা কর্তব্যে অবশ্যই সচেতন। তা হল – প্রতি বছর সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা প্রয়োগ। পৌরুষত্বের তেজস্বিতায় নিজের বিবিকে মাতৃত্বের অধিকারী হতে বঞ্চিত করেন না। ধর্মের দোহাই দিয়ে স্ত্রীর অসম্মতিতে বা রুগ্ন স্ত্রীর উপর জোর করে আর এক সন্তানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ায় কি বীরত্ব তা আজও বুঝি না! স্ত্রীর মানসিক দিকের প্রতি পুরুষ-শাসন সর্বদাই যেন তার রক্তচক্ষু দেখিয়ে থাকে। কোনো মুসলিম নারী কম বা বেশি বয়সের হোন না কেন, পাড়ায় বা বড় জলসায় কণ্ঠ সংগীত পরিবেশন করছেন – নৈব নৈব চ। আর নাটক বা নৃত্য তা যেন জাহান্নমে যাবার শামিল। নারীসমাজের বিকাশ এতে চিরতরে রুদ্ধ হয়ে আছে। অথচ কত অঙ্কুরিত প্রতিভা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। বেগম আখতার, পরভিন সুলতানা – এমনি বিশিষ্ট কয়েকজন ছাড়া সংগীত জগতে মুসলিম নারীর অবদান কম। অথচ বলতে গেলে, আজকের শাস্ত্রীয় সংগীত ছাড়াও সংগীতের অন্যান্য বিভাগে মুসলিম সমাজের পুরুষেরা লালনপালন ও অগ্রগতির পুরোধা। অগুনতি মুসলমান গুণী ব্যক্তি আজও এই সংগীতকে নিখুঁতভাবে জিইয়ে রেখেছেন। তাহলে জন্মগত শিল্পী এই নারীসমাজের কাছে শিল্পকলা অচ্ছুতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে কেন? কল্যাণীদাত্রীদের শক্ত বাঁধনে না বেঁধে মুক্তির মন্ত্রে মঙ্গলময়ীর আসনে বসালে তবেই তো মুসলিম সমাজ কুসংস্কারের অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে নতুন রূপ ধারণ করবে। সে রূপ নিঃসন্দেহে লাভ করবে এই মহৎ প্রয়াসের সার্থকতা।

ঈশানচন্দ্র মিশ্র
মমতা মিশ্র
কিরিবুরু,সিংভূম, বিহার

অরুন্ধতী হোম চৌধুরীর বক্তব্য প্রসঙ্গে

আপনাদের পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত পাঠিকা। গত ১৬–২৮ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় 'কেমন করে সংগীতশিল্পী হলাম' এই শিরোনামে সংগীতশিল্পীদের ইন্টারভিউগুলি পড়লাম। পরিকল্পনাটি আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে। এইজন্য আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু ওই শিরোনামে অরুন্ধতী হোম চৌধুরীর সাক্ষাৎকার পড়ে আমার কিছু বক্তব্য জানাচ্ছি। শ্রীমতী হোম চৌধুরী তাঁর সংগীতশিক্ষা জীবনের প্রতিটি শিক্ষকেরই নাম করেন এবং তাঁর গাওয়া প্রথম রেকর্ডের কথাও উল্লেখ করেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, তিনি তাঁর প্রথম যে-রেকর্ডের কথা উল্লেখ করেছেন, তা সম্পূর্ণ ভুল। তাঁর প্রথম রেকর্ডটি আমার কাছে আছে। সেটি হলো COLOMBIA রেকর্ড 45 R.P.M. দু পিঠে দুটি ভাটিয়ালী গান আছে। এক পিঠে "ও তুফান তুফান রে" এবং আরেক পিঠে "আমার মন দুখে পরান না বাঁচে"। ওই রেকর্ডের মধ্যেই লেখা আছে ঃ সংগীত পরিচালনায় হেমাঙ্গ বিশ্বাস; রচনা – প্রাচীন সংগ্রহ। তাছাড়া হেমাঙ্গ বিশ্বাসের রচনা ও শিক্ষায় আরো একটি গান একটি লং প্লে রেকর্ডের মধ্যে গেয়েছেন। গানটি হলো "তোরা বল্ সখী বল্ বল্"। ওই 45 R.P.M. রেকর্ডটিই তাঁর জীবনের প্রথম রেকর্ড।

আমি আগরতলার মেয়ে। এখন কলকাতায় থাকি। অরুন্ধতী হোম চৌধুরীকে অনেক আগে থেকেই জানি। আমি ওনার গুণমুগ্ধ অনুরাগী। কিন্তু ওনার সাক্ষাৎকারের মধ্যে কোথাও হেমাঙ্গ বিশ্বাসের নাম নেই দেখে সত্যিই অবাক লাগছে। সর্বজন-শ্রদ্ধেয় হেমাঙ্গ বিশ্বাসের প্রতি সামান্য কৃতজ্ঞতা জানালে তাঁর সংগীত জীবনের কি কোনো ক্ষতি হত? ওনার জীবনের প্রথম রেকর্ড হেমাঙ্গ বিশ্বাসের পরিচালনায়। এ-কথা অস্বীকার করে উনি কি নিজে ছোটমনের পরিচয় দিলেন না?

এই ধরনের মানসিকতার একজন শিল্পী কখনো বড় হতে পারেন না। আমি ওনার অনুরাগী। আশা করবো এই ধরনের ত্রুটি উনি স্বীকার করবেন ও ভবিষ্যতে তা শুধরে নেবেন।

দীপন্বিতা নিয়োগী
চিত্তরঞ্জন পার্ক, যাদবপুর
কলকাতা – ৩২

'ঘরে-বাইরে' ঃ সন্দীপের চরিত্রচিত্রণ

সুকন্যায় প্রকাশিত (১৬-৩১ মার্চ সংখ্যা) 'ঘরে-বাইরে' ছবি প্রসঙ্গে কণা সেনের চিঠিটি পড়ে খুবই ব্যথিত হলাম। ছবি যে ভাল বা মন্দ তা ব্যক্তিবিশেষের উপলব্ধির মাধ্যমেই বিচার্য হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে পত্রলেখিকার উপলব্ধিতে শুধু ছবিটি মন্দই নয়, একেবারেই বিকৃতিতে ভরা। সন্দীপের চরিত্রচিত্রণ দেখে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'দেশব্রতীর ধ্বজাধারী এই দুর্বৃত্তকে পরদায় দেখলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও আঁতকে উঠতেন...।'

আমার মনে হয়, পত্রলেখিকা 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসটি ভাল করেই পড়েছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখন এবং কেনই বা এই উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন এবং কি উপলব্ধিতে রবীন্দ্রনাথের কলমে সন্দীপ চরিত্র সৃষ্টি হয়েছিল সে-সম্বন্ধে সম্যক ধারণা তাঁর নেই। কিন্তু একথা ঠিক যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে নিযুক্ত থেকে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার পথভ্রষ্টতাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় তথাকথিত দেশপ্রেমিকদের চাটুভাষণ, মন-কাঁপানো তেজী ভাষণ, নির্লজ্জ দুঃসাহস, সস্তা রাজনীতির ফাঁপা আদর্শকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেই তিনি 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন। এবং সে কারণেই সন্দীপ চরিত্রটির মাধ্যমে তিনি এমন কিছু দেখাতে চেয়েছিলেন যা স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য ছিল না। তাই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির সূত্র ধরে সত্যজিৎবাবুর মনের আয়নায় সন্দীপ সম্পর্কে যে-চিত্রটি ফুটে উঠেছিল তারই বাস্তবরূপ ছবিতে প্রতিফলিত হয়েছে। সে-কারণেই আমরা সন্দীপকে চিত্রে একটু স্বতন্ত্র ধরনের দেখেছি, যা উপন্যাসে ছিল না।

একথা বলা সমীচীন হবে না যে, সত্যজিৎ রায় অকুশলী পরিচালক, অথবা 'ঘরে বাইরে' ছবিটি অকুশলী রূপায়ণের জন্য ত্রুটিযুক্ত হয়েছে। আসলে নিজস্ব ধ্যানধারণায় সত্যজিৎবাবুর হয়ত সন্দীপ বা নিখিলেশ সম্পর্কে চিন্তাভাবনায় কিছু ভুল ঘটেছে, তাই পত্রলেখিকার মত অনেকেরই মনে হয়েছে, উপন্যাসের থেকে চিত্রে স্বতন্ত্র এই চরিত্র বা চরিত্রগুলি।

কান ফেস্টিভালে ছবিটি পুরস্কৃত

সরবত রুহ-আফজা খেয়ে হোন তরতাজা

* গ্রীষ্মের দাবদাহ, ক্লান্তি আর আলস্য কে দূরে সরিয়ে সরবত রুহ-আফজার তৃপ্তির আমেজে ডুবে যান।
রুহ-আফজা, সঞ্জীবনী সেই সব উপাদানে ভরপুর যা মানুষের দেহে আনে নতুন শক্তি, আর করে তোলে, কঠিন পরিশ্রমের যোগ্য।
* রুহ-আফজা সরবতে, কমলা এবং আনারসের শুদ্ধ রসের সঙ্গে গাজর, তরমুজ ও পালং শাক নিংড়ে তার রস ও মেশানো আছে—যা আপনার শরীরে ভিটামিন যোগায়।
* রুহ-আফজার প্রত্যেক বোতলে ৭৫০ মি.লি. সরবত থাকে। বোতলে ভরা এই নির্যাস খুবই গাঢ়। তাই অন্য সরবতের চেয়ে কম খরচ হয় এবং সস্তা পড়ে।
* রুহ-আফজা আপনাকে অসহ্য গরম, তৃষ্ণা আর সর্দিগর্মির মতন ব্যাধি থেকে বাঁচায়।

সরবত রুহ-আফজা
৭৫ বছরের অধিক কাল যাবৎ সকলের মনের মতন সরবত।



Hamdard
সরবৎ
রুহ আফ্জা
ভেষজ গাছ-গাছড়া, জীবন দায়ী উপাদান আর প্রাকৃতিক ভিটামিনে তৈরী এক অপূর্ব মিশ্রণ।
HWL-8263 BEN

হয়নি বলে পত্রলেখিকা খুশিই হয়েছেন। আমার মনে হচ্ছে খুশির কারণটা হল অন্যত্র। আসল কথা হল, সন্দীপ সাহেবদের দৃষ্টিতে পড়লে তৎকালীন দেশপ্রেমিকদের কিছু কিছু মেকি দেশপ্রেম ধরা পড়ত এবং সেক্ষেত্রে ভারতবাসী হিসেবে আমাদের লজ্জার সীমা থাকত না। সেই সুবাদে আমিও খুব খুশি যে, ছবিটি পুরস্কৃত হয়নি।

বাসুদেব বাগ
বেদিয়াপাড়া লেন
কলকাতা – ৭৭

নারীর যোগ্য সম্মান দিতে শিখলাম না

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ও মেয়েদের ইমেজ' শীর্ষক প্রতিবেদনটির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। প্রতিবেদনটির এক জায়গায় উল্লেখ করা আছে, 'যে কোনো গণমাধ্যমেই মেয়েদের ব্যবহার করা হোক না কেন, সেখানে তাদের শরীর ও সৌন্দর্যকেই একমাত্র মূলধন করা হয়। তাদের সৃষ্টিশীলতা কিংবা কর্মক্ষমতাকে যথাসম্ভব গৌণ করে রাখা হয়।'

লেখিকার এই সুচিন্তিত বক্তব্যকে শুধু আমি কেন, যে কোনো সুস্থ বিবেকবান মানুষ সমর্থন করবেন – তাতে সন্দেহ নেই। ১৯৭৫ সালকে সারা বিশ্ববাসী মহা ধুমধামে 'আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ' হিসেবে পালন করলেন। অত্যন্ত দুঃখের এবং লজ্জার বিষয়, আজ নয় বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও নারীর যোগ্য সম্মান আমরা দিতে শিখলাম না। এখনো আমরা নারীর নগ্ন রূপকে বিজ্ঞাপনে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করছি। যদিও বিজ্ঞাপিত বস্তুর সঙ্গে নারীদেহের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, নারীর নগ্নরূপ দেখিয়ে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের প্রতি ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বিজ্ঞাপনদাতাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেইজন্য বিশেষ এক সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীরা বলে থাকেন, 'অন্দরমে জো ভী হো বাহারকা লেবেল চকমকি হোনা চাহিয়ে।' বলা বাহুল্য, এই চকমকির অর্থই হলো সুন্দরী নারীর নগ্নরূপকে তুলে ধরা।

কোথাও দেখা যায়, চায়ের দোকানে, পান-বিড়ির দোকানে অর্ধনগ্ন নারীর ছবি ঝোলানো আছে। সিগারেটের বিজ্ঞাপনে কিংবা টায়ারের বিজ্ঞাপনেও নগ্ন নারীর ছবি দেখানো হয়, যেখানে নারীর ছবি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না। এটা যে নেহাত পুরুষের গোপন মনে খুব সতর্কভাবে নারীর প্রতি রোমাঞ্চের সৃষ্টি করা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যদি শাড়ির বা ব্লাউজের বিজ্ঞাপনে নারীর ছবি থাকে (নগ্ন ছবি নয়) তাহলে বেমানান হয় না, বা সমালোচনার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যদি দেখি বিজ্ঞাপিত বস্তুর সঙ্গে নারীদেহের কোনরকম মিল নেই, অথচ সেখানে অর্ধনগ্ন নারীর ছবি দেওয়া আছে – তখন স্বাভাবিক-ভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে, এই কি সভ্যতার রূপ? যখন নারীমুক্তি আন্দোলনের জন্য আমরা সোচ্চার হয়ে উঠেছি, তখন নারীর আদর্শ মর্যাদাকে জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের নগ্নরূপকে বিজ্ঞাপনে প্রচার করে ব্যবসায়ে লাভের অঙ্ক বাড়াবার উদ্দেশ্যে একশ্রেণীর অসাধু কান্ডজ্ঞানহীন ব্যবসায়ীরা উঠেপড়ে লেগেছেন। ওইসব স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা ভুলে যান, একটা দেশ বা জাতি তখনই ধ্বংস হয়, যখন সেই দেশ বা জাতি নারীর যোগ্য মর্যাদা দিতে ভুলে যায়। সুতরাং দেশ তথা জাতির স্বার্থেই বিজ্ঞাপিত বস্তুর সঙ্গে অথবা বিজ্ঞাপনে নারীর ছবি দেওয়া বন্ধ করার জন্য শীঘ্রই আইন তৈরি হওয়া উচিত।

পরিশেষে যে মেয়েরা বিজ্ঞাপনে ছবির মডেল হিসেবে নিজেদের নগ্ন যৌবনকে প্রকাশ করছেন, তাঁদের কাছে অনুরোধ রাখছি – আপনারা নারী হয়ে নারীর আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করবেন না।

নিতাই দেবনাথ
বারুজীবী কলোনি, হুগলি

সুকন্যার আকর্ষণ আরো বাড়ুক

আমি আপনাদের হিসেবমত 'সুকন্যা' নই। রবীন্দ্রনাথের সাধারণ মেয়ের মতই সাধারণ একজন গৃহিণী এবং (দুই) ছেলে ও মেয়ের মা। আপনাদের সুকন্যা পত্রিকাটি পেয়ে আমি ভীষণ আনন্দিত। চিঠির মাধ্যমে আমার কতগুলি অসুবিধার কথা আপনাদের জানাচ্ছি। এই অসুবিধাগুলি যদি দয়া করে পূরণ করেন, তবে আমরা খুবই উপকৃত হব। আপনারা যে শীতের পোশাক অথবা ক্রুশের ডিজাইন দিয়ে থাকেন তাতে আমরা খুব আনন্দিত। কিন্তু যদি ছবিগুলো পরিস্কার এবং লেখাগুলো আরও সহজ করে দেন তবে আমাদের বড়ই সুবিধা হয়। প্রতি সংখ্যায় যেন এ সম্বন্ধে লেখা থাকে। আর তার সঙ্গে ভাল ভাল খাবার রান্না করার উপায় প্রত্যেকবারই যেন দেওয়া হয়। আজকালকার পাঠক-পাঠিকা অত্যন্ত সচেতন ও উৎসাহী। নানান পত্রপত্রিকা পড়ে নিজেকে ওয়াকিবহাল রাখেন তাঁরা। সুকন্যার আকর্ষণ তাঁদের কাছে কমিয়ে দেবেন না, এই অনুরোধ করছি।

উপরি উক্ত সমস্যাগুলির সমাধান করলে একজন পাঠিকা হিসাবে আনন্দিত হব। গল্প বিভাগটিকে যদি

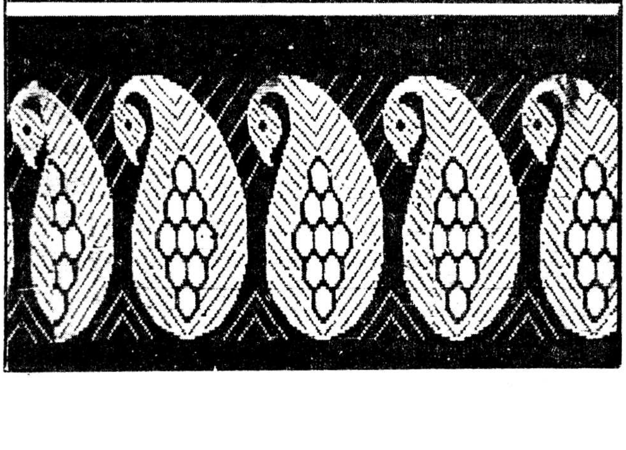
সুকন্যা

১ মে ১৯৮৫ সংখ্যা

বিশেষ সাজসজ্জা ও পোশাক সংখ্যা

সুকন্যার আগামী ১ মে ১৯৮৫ সংখ্যাটি বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। এতে বিশেষভাবে থাকছে রূপচর্চা, সাজসজ্জা আর পোশাক নিয়ে নানা আকর্ষণীয় ও প্রয়োজনীয় রচনা। ত্বক, চুলের পরিচর্যার সঙ্গেই থাকবে রূপকে ফুটিয়ে তোলার গোপন কথা। শাড়ির নানা বৈচিত্র্যের সঙ্গে থাকছে তার তথ্যবহুল ইতিহাস। শুধু সাজ নয়, আচার-আচরণ, সর্বোপরি ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলার আলোচনাগুলিও হবে আকর্ষণীয়। আজকের ফ্যাশনের জগতের সন্ধান পেতে হলে ঐ সংখ্যাটি আপনাকে পড়তেই হবে।

এই বিশেষ সংখ্যায় অন্যান্য রচনা ও নিয়মিত বিভাগগুলোও থাকছে। আর হ্যাঁ, দামও থাকছে একই।



আপনি কি ভালো রোজগার করার স্বপ্ন দেখেন ?

এবং তা একটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে !



পশ্চিমবঙ্গ এবং সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে 'পরিবর্তন', 'সুকন্যা', 'খেলার আসর' ও 'কিশোর মন' পত্রিকার জনপ্রিয়তা সন্দেহাতীত। এই পত্রিকাগুলির যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও পাঠকেরা অভিযোগ করেন তারা সময়মত এবং নিয়মিত পত্রিকা পান না। আমাদের স্থির বিশ্বাস এই অঞ্চলে বিক্রি বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ আছে।

এই অঞ্চলের যে সমস্ত উদ্যমী যুবক আমাদের পত্রিকাগুলির বিক্রি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আমাদের সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছুক, তাঁরা অবিলম্বে চিঠি লিখে জানান কী ভাবে এই কাজে আপনি সফল হতে পারেন।

মনে রাখবেন, ইত্যাদি প্রকাশনী আপনাদের সামনে বাড়তি রোজগারের সুযোগ এনে দিচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই সুযোগ কলকাতা এবং হাওড়া অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

আরো জানাই, আমাদের নতুন দৈনিক পত্রিকা 'সুপ্রভাত' এই বছরের শেষ দিকে প্রকাশিত হবে। কাজেই সফল এবং উদ্যমী ব্যক্তির রোজগার তখন আরো বৃদ্ধি পাবে।

আপনাদের চিঠি পাবার পর মনোনীত ব্যক্তিদের এই পরিকল্পনাটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হবে।

সার্কুলেশন কন্ট্রোলার

ইত্যাদি প্রকাশনী লিঃ ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট কলকাতা ৭২

আরো একটু জোরালো করেন অর্থাৎ ভাল হাতের গল্প দেন, তাহলে আরও ভাল হয়।

আমি জানি, সুকন্যার রচনাগুলির উদ্দেশ্য জ্ঞানদান নয়, সঙ্গদান অথবা অবসরের দারুণ জমজমাট আসর। তাই প্রতি মাসে দুটি সুকন্যা না পড়ে থাকতে পারি না।

'শ্রাবন্তীর কলম' পড়লাম। ভালই লাগছে। ওঁকে চিঠি দিয়ে মাঝে মাঝে বিরক্ত করব।

ডলি ঘোষ
পুরুলিয়া

মেয়েদের অগ্রগতি প্রতিফলিত হোক

আপনাদের 'সুকন্যা' আমি প্রথম দিনটি থেকেই একেবারে নিজের বলে মনে করেছি। এবারের ১৬–৩১ মার্চের 'সুকন্যা' পড়ে ভীষণ ভাল লাগল। এত জিনিস আপনারা আমাদের জানবার সুযোগ করে দিচ্ছেন, এজন্য সত্যিই আমি খুব কৃতজ্ঞ। 'কলকাতার মহিলা পুলিশ বাহিনী' রচনাটির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। ভাবতে ভাল লাগে, যুগে যুগে যে মেয়েরা শুধুই মার খেয়েছে নানাদিক থেকে, আজ সেই মেয়েরা কত এগিয়ে এসেছে। সমাজে আজ তারা শুধু উপেক্ষার নয়, অবহেলার নয়, রীতিমত সম্মানের ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিতা। এইরকম লেখার মাধ্যমে মেয়েদের আপনারা আরও তুলে ধরুন।

রমা গুপ্ত
শরৎ চ্যাটার্জি রোড
হাওড়া – ৩

পত্রপত্রিকার বিনিময়ে আগ্রহী

দেশের এবং বিদেশের যে-কোনো পাঠক-পাঠিকা ভাইবোনের সঙ্গে পত্রপত্রিকা বিনিময় করতে ইচ্ছুক। কোনো পাঠক-পাঠিকা ভাইবোন যদি সুকন্যা'সহ অন্যান্য বাংলা পত্রপত্রিকা পাঠান, তাহলে আমি তাঁর পছন্দমত পরিবর্তন' বা অন্যান্য পত্রপত্রিকা পাঠাতে রাজি আছি এবং সেইসঙ্গে বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

দিলীপ সরকার
পো: বড় জাগুলী
গ্রাম: সুরেন্দ্রনগর
জেলা: নদীয়া

সুকন্যার প্রতি

প্রিয় সুকন্যা,

'মেয়েদের নিজস্ব পত্রিকা' – এই শব্দ তিনটি আমাকে ১৯৮৪ সালে তোমার কাছে টানেনি। ১৯৮৫ সালের প্রথমেই তুমি যখন 'মায়েরা সন্তান মানুষ করতে জানেন না' এই প্রচ্ছদ কাহিনী নিয়ে বের হলে তখন কাগজওয়ালার কাছ থেকে তোমার একটা কপি কিনে পড়লাম। পড়ে বিস্মিত ও অভিভূত হলাম। 'কন্যা' হিসাবে তুমি যে কত 'সু', কত ক্ষমতার অধিকারিণী, তা বুঝলাম যখন মাসের প্রথমে ও মাঝামাঝিতে তুমি আসতে লাগলে, অর্থাৎ আমায় বাধ্য করলে গ্রাহক হতে। প্রত্যেকবারে তুমি হাজির হলে নতুন মহিমায়, নতুন গরিমায়। যা আমরা দেখেও দেখতে চাইনি বা দেখার প্রয়োজন বোধ করিনি, তোমার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সে-সবই জীবন্ত রূপ ধারণ করল। প্রসঙ্গক্রমে 'জেলখানায় মহিলা কয়েদীরা' উল্লেখ্য। তুমি নাছোড়বান্দার মত এইগুলো আমাদের গোচরে আনলে। উপস্থাপনার বৈচিত্র্যে তোমার পরিচালকরা যে স্বাদ আমাদের পরখ করতে দিচ্ছেন তার মূল্যায়ন শুধু 'প্রশংসা' দিয়ে করলে তোমার 'মানহানি' হয়, অন্তত আমার তাই মনে হয়।

চাঁদের কলঙ্কের ন্যায় ছাপার ভুল তোমাকে কিছুটা কলঙ্কিত করছে। গত ১৬–২৮ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় 'কলকাতার দুজন মডেল' এই শিরোনামে রোমা ফুটনানি-র পরিচয়ে চতুর্থ প্যারায় '...ইংরেজি অনার্স নিয়ে বিয়ে পাশ করেন।' এই বাক্যে 'বি. এ.'-র জায়গায় 'বিয়ে' ছাপা হয়েছে। এই ভুলটা দৃষ্টিকটু নয় কি? আশা করি পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে এই ধরনের ভুল তোমার কাছ থেকে আর পাবো না।

সামনের সংখ্যাগুলিতে তো কিছু অদল-বদল হচ্ছে। বেশি সংখ্যায় আকর্ষণীয় ফিচার সম্বলিতা হয়ে তোমার আরেক রূপ দেখার জন্য অপেক্ষায় রইলাম।

সুমন মুখোপাধ্যায়
নিউ টাউন (বার্নপুর)
বর্ধমান

সুকন্যার দৃষ্টি হোক আরও উজ্জ্বল

১৬ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা খুলেই চোখে পড়ল ক্রিকেটের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র মহম্মদ আজাহারউদ্দিনের সুন্দর একপাতা জুড়ে ছবিটা। শরতের শিউলি ফুলের মতই এই ছবিটা মনপ্রাণ ভরিয়ে দেয়।

তবে অনিরুদ্ধবাবুর লেখাটা খুব হালকা মেজাজের হয়ে গেছে। আশা করি ভবিষ্যতে আমাদের প্রিয় 'সুকন্যা'র দৃষ্টি হবে আরও উজ্জ্বল।

মৌসুমী চৌধুরী
চৌধুরী বাজার, বর্ধমান


আপনার বাচ্চাকে
দিন সেরেল্যাকের পুষ্টি!
এখন
পাওয়া যাচ্ছে
নতুন প্যাকে
চার মাস বয়েস হলেই দুধের সংগে সংগে আপনার বাচ্চার শক্ত খাবারেরও দরকার। আর এই সময়েই ওকে দিন সেরেল্যাকের পুষ্টি।
পুষ্টিকর গুণমান ঃ সেরেল্যাকের প্রতিটি ফীডের মধ্যেই আছে সব কিছু যা আপনার বাচ্চার পুষ্টির জন্যে দরকার। এতে আছে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, ভিটামিন আর খনিজ পদার্থ। বাচ্চাদের জন্যে ঠিক যেমনটি দরকার সেই অনুযায়ী এগুলি সুসম অবস্থায় থাকে।
অল্প সময়ে তৈরী ঃ বাচ্চার খিদে পাওয়ার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সেরেল্যাক তৈরী। এতে দুধ আর চিনি দেওয়াই আছে। আপনি শুধু ফোটানো জলে সেরেল্যাক গুলে নিন।
খেতে ভাল ঃ প্রথম শক্ত খাবার ধরাতে গেলে সেটা বাচ্চাদের কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা। সেরেল্যাকের স্বাদ বাচ্চাদের খুব পছন্দ। অতএব এটা দিয়ে সুরু করাই ভাল। তৈরী করার যে স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি টিনের গায়ে লেখা আছে সেই অনুযায়ী তা তৈরী করে আপনার বাচ্চাকে সুসম পুষ্টি যোগান।
বিনামূল্যে শিশুর বৃদ্ধিসূচী ঃ
আপনার বাচ্চার জন্যে একটা বৃদ্ধি পুস্তিকা এই ঠিকানায় চেয়ে পাঠান-
সেরেল্যাক, পোস্ট বক্স ৩
নিউ দিল্লী ১১০০১৮
Nestlé
Cerelac
instant milk cereal
Wheat
Already contains milk just add to water
Nestlé
সেরেল্যাকের মমতা : পুষ্টিতে সম্পূর্ণ-স্বাদে অপূর্ব
SAA/FSL/C/3799 BEN



পরিতোষ সেন

জগৎবিখ্যাত শিল্পী পিকাসোর কাছ থেকে পরিতোষ সেন লাভ করেছিলেন তাঁর কাজের সমাদর। স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে একদিন ঢাকা শহরের যে তরুণটি মাদ্রাজের আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীকে চিঠি লিখে তাঁর স্নেহ আকর্ষণ করেছিল এবং দেবীপ্রসাদ যাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন, পরবর্তী জীবনে দেশবিদেশের অসংখ্য সম্মান পুরস্কারে ক্রমপরিণত সেই পরিতোষ সেন প্রমাণ করেছেন দেবীপ্রসাদ প্রকৃত জহুরি ছিলেন। আমেরিকা, রাশিয়া, লন্ডন, প্যারিস, ব্রাসেলস সহ য়ুরোপের নানান জায়গায় তাঁর ছবির প্রদর্শনীতে এসেছেন অগণন শিল্পানুরাগী। প্রবীণ বয়সে তিনি আর একবার চমকে দিলেন শিল্পের অন্য এক দিগন্তে। তুলির পাশে কলমও উঠে এল তাঁর হাতে। তাঁর লেখা সম্পর্কে কবি বিষ্ণু দে যথার্থ লিখেছেন, 'তাঁর কবিত্বপূর্ণ বিবরণ আমাদের মুগ্ধ করে – বারে বারে পড়ে পুরনো হয় না।' সম্প্রতি শিরোমণি পুরস্কারে সম্মানিত চিত্রশিল্পী পরিতোষ সেন ও লেখক পরিতোষ সেনের চোখে নারী সম্পর্কিত এক অন্তরঙ্গ আলোচনা এই লেখাটির বিষয়।

'নারীর মাতৃরূপের ভূমিকা আমার কাছে মস্ত বড়'

পরিতোষ সেন

'ভেজা কাপড়, খোলা চুল বাঙালি রমণীর এই বিশেষ ভঙ্গির ছবি দেখেছি হেমেন মজুমদারের তুলিতে। ছবি দেখতে দেখতে মনে হয়েছে দৃশ্যটাতে কোথায় যেন একটা খুঁত থেকে গেছে, রূপের প্রাণটাকে ঠিক মতো ধরা যায়নি। আসলে আমার এই বড় হয়ে ছবি দেখার চোখটা বোধহয় আমার ছেলেবেলার দেখা গ্রাম-বাংলার দৃশ্যের সঙ্গে কিংবা পরে দেখা শহরের বাড়ির কলতলার দৃশ্যের সঙ্গে ঠিকমতো মিলিয়ে নিতে পারছিল না।' পরিতোষ সেনের এই পরিচ্ছন্ন বিশ্লেষণের মধ্যে থেকেই তাঁর নারীর রূপ দেখার অকপট দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। বোঝা যায় চিত্রশিল্পী হিসেবে তিনি অন্য ঘরানার মানুষ।

ঢাকায় একান্নবর্তী পরিবারে মানুষ হয়েছেন পরিতোষ সেন। স্কুলের ড্রয়িং টিচারের উৎসাহে আঁকার জগৎটার জন্যে ভালবাসা গড়ে উঠেছিল। লেখাপড়া ফেলে ঘরে দরজা দিয়ে ছবি এঁকেছেন এবং তার জন্যে মারধোরও খেয়েছেন অভিভাবকদের কাছে। বাবা দুবার গিয়েছিলেন বিলেতে। মাত্র সাত বছর বয়সে সেই বাবাকে হারিয়েছেন পরিতোষ সেন।

শীতকাল হলে ঢাকায় ঘুড়ি ওড়ানোর হুজুগ উঠতো। গরিব বড়লোক সবাই মেতে উঠত সে হুজুগে। অনেকগুলো ঘুড়ির দোকান ছিল খুব কাছেই। ঘুড়ি তৈরি করত মুসলমান হিন্দু দুই সম্প্রদায়ের লোক। পুজো পার্বনের সময় এরাই করত সব ডাকের সাজের কাজ। তরোয়াল মুকুট বানাতো এরাই। ওদের শিল্পকর্ম খুব টানত তাঁকে। আমাদের মৃৎশিল্পীদের দেবী প্রতিমা নির্মাণের স্বভাব সৌন্দর্য দেখেছেন সেই অল্প বয়সেই। দেবীমূর্তির নিতম্ব বা বক্ষদেশ গঠনে নারী সৌন্দর্যের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকে কোনো অনুশাসনেই তাঁরা আড়াল করেননি।

'আমাদের শিল্পে এই রাখা ঢাকা ব্যাপারটা – স্বাভাবিকতা থেকে সরে আসার চলনটা ভিক্টোরিয়ান অ্যাটিচ্যুডের ফল। ভারতীয় ভাস্কর্য তো মুসলমান প্রভাবেই হারিয়েছিল নারী অবয়বের এই প্রাকৃত সৌন্দর্য। আর ভিক্টোরিয়ান রক্ষণশীলতার প্রভাবে অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল ঘরানার ছবিতেও নারীরা হয়েছেন যৌবনশূন্য – ডি-সেক্সড।'

পরিতোষ সেন মনে করেন, এই লজ্জাবোধ শিল্পের সত্যকে নষ্ট করেছে অনেকটা। নারীকে তার সহজাত সৌন্দর্যে না দেখতে শিখলে তাকে আংশিক দেখা হয়। ছোটবেলা থেকে মেয়েদের খুব কাছ থেকে দেখার মধ্যে দিয়ে, আলো বাতাসের মতোই সে দেখাকে জড়িয়ে নিতে শিখেছেন জীবনের মধ্যে। তাকে আড়াল করে অকারণ গুরুত্ব দেওয়াকে একধরনের বিকৃতি বলেই মনে করেছেন।

'আমাদের শিল্পীর চোখে নারীমূর্তির সেই স্বাভাবিকতাকে আবার আমাদের কাছে এনে দিয়েছেন রামকিঙ্কর। রামকিঙ্করের হাতে ফিরে এসেছে অবিকৃত নারী প্রকৃতি। কোণারকের সুরসুন্দরীর মধ্যে যে স্বভাব সৌন্দর্য সেই অকৃত্রিম রূপপ্রাণ তাই আছে রামকিঙ্করের সাঁওতাল রমণীর মধ্যে। তাঁর ছবিতেও পরিপূর্ণ যৌবনা আছে খুব স্বাভাবিকভাবেই। কোনো আড়াল রাখেননি। শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথের আঁকা কয়েকটি নগ্ন নারীচিত্রে আছে এই প্রাকৃত শিল্পশক্তি।' একথা বলতে বলতেই পরিতোষ সেন স্পষ্টতই জানালেন নারী প্রতিকৃতি রচনায় এই ডি-সেক্সড করার ব্যাপারটা হল রীতিমত ভণ্ডামি। লুকোচুরি। না দেখিয়ে আরো বেশি করে নজর কাড়া। বাইরে এক ধরনের সাধুতার আবরণ। রমরমে হিন্দি ছবিতে যা হয় – খানিকটা চাপা দিয়ে সেদিকেই চোখ টানে। সরাসরি না দেখানোটা অনেক বেশি মারাত্মক।

কৃত্রিমতার সঙ্গে কোনোরকমের আপস করতে চান না পরিতোষ সেন। যদিও একই সঙ্গে প্রাকৃত সৌন্দর্য ও অবসেশনের দূরত্বে তিনি

সচেতন। সময়ের বিচিত্র তরঙ্গ মিশে থাকে তাঁর ছবির আত্মায়। ছবির বিষয়ের মতো সমকাল বিচিত্রা হয়ে ওঠে তাঁর লেখার বিষয়। তাই তাঁর ছবি শুধুমাত্র নারীমুখী না হয়ে, হয়ে ওঠে অনেক বিষয়ের মধ্যে বিশেষ একটি বিষয়। স্বদেশ ও বিদেশ পৃথিবীর দুই গোলার্ধের নারী মূর্তি তাঁর অনুধ্যানের গভীরে এলেও তাঁর ছবিতে শিল্পস্পর্শ পায় বাঙালি নারী।

পরিতোষ সেন যখন ছবি লেখেন, তখন তাঁর সেই সাহিত্যরচনাতেও ধরা পড়ে নারী সৌন্দর্যের অনুপুঙ্খ ঐশ্বর্য। ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে নবাববাড়ি গেছেন। নবাববাড়ির চিকিৎসক হিসেবে অন্দরমহলে বাবা যেতেন যখন, বাবার সঙ্গে ছসাত বছরের বালক পরিতোষ সেনও সেখানে গেছেন অনেকবার। পর্দার বাইরে সেখানে দেখেছেন বেগম শাহাজাদিদের। 'জিন্দাবাহারে' আছে সেই রূপসীচিত্র, 'এই অসাধারণ রূপসীদের ছবি তেলরঙে আঁকা বাতিচেল্লির ভেনাসের মত আমার হৃদয়ের চিত্রশালায় আজও ঝুলছে। এ যে সব রূপকথার মানুষ। রক্ত মাংসে গড়া মানুষ কি এতই সুন্দর হয়। এ কি মানুষ, না ফুল। নাকি কোনো ফুলের বাগিচা। এমন-কোনো বাগিচার দিকে তাকিয়েই কি মির্জা গালিব লিখেছেন, 'তমাশা এ গুলশন, তমন্না-এ চিদন' অর্থাৎ ফুলবাগিচার রূপ দেখতে চাই, আবারফুল তুলতেও চাই। কী কোমল কৃশতনু। গণ্ড যেন সদ্য পাড়া রৌদ্রচুম্বিত কোনো বেহস্তের আপেল। দেহের বহিঃরেখা যেন কাল-বৈশাখীর বিদ্যুতের মতো, শুধুই বক্ররেখার নির্যাস – থেকে থেকে ঝিলিক মারে। সপ্ত সিন্ধুর উত্তাল ঢেউয়ের মতো কেবল উত্থান আর পতন। দেহের রঙও সিন্ধুর ফেনার মতোই ধবধবে। সুর্মায়-ঘেরা তাদের হালকা রঙের চোখগুলো যেন রাতের আকাশে নক্ষত্রের নীল ফুল। ত্বক যেমনই মসৃণ তেমনই আঁটসাঁট। সবমিলে নিখুঁত সুরে বাঁধা আঁটো তারের একটি বাদ্যযন্ত্র। হাত দিলেই ঝনঝনিয়ে উঠবে। বিকল্প কত উপমাই তো মনে আসে – ওস্তাদ কারিগরের হাতে বারুদ ঠাসা সদ্য তৈরি তুবড়ি। এটাই বা মন্দ কী। দেশলাইয়ের কাঠি ছোঁয়ালেই হয়। শোঁ-শোঁ করে কত রকম রূপোলী তারা – রুনকি ঝিল্লি ছড়াতে ছড়াতে আকাশে উঠে মেঘের গায়ে ঠেকবে। নিম্নগামী হয়ে কত পিয়াসী তরুণের হৃদয়ে আগুন ধরিয়ে দেবে।'......

১৯৭৭ সালে ব্রিটিশ পেইণ্টস-এর উদ্যোগে ওদের পার্ক স্টিট প্রদর্শনী কক্ষে পরিতোষ সেনের 'অন্তঃসত্ত্বা নারী' সিরিজের চল্লিশটি ছবি সাজানো হয়েছিল। শিল্পীর কথায়, 'এই অবস্থায় নারী পায় পূর্ণতা। তখন তাকে আমার মনে হয় সবচেয়ে সুন্দর। চীনে কালিতে আঁকা ছিল ছবিগুলো। ২২+৩০ মাপের। সেইসব বাঙালি নারী অবয়বের কোনো নারীসুলভ সৌন্দর্য বা আবেদনই আমি লুকোইনি। স্বভাব সৌন্দর্যের প্রকাশকে আমি শিল্পীর বড় কাজ বলে মনে করি।'

'নারীর মাতৃরূপের ভূমিকা আমার কাছে মস্ত বড়। মার মতো এমন কাছের, এমন আপন আর কেই বা হয়? স্ত্রীদের মাতৃরূপ তাই আমার কাছে খুব সম্ভ্রমের। আমার লেখাতে এটা এসেছে বেশি, ছবিতে তেমন আসেনি।'

এদেশে মেয়েদের চারুকলাবিদ্যাচর্চা প্রসঙ্গে পরিতোষ সেন জানালেন, অনেক মেয়েই শুরু করেন কিন্তু বহুজনই তাঁদের মধ্যে খানিকটা এগিয়ে আর চর্চা রাখতে পারেন না এটা দুঃখজনক। উনি লক্ষ্য করেছেন এখানকার চারুকলা বিদ্যালয়ে মেয়েরা ভর্তি হয় অনেক। কিন্তু বিয়ে করবার পর অনেকেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় অবস্থার চাপে। অন্তঃসত্ত্বা হলে বাধা তো আছেই। এরপর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ফিরে আসা মুশকিল হয়। কেউ কেউ যে আসে না তা নয়, তবে দেখেছি অধিকাংশই আসতে পারে না। অথচ সংখ্যায় কম হলেও এখানে মেয়েদের মধ্যে কারো কারো শিল্প প্রতিভা অনেক স্বনামধন্য পুরুষ শিল্পীকে ছাপিয়ে যায়।

১৯৫৭ সালে ডিসেম্বরে পরিতোষ সেনের দাম্পত্য জীবনের শুরু। স্ত্রী জয়শ্রী সেন রাণী বিড়লা কলেজের অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপিকা। ছবি ভালবাসেন। স্বামীর প্রতিটি কাজই তাঁর উদ্দীপনা ও প্রেরণাধন্য।

এ মুহূর্তে নারী নিয়ে নতুন কোনো সিরিজ করার পরিকল্পনা পরিতোষ সেনের নেই। তিনটি গ্রন্থ প্রকাশের পর উনি ভাবছেন এখন চতুর্থ গ্রন্থ প্রকাশের কথা। তাঁর লেখা সম্পর্কে সত্যজিৎ রায় মন্তব্য করেছেন, 'পরিতোষবাবুর চিত্রশিল্পের সঙ্গে আমাদের পরিচয় অনেক দিনের। সম্প্রতি তিনি মাঝে মাঝে তুলির পরিবর্তে লেখনীর সাহায্যে ছবি আঁকতে শুরু করেছেন। এ কাজে তাঁর যে নতুন পরিচয়টা পাওয়া গেল সেটা যুগপৎ বিস্ময় ও পুলকের উদ্রেক করে।'

ভেজা কাপড়ের কোনো তন্বীর যে চিত্র তিনি রচনা করতে পারতেন তাঁর তুলিতে, সে চিত্র তাঁর কলমেও হয়ে ওঠে কেমন প্রাণময়! – 'ভেজা কাপড় মেয়েটির গায়ে লেপ্টে থাকার দরুন তার শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ যেন একটি ফুলের বিভিন্ন পাপড়ির মতো আলাদা সত্তা নিয়ে সরল বৃন্তটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। একেকটি পাপড়িই যেন একেকটি ফুল। বাকি মেয়ে ক'টির মতো তার কাঁখেও বুড়িগঙ্গার জলেভরা পেতলের কলসী। এই কলসী এবং নিতম্ব, দুই-ই মিশে একাকার হয়ে আছে। দুই-ই টলমল। এমনই সুন্দর সাবলীল এবং বেপরোয়া তার চলার ভঙ্গি যে মনে হয় কোনো নিঃশব্দ সংগীতের সঙ্গে তাল রেখে পা ফেলছে বা এ-পা ফেলার ঢং যেকোনো ওস্তাদ নর্তক-নর্তকীর ঈর্ষার বস্তু হতে পারে তাতে সন্দেহ কী। এই চালে একটি সোনার বাটির মতো তার বক্ষস্থল ঈষৎ নেচে উঠছে। আরেকটু নাচলেই হয়তো করতালের মতো বেজে উঠবে। যে মেয়ের উদ্ভাসিত রূপ পৃথিবীর তাবৎ পুরুষদের সমস্ত সূর্যকিরণকে সজীব করে তোলে, তার কোথা থেকেই শুরু করি, আর কোথায়ই বা শেষ করি।'.....

পাঁচবার য়ুরোপ আমেরিকা পরিভ্রমণে পরিতোষ সেন পাশ্চাত্য নারীর রূপ কম খুঁটিয়ে দেখেননি। আমেরিকায় তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়েছে দুবার। প্যারিস, ব্রাসেলস ও লণ্ডনে একবার করে। ওঁর কথায়, 'আমাদের দেশের প্রকৃত সুন্দরী কোনো নারীর ধারে কাছে আসতে পারে এমন রূপসী পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে। কথাটা আমি নিশ্চয়ই আমার দেশ বলে আলাদা টানে বলছি না। বলছি নিরপেক্ষভাবে খুব ভেবে চিন্তেই। যদিও অ্যাভারেজ পশ্চিমী মেয়েদের যৌন আবেদন বেশি। ওরা রীতিমত শরীর চর্চা করে সে আবেদন ফুটিয়ে তুলতে। তবু আমার কাছে বাঙালি মেয়েদের রূপের টান আলাদা। স্নানের পর খোলাচুল, লাল পেড়ে শাড়ি পরা – কপালে মস্ত বড় সিঁদুরে টিপ – সেই শাশ্বত রূপের কাছে – আজকের সবরকমের আধুনিক পোশাকের বৈচিত্র্য এবং যৌন আবেদন প্রকাশ করার সমস্ত রকমের কলাকৌশল সস্তা মনে হয়।'

'যেহেতু আমি শিল্পী, আমার চোখ কান নাক খোলা রাখতে হয়। যে বিশেষ নজরে দেখি একটা সুন্দর গাছ কিংবা সুন্দর কোনো ফুলকে অথবা শরতের মেঘ ভাসানো আকাশকে, সেই বিশেষ নজরেই দেখি সুন্দরী কোনো নারীকে। এখনো ভাল লাগে মেয়েদের সান্নিধ্য, অবশ্যই এ ভাল লাগার সঙ্গে আমার অবিবাহিত যৌবনকালের ভাল লাগা, – তাদের কাছে পেতে চাওয়ার ভাল লাগার, তফাত অনেকটা।'

আজকের সমাজে মেয়েদের যতটা পরিবর্তন হয়েছে পরিতোষ সেন, সেটাকে যথেষ্ট বলে মনে করেন না। পুরুষের সঙ্গে, অধিকারের প্রশ্নে, মেয়েদের তথাকথিত তফাতটা কোনোক্রমেই থাকা উচিত নয়। আমাদের মধ্যে, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সমাজে একটা ভণ্ডামি আছে মেয়েদের ব্যাপারে। সেটা সরে গিয়ে অবস্থা যত স্বাভাবিক হবে ততই মঙ্গল। নিজের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেই দেখেছেন মেয়েদের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিটা কীরকম রক্ষণাত্মক। মেয়ে পছন্দ করে বিয়ে করলে দোষের অথচ ছেলের বেলায় সেটা দোষের নয়।

কথায় কথায়, সম্প্রতি কলকাতায় শিল্পী হুসেনের এক প্রদর্শনীর পরিপ্রেক্ষিতে হুসেন সাহেবের এক মন্তব্যের প্রসঙ্গে পরিতোষ সেন বললেন, 'আমার ছবিতে আমি যা করি তা হুসেনের ছবির মেজাজ থেকে পুরোপুরি আলাদা। হুসেনের জীবনের চাহিদা থেকে আমার জীবনের চাহিদা স্বতন্ত্র।' শুধুমাত্র নারীসঙ্গম কালেই যিনি ঈশ্বরপ্রাপ্তির আনন্দ পান সেই হুসেন সাহেবের মতো শিল্পী পরিতোষ সেন কখনোই মনে করেন না, 'শিল্পের একমাত্র প্রেরণা নারী সঙ্গম।'

সাক্ষাৎকার : সুনীল দাশ

ছবি : অভিজিৎ দাস


এবার আপনি কেয়ো-কার্পিন চুলে
নতুন নতুন রূপে প্রতিদিন
টপনট বাঁধার দিন
বিনুনী বাঁধার দিন
খোঁপা করার দিন
পোনি টেলের দিন
চুল খুলে রাখার দিন
ফ্রেঞ্চ রোলের দিন
ইচ্ছে মতন বাঁধার দিন
আপনার চকচকে সুন্দর কেয়ো-কার্পিন চুল নিয়ে যা খুশী তাই করুন।
কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল আপনার চুলের পুষ্টি যোগায় অথচ মাথায় তেলমাখা চটচটে ভাব আনে না। চুল থাকে সুন্দর, পরিপাটি।
আধুনিক সাজে সাজতে হলে তাই আর তেলমাখা বন্ধ করতে হবে না। রোজ কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল মাখুন—চুল থাকবে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও সুগন্ধী। আর সপ্তাহের প্রতিদিন নতুন ধাঁচে চুল বেঁধে নতুনরূপে নিজেকে আবিষ্কার করুন।
আপনার চুল সুস্থ ও সুন্দর রাখে অথচ চটচটে করে না।
A HAIR OIL OF DISTINCTION
DEY'S MEDICAL STORES LTD.
কেয়ো-কার্পিন
সুগন্ধী হেয়ার অয়েল
১০০ এবং ৩০০ মি.লি. শিশিতে পাওয়া যায়
Dey's যাদের যত্নই আপনার আস্থা
CLARION C-DMHO-2

কর্মরতা মেয়েদের আবাসন সমস্যা

শুধু পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলা থেকেই নয়, ভিন রাজ্যেরও অনেক কুমারী ও বিবাহিতা মহিলা কলকাতায় চাকরি করতে আসেন, এঁদের অনেকেরই কলকাতায় নির্ভরযোগ্য কোনো বাসস্থান নেই।

এই মহিলাদের আবাসন সমস্যা কিভাবে মিটছে? কোথায় এঁরা থাকেন? রাজ্য সরকারের এই মহিলাদের আবাসন সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনাই বা কি? ভিন রাজ্য ও জেলা থেকে আসা কর্মরতা মহিলারা বেসরকারি হোস্টেলগুলোতে থাকাকে কি নিরাপদ মনে করেন? এইসব সমস্যা ও প্রশ্নের ভিত্তিতে অনুসন্ধানমূলক এক প্রতিবেদন।

মানুষের জীবনে সমস্যার শেষ নেই। আজ একটা মেটে তো কাল আর একটার সৃষ্টি। এই শহর কলকাতায় বিদ্যুৎ, পরিবহণ, রাস্তা-ঘাট, স্বাস্থ্য ইত্যাদির বিষয়ের নানা সমস্যার 'মোকাবিলায়' সরকারের যেখানে দম ফেলার সময় নেই সেখানে 'সুকন্যা'-র পক্ষ থেকে চাকুরে মেয়েদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আর এক সমস্যার দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা কেন, এই প্রতিবেদন পড়ে এমন প্রশ্ন হয়তো কেউ কেউ করতে পারেন। তা করুন, কিন্তু ভুলে গেলে চলবে কেন চাকুরে মেয়েরাও এই সমাজেরই অংশীদার ; অন্য গ্রহ থেকে আসা আলাদা কোনো জীব নয়।

শখ করে আর যেই চাকুরি করতে আসুক না কেন অধিকাংশ মেয়েই যে সংসারের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে চাকরির পথে পা দেন একথা সর্বজনস্বীকৃত।

এখন চিন্তা করুন, শিলিগুড়ির একটি মেয়ে কলকাতায় চাকুরি পেলেন ; অথচ কলকাতায় থাকার মতো তাঁর কোনো আত্মীয় নেই, নেই বন্ধু-বান্ধব চেনা পরিজন। চাকরিটাই মেয়েটির অবসরপ্রাপ্ত পিতার সংসারে একমাত্র আলোকবর্তিকা। কাজেই ওই চাকরিতে যোগ দেওয়ার দিন থেকে মেয়েটি থাকবেন কোথায়? কলকাতা-শিলিগুড়ির নিত্যযাত্রী হওয়া নিশ্চয়ই কি পুরুষ কি মহিলা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। তাহলে উপায়? উপায় হচ্ছে মেস, বোর্ডিং বা ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেল খুঁজে বার করা এবং সেখানে নিজের থাকার একটা সুব্যবস্থা করা। যত সহজে কথা কটা লেখা গেল বাস্তব চিত্র কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। সর্বত্রই একই কথা, ঠাঁই নেই। যদিও-বা প্রাইভেট মেসে ঠাঁই মেলে কিন্তু দক্ষিণা মাসের অর্ধেক মাইনে, এর সঙ্গে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো বড্ড গোলমেলে, তার উপর মেসের পাড়াতুতো ভাই ও দাদাদের নিত্য নতুন আবদার ডিয়ারনেস অ্যালাউন্সের মতো ঊর্ধ্বমুখী।

চাকুরে অবিবাহিতা মেয়েদের আবাসন সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা অনেক দিনের। চিন্তাটা প্রথম আসে পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মাথায়। তখন দেশভাগের কাজ শেষ, দলে দলে ওপার বাংলা থেকে ছিন্নমূল মানুষ এপার বাংলায় চলে আসছেন। পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে পায়ের তলায় মাটি খুঁজতে গিয়ে মেয়েরা জীবন সংগ্রামের পথে নেমে পড়লেন। ধীরে ধীরে ডালহাউসি পাড়ায় অফিসের টেবিলে একজন দুজন করে মেয়েদের মুখ দেখতে পাওয়া শুরু হল। সেই সঙ্গে ওই মেয়েদের পক্ষ থেকে বড় দাবি হিসেবে দেখা দিল একটু নিরাপদ আশ্রয়ের। 'সারা ভারত মহিলা কংগ্রেসের' কাছে এই দাবি পৌঁছল এবং মহিলা কংগ্রেস উদ্যোগী হয়ে এই কাজে নেমে পড়লেন। সঙ্গে পেলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে। মহিলা কংগ্রেসের চেষ্টায় এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরিকল্পনায় কলকাতায় ক্রিস্টোফার রোডে প্রথম গড়ে উঠল চাকরিজীবী অবিবাহিতা মেয়েদের জন্য আবাসন। এরই সমসাময়িক আরও দুটি ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেল কলকাতায় গড়ে উঠল—তার মধ্যে একটি গোলপার্কে, অন্যটি বাগবাজারে। প্রথমটির পরিচালন ভার ছিল সারদা সংঘের হাতে, দ্বিতীয়টি চালাত কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট নিজেই। অনেক জল গড়াবার পর গোলপার্কের ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলটি ১৯৭৫ সালে রাজ্য সরকারের হাউসিং ডিপার্টমেন্ট অধিগ্রহণ করে এবং সরকারি পরিচালনায় এটিই চাকুরে অবিবাহিতা মহিলাদের একমাত্র নিবাস।

স্বাতন্ত্র্য থেকে পঁচাশি এই দীর্ঘ আঠাশ বছরে ভিন রাজ্য বা জেলা থেকে চাকুরে অবিবাহিতা মেয়েদের আবাসন সমস্যা আরও দীর্ঘায়িত হয়েছে কিন্তু রাজ্য সরকার নতুন করে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের জন্য গোলপার্কের মত আরেকটি অনুরূপ আবাসন আজও গড়ে তুলতে পারেননি। সরকারের এই 'না' পারার ব্যাপারে আর্থিক অসঙ্গতি বা ঔদাসীন্য যাই থাকুক না কেন পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে কলকাতার বুকে কিছু 'মেস' বা বোডিং গড়ে উঠেছে এবং উঠছে যেখানে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের থাকার পক্ষে আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে মোটেই অনুকূল নয় (ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন সব বোর্ডিং বা মেস অবশ্য এই দুর্নাম বহন করে না)।

স্যালভেশন আর্মি, ইয়ং উইমেনস ক্রিশ্চান অ্যাসোসিয়েশন (ওয়াই ডবলিউ· সি· এ·), বেঙ্গল ব্যাপটিস্ট ইউনিয়ন প্রভৃতি সংস্থাও চাকুরে অবিবাহিতা মেয়েদের আবাসন সমস্যার সুরাহার জন্য পঞ্চাশ দশকের গোড়া থেকেই কাজ করে চলেছেন, কিন্তু যে-হারে চাকুরে মহিলাদের আবাসন চাহিদা বাড়ছে, ওই সব সংস্থা তার মোকাবিলায় পেরে উঠছে না। উপরোক্ত সংস্থা সমূহের মধ্যে আবার ওয়াই· ডবলিউ· সি· এ-তে আর্থিক দিক থেকে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের থাকা নাগালের' বাইরে, স্যালভেশন আর্মি পরিচালিত হোস্টেলে ব্যবস্থা ভাল কিন্তু সিট ভীষণ কম আর বেঙ্গল ব্যাপটিস্ট

সকালে কেউ অফিসে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, কেউ কাপড় শুকোতে দিচ্ছেন কেউ বা খবরের কাগজ পড়ছেন



ইউনিয়ন পরিচালিত ব্যাপটিস্ট উইমেনস হোস্টেলের সার্বিক অবস্থা যা জেনে বা দেখে একমাত্র অসহায় না হলে কোনো মেয়েই যাবেন না। এখন আসা যাক কলকাতার হাল আমলে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে চাকুরে অবিবাহিতা মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা কী রকম বা কতটুকু এই প্রশ্নের সন্ধানে।

সরকারি উদ্যোগে চাকুরে অবিবাহিতা মহিলাদের একমাত্র আবাসন '২৪/১এ, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-১৯ এই ঠিকানায় প্রথমে আসা যাক। কয়েক বছর আগে সংবাদপত্রের পাতায় এই হোস্টেলটিকে 'কোয়ার্লিং গার্লস হোস্টেল' হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এত কম খরচে, এত আরামে, এত ভি. আই. পি. পরিবেষ্টিত নিরাপদ আশ্রয় অন্য জেলা রাজ্য থেকে আসা যে-কোনো চাকুরে অবিবাহিতা মেয়ের কাছেই রীতিমত ঈর্ষার ব্যাপার। হোস্টেলটিকে ৭৫-এর আগে পরিচালনা করতেন 'সারদা সংঘ'। আবাসিকদের সঙ্গে সারদা সংঘের বিরোধ দেখা দেওয়ায় রাজ্য সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। তিনতলা, পরিষ্কার ঝকঝকে বিরাট ওই হোস্টেলটিতে মোট আটান্নটি ঘর, প্রতি ঘরে তিনজন করে থাকার ব্যবস্থা, এছাড়া আছে একটি ডর্মেটরি; যেখানে পাঁচজন থাকেন। অর্থাৎ এখানে থাকেন মোট একশো উনআশিজন। এখানে সিট রেন্ট প্রতি মাসে চৌদ্দ টাকা, খাওয়া খরচ প্রতি মাসে একশো টাকা, এসটাবলিসমেন্ট চার্জ প্রতি মাসে তের টাকা।

এবার আসা যাক খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করেন কারা সেই প্রশ্নে। প্রতি মাসে সিট রেন্ট জমা পড়ে সরকারি কোষাগারে, সংগ্রহ করেন সরকারি চাকুরে, হোস্টেলের সুপারিন্টেনডেন্ট (অবশ্য পদটি মহিলার জন্য) নিজে। খাওয়া-দাওয়া বাবদ আবাসিকাদের থেকে প্রতি মাসের জন্য একশো টাকা এবং এসটাবলিসমেন্ট চার্জ তের টাকা সংগ্রহ করেন নির্বাচিত মেস কমিটি। মেস কমিটিতে নয়জন সদস্যা (আবাসিকা) আছেন, এঁরা সবাই এক বছরের জন্য সরকারের গৃহনির্মাণ দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় নির্বাচিত। মেস কমিটি আবার প্রতি মাসের জন্য চারজন সদস্যা (আবাসিকা) নিয়ে গঠিত মেস ম্যানেজারদের হাতে খাওয়া-দাওয়ার খরচ তুলে দেন। দোকান-বাজার সব কিছুই মেস ম্যানেজাররাই করেন। রান্না করার জন্য রাঁধুনি ঠাকুর আছেন একজন, তাঁকে সাহায্য করেন দুজন স্ত্রীলোক। রান্নার মেনু হিসেবে থাকে দিনের বেলা ভাত, ডাল, তরকারি, মাছ এবং রাতে ভাত কিম্বা রুটি সঙ্গে নিরামিষ তরকারি।

সুপার, পিয়ন এবং সুইপার এই তিনজন ছাড়া হোস্টেলটি তদারকি করার জন্য আর কোনো সরকারি চাকুরে নেই। রান্নার লোক, ঘর পরিষ্কারের জন্য দুজন ছেলে এবং দুজন মেয়ে ও দারোয়ানের বেতন মেস কমিটি তাদের সংগৃহীত এসটাবলিসমেন্ট চার্জ থেকে দিয়ে থাকে। সংগৃহীত এসটাবলিসমেন্ট চার্জ থেকেই ওই হোস্টেলে এসেছে রঙিন টিভি। অবশ্য এর পিছনে আবাসিকাদের উদ্যোগের সঙ্গে নতুন সুপার শ্রীমতী সবিতা রায়ের প্রচেষ্টাও যথেষ্ট ছিল। এত কিছু সুবিধার সঙ্গে হোস্টেলটিতে আছে একটি বড় মাপের অভ্যর্থনা কক্ষ যেখানে আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব এসে বসতে পারেন, আছে একটি সিক রুম, কোনো আবাসিকা অসুস্থ হয়ে পড়লে, তাঁকে ওই রুমে রাখা হয়।

এতক্ষণ হোস্টেলটির ভাল দিকটাই চিত্রিত করা হল। কিন্তু এখানকার আবাসিকাদের কিছু কিছু অসুবিধাও আছে। কী কী অসুবিধা আছে এই প্রশ্ন করতে গত দশ বছর ধরে থাকা ওই হোস্টেলের আবাসিকা টেলিফোন ভবনের স্টাফ ছায়া দেবনাথ বললেন, 'অসুবিধার কথা বলতে হলে প্রথমেই খাওয়ার কথা বলতে হয়। যেহেতু খাওয়ার জন্য আমরা একশো টাকার বেশি দিই না—তাই আজকের বাজারে একশো টাকায় কী রকম খাওয়া হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। দ্বিতীয় অসুবিধা হচ্ছে রুম মেটকে নিয়ে। সিট অ্যালটমেন্ট করা হয় গৃহনির্মাণ দপ্তর থেকে। একজন বাইশ বছরের তরুণীকে হয়তো সিট দেওয়া হল আটান্ন বছরের বয়স্কা একজন স্কুল শিক্ষিকার ঘরে। দুজনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান এবং তার জন্য দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বোঝাপড়ায় চিড় ধরায়। একজন তরুণীর তারুণ্যের উচ্ছ্বাস এবং অন্যজনের অস্তমিত জীবনে পুজো-অর্চনার কৃষ্টির মধ্যে কোনো সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায় না, ফলে দুই রুম মেটের মধ্যে চলা-ফেরার তিক্ততা বাড়ে এবং এই তিক্ততা কলহে পরিণত হয়।'

'সেই জন্যই কি এই হোস্টেলটিকে কয়েক বছর আগে খবরের কাগজে 'কোয়ার্লিং গার্লস হোস্টেল' বলা হয়েছিল?

'হ্যাঁ, কতকটাতো সেজন্য বটেই। রাঁধুনি হিসেবে পুরুষ কর্মচারী রাখা হবে, না মহিলা কর্মচারী রাখা হবে, ঘর মুছবে ছেলে কর্মচারী না মহিলা কর্মচারী—এ নিয়েও আবাসিকাদের মধ্যে বিরোধ প্রায়ই দেখা দেয়। এই ব্যাপারে সরকারের কোনো দায়দায়িত্ব না থাকায় এমন বিরোধ প্রায়ই লেগে আছে। আবাসিকাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া অতীতে আরও ছিল, নতুন সুপারের আমলে ওই ঝগড়া অনেক কমে আসছে। তবে মিলেমিশে থাকলে কম পয়সায় কলকাতার বুকে এমন নিরাপদ জায়গা ভাবাই যায় না।'

উত্তরবঙ্গ থেকে আসা শ্রীমতী সবিতা রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত গড়িয়াহাটে 'ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেল'টির সুপারিনটেনডেন্ট পদে গত বছরের মার্চে যোগ দিয়েছেন। শ্রীমতী রায় হোস্টেলটি সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি এখনও বুঝে উঠতে পারেননি। প্রসঙ্গত, শ্রীমতী রায়ের আগে দুজন সুপার আবাসিকাদের মধ্যে ঝগড়া থামাতে না পেরে চাকরি ছেড়ে চলে গেছেন। শ্রীমতী রায়ও যেদিন উত্তরবঙ্গ থেকে যোগ দেওয়ার জন্য এই হোস্টেলে আসেন সেদিন আবাসিকাদের পক্ষ থেকে যে অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন তা আজও ওঁর স্মৃতিতে গভীর ক্ষত হয়ে আছে। আর এজন্য সরকারও তার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। শ্রীমতী রায় ওঁর স্বামীকে নিয়ে যেদিন এই হোস্টেলের সুপার পদে যোগ দিতে এসেছিলেন সেইদিন আবাসিকারা ওদের সস্ত্রীক হোস্টেলের সুপারের ঘরে থাকতে দেওয়ায় বাধা দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আবাসিকাদের যুক্তি ছিল—এখানে কোনো পুরুষের (ভিজিটিং আওয়ারস ছাড়া) প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু সরকার তার এই নীতি সম্পর্কে সবিতা দেবীকে নিয়োগপত্র দেওয়ার আগে কিছুই জানায়নি। এমনকি এখনও পর্যন্ত শ্রীমতী রায়কে কোনো ফ্যামিলি কোয়ার্টার্স দেওয়া হয়নি। সবিতা দেবী একাই একটি ঘরে সুপার হিসেবে থাকেন।

সুপার শ্রীমতী সবিতা রায় বললেন, 'নামেই এটি ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেল অথচ এখানে চাকরি থেকে



ঘরে বসে কেউ পড়াশোনা করছেন... কেউ বা মেক আপ নিচ্ছেন

অবসরপ্রাপ্তা মহিলা এবং গবেষক তরুণীর সংখ্যা মোট আবাসিকার এক তৃতীয়াংশ। তিনজন আবাসিকা বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরও সিট দখল করে রেখেছেন। ওদের কিছু বলতে গেলে ওরা বলেন—আমাদের সরকারি অনুমতি নেওয়া আছে। আবাসিকারা বেশ ভালভাবেই জানেন সিট অ্যালটমেন্টের ব্যাপারে নীতি-নির্ধারণ করেন সরকারের হাউসিং বিভাগ—সুপারের এই ব্যাপারে কিছু বলার নেই, কাজেই আবাসিকাদের কিছু বলতে যাওয়া মানেই অহেতুক আবাসিকাদের সঙ্গে সংঘর্ষে যাওয়া।'

'এই ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন না কেন?'

'অনেকবার করেছি। সরকারের বক্তব্য হল এটা মেয়েদের জন্য পাবলিক হোস্টেল। এখানে সবরকম মহিলাই থাকবেন।'

'তাহলে 'ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেল' নাম কেন?'

'সেটা তো আমারও প্রশ্ন। সরকার আমাকে রেখেছেন যেন আবাসিকাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া বা অপ্রিয় ঘটনা না ঘটে তা দেখা আর সরকারের পক্ষে সিট রেন্ট নেওয়ার জন্য। এখানে আবাসিকাদের আলো জ্বালার চার্জ দিতে হয় না বলে যে যেমন খুশি আলোর ব্যবহার করেন। সরকারের এই ব্যাপারে কোনো নীতি নির্ধারিত না থাকায় আমারও কিছু করার নেই। ধরুন কোনো একটি ঘরে একজন গবেষক সারা রাত আলো জ্বেলে পড়বেন, আর একজন পরীক্ষার খাতা দেখবেন, আর তৃতীয়জন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে স্কুলে যাবেন। অতএব তাঁর ঘুমের প্রয়োজন এবং তার জন্য যদি অপর দুজনকে আলো নেভাবার কথা বলতে যাই তো তাহলে আবাসিকাদের সঙ্গে বিরোধ লেগে যাবে। যেহেতু তৃতীয়জন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা তাই তাঁর গলার স্বরও নিচু এবং তাকে অপর দুজনের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা। সম্প্রতি শতকরা পঞ্চাশজন আবাসিকা ঘরে রান্না করে খাচ্ছেন, ঘর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এই ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। অনেক মেয়ে ভাঙা চৌকিতেই শুয়ে থাকেন, চৌকি সারাবার কথা সরকারকে বললে, কোনো উত্তর মেলে না।'

'যেখানে পুরুষের প্রবেশ (ভিজিটিং আওয়ার ছাড়া) নিষেধ, সেখানে রান্না ও ঘর পরিষ্কারের জন্য পুরুষ কর্মচারী নিয়োগ করা হয় কেন?'

'সত্যিই এর কোনো উত্তর নেই। ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে।'

'এখানে কোন ধরনের চাকুরে মহিলা বেশি থাকেন?'

'স্কুল শিক্ষিকা, কলেজের অধ্যাপিকা, অবসরপ্রাপ্তা চিকিৎসক, সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী, গবেষক, খেলোয়াড় সব রকমেরই মহিলাই আছেন।'

'কোথাকার মহিলা বেশি?'

'পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও অন্য রাজ্য যেমন আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, পাঞ্জাব, অন্ধ্র থেকেও মেয়েরা এসে এখানে রয়েছেন।'

'এখানে যাঁরা থাকেন তাঁদের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা? মানে তাঁরা ড্রিঙ্ক করেন কিনা কিম্বা ড্রাগ অ্যাডিকটেড কিনা?'

'দেখুন এঁরা সবাই চাকুরে মহিলা, কাজেই কে কোথায় যাচ্ছেন বা কখন আসছেন তা নিয়ে মাথা ঘামাই না এবং আমার অধিকারও নেই। তবে রাত দশটার পর হোস্টেলের গেট বন্ধ হয়ে যায়, এর পরেও যদি কেউ আসেন তবে তাঁকে আগে থেকে অনুমতি নিয়ে রাখতে হয়।'

'এই হোস্টেলে জায়গা পেতে হলে কোথায় আবেদন জানাতে হবে?'

'—নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ের 'আবাসন' বিভাগে নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন জানাতে হয়। ওখান থেকেই নামের তালিকা অনুযায়ী 'সিট' দেওয়া হয়। তবে কে কিভাবে সিট পাচ্ছেন এবং কোনো প্রভাব বা সুপারিশ মারফৎ কিনা তা আমার জানা নেই।'

৫৬ সি, রামকান্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৩ এই ঠিকানায় সি· আই· টি· পরিচালিত ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলও গড়িয়াহাটে রাজ্য সরকারের পরিচালনায় ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলের আদলে তৈরি। বাগবাজারের এই হোস্টেলটিও তিনতলা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এখানে একশো দশজন আবাসিকা আছেন। এখানে কিছু বয়স্কা আবাসিকা আছেন বলে সুপারিনটেনডেন্টের পদে উপযুক্ত মহিলা পাওয়া যাচ্ছে না। সি· আই· টি·-র এই হোস্টেলে সিট রেন্ট সাঁইত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকার মধ্যে এবং একটি চার বেডের ডর্মেটরি আছে যার সিট রেন্ট পঁয়ত্রিশ টাকা। এখানে কেবলমাত্র চাকুরে



DAZZAL/FD/B

মেয়েরাই জায়গা পান। হোস্টেল চালাবার জন্য মেস কমিটি, মেস ম্যানেজার ইত্যাদি ব্যাপারগুলো সরকারি ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলের মতোই। খাওয়া-দাওয়াও তাই তবে মিল চার্জ প্রতিমাসে আশি টাকা দিতে হয় এবং মেস ম্যানেজাররা এত হিসেব ও বুদ্ধি করে চালান যে, প্রতি মাসের শেষ দিনে গ্র্যাণ্ড ফিস্ট হয় এবং সেদিন থাকে একেবারে বিয়ে বাড়ির মতো খাওয়ার আয়োজন।

সি·আই·টি· পরিচালিত এই হোস্টেলে জায়গা পেতে হলে ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেসে সি·আই·টির সদর কার্যালয়ে এস্টেট ডিপার্টমেন্টে আবেদন জানিয়ে ফর্ম জমা দিতে হয় সঙ্গে দেখাতে হয় লাস্ট পে সার্টিফিকেট। অ্যালটমেন্ট লেটার আবেদনকারীর অফিসে চলে আসে এবং প্রয়োজনীয় টাকা জমা দিয়ে আবেদনকারী হোস্টেলে জায়গা পান। এই হোস্টেলেও অধ্যাপিকা, গবেষক, ব্যাঙ্ক কর্মচারী, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কর্মচারী, স্কুল শিক্ষিকা প্রভৃতি বিভিন্ন জীবিকায় নিযুক্ত মহিলারা আছেন। সেইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাসহ বিভিন্ন রাজ্যের মহিলারাও এখানে আছেন। তবে চাইলেই যে জায়গা পাওয়া যাবে তা নয়, বেশ কিছুদিন অপেক্ষাও করতে হয়।



হস্টেলের মেয়েরা সকালে গান-বাজনার অনুশীলন করছেন

সি·আই·টি· পরিচালিত এই বাগবাজারের ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলের আবাসিকা অপর্ণা মিত্র বললেন, 'এত কম খরচে এমন সুন্দর পজিশনে কলকাতায় দ্বিতীয় কোনো হোস্টেলের ঠিকানা আমার জানা নেই।' অপর্ণা অর্থনীতিতে এম·এ· করার পর একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে চাকরি পান এবং সেই সুবাদে ইউনিভার্সিটি হোস্টেল ছেড়ে এই হোস্টেলে এসে উঠেছেন। বয়সের ব্যবধানের সঙ্গে সঙ্গে রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির যে পার্থক্য তার জন্য আবাসিকাদের মধ্যে বিবাদ হয় কিনা জিজ্ঞাসা করলে তরুণী অপর্ণা বললেন, 'আমরা তরুণী মেয়েরা সিনিয়রদের শ্রদ্ধা করি, আর সিনিয়ররাও আমাদের নিজের বোনের মতো দেখেন, কাজেই ঝগড়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এককথায় যে যার নিজের চাকরি ও পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত এবং এই ব্যস্ততার মধ্যেও আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সুবিধা-অসুবিধার কথা ভাবি তাই হয়ত আমাদের রুম মেটদের মধ্যে কোনো তিক্ততা নেই। অবসর বিনোদনের সময়েও আমরা রেডিও, টি·ভি· টেপ রেকর্ডার নিয়ে একসঙ্গেই হৈ-হুল্লোড় করি, আলাদা করে কাউকে তার প্রয়োজন না থাকলে দূরে সরিয়ে রাখি না।' পাড়ার ছেলেদের উৎপাত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে অপর্ণা বললেন, 'এখানে যাঁরা থাকেন তাঁরা সবাই ভদ্রঘরের মেয়ে, সেই সঙ্গে কারোর না কারোর কাছাকাছি চেনা-জানা কেউ না কেউ থাকেন; তাই পাড়ার ছেলেরা কিছু করতে খুব একটা সাহস পান না।' হোস্টেলের সিট কোন সময়ে বেশি খালি হয় এর উত্তরে এক ঝলক হেসে অপর্ণা বললেন, 'সাধারণত বিয়ের মরশুমের পর কিছু কিছু সিট খালি হয় তবে তা ভর্তি হতে মোটেই সময় লাগে না।' আবাসিকাদের চারিত্রিক ব্যাপারে প্রশ্নের উত্তরে জানা গেল—এখানে সবাই উন্নত কৃষ্টির, ভদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা থাকেন কাজেই একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ের পক্ষে যা কিছু মানানসই তার বাইরে ওরা কেউ নয়। তবে হোস্টেলের ল্যাম্প সম্পর্কে অপর্ণার অভিযোগ আছে, কর্তৃপক্ষ সময়মত ল্যাম্প সরবরাহ করছেন না একথা লেখার জন্য অপর্ণা অনুরোধ জানিয়েছেন।

এতক্ষণ সরকারি ও আধা-সরকারি ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেল নিয়ে আলোচনা হল। এখন বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হোস্টেল সম্পর্কে জানা যাক। স্যালভেশান আর্মি বা মুক্তিসেনা দ্বারা পরিচালিত একটি ইয়ং উইমেনস হোস্টেল ৩৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ এই ঠিকানায় আছে। স্যালভেশান আর্মির জাতীয় কার্যালয় দিল্লিতে এবং সদর কার্যালয় লন্ডনে। কলকাতায় স্যালভেশন আর্মি পরিচালিত কেবলমাত্র চাকুরে মেয়েদের জন্য হোস্টেলটির সুপারিনটেনডেন্ট ক্যাপটেন মিসেস লালকিয়াম লোভার কাছে থেকে জানা গেল যে, এখানে ১৮—২৩ বছর বয়সী যে-কোনো জাতি ও ধর্মের কেবলমাত্র চাকরিজীবী মেয়েদের মাত্র তিন বছরের জন্য থাকতে দেওয়া হয়। তিন বছর থাকার পর যদি আবাসিকার বয়স তেইশ বছরের মধ্যেই থাকে তখন সে আবার থাকার (তিন বছরের) জন্য আবেদন জানাতে পারেন। দ্বিতীয়বার কোনো মেয়েকে থাকতে দেওয়া হবে কিনা তা, কর্তৃপক্ষ ঠিক করবেন।

সুপার ক্যাপটেন মিসেস লালকিয়াম লোভা বললেন, 'এখানে চার বেডের রুমে বেডপিছু প্রতিমাসে ভাড়া নব্বই টাকা আর দুই বেডের রুমে বেডপিছু ভাড়া একশো টাকা। খাওয়া-দাওয়ার জন্য কোনো মেস বা ওই ধরনের কিছু নেই। রান্না করার ঘর আছে, আবাসিকারা নিজেরাই নিজের নিজের রান্না করে নেন কিংবা বাইরে থেকে খাবার আনিয়ে খান। লেনিন সরণির পাশেই তিনতলার এই বিশাল বাড়িতে মাত্র পঁয়তাল্লিশজন আবাসিকা থাকেন যার মধ্যে অধিকাংশই আসাম, মণিপুর, মিজোরাম, সিকিম, নাগাল্যান্ড প্রভৃতি উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি থেকে আসা মেয়ে। বিহার, দক্ষিণ ভারত ও উত্তর প্রদেশের মেয়েরাও এখানে আছেন তবে বাঙালি আবাসিকা নেই বললেই চলে, বর্তমানে একজনই মাত্র বাঙালি মেয়ে আছেন।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল যে, স্যালভেশান আর্মি পরিচালিত হোস্টেলে মেয়েদের স্বাধীনতা একটু বেশি। আর অন্যান্য হোস্টেলের মতো এখানেও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পুরুষ ভিজিটরের প্রবেশ গেস্টরুম পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকলেও, আবাসিকাদের বয় ফ্রেন্ডরা গেস্টরুমে বসেই বান্ধবীর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারেন। এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ সাধারণত ততখানি বিধিনিষেধ রাখেননি। সুপারের স্বামী ক্যাপ্টেন লালকিয়াম লোভার কাছ থেকে এর সত্যতা সম্পর্কে পরোক্ষভাবে সমর্থনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ক্যাপ্টেন লালকিয়াম লোভা বললেন, 'মেয়েদের বয় ফ্রেন্ড থাকতেই পারে, তাতে দোষের কী?' তবে কোনো আবাসিকা হোস্টেলের আইন শৃঙ্খলা ও নিয়ম যাতে ভঙ্গ না করেন সেদিকেই আমরা নজর রাখি।'

স্যালভেশন আর্মি পরিচালিত উইমেনস হোস্টেলে একমাত্র বাঙালি তরুণী বিহার থেকে আসা, বনানী ঘটকের সঙ্গে কথা হল। বনানীর দিদি অতীতে এই হোস্টেলে থেকেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেন। এই হোস্টেলের মেয়েরা ড্রিঙ্ক করেন বা ড্রাগ অ্যাডিকটেড কিংবা ছেলে বন্ধুর সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত হোটেলে রাত কাটান, একথা বনানী পুরোপুরি অস্বীকার করলেন। বনানীর মতে যা কিছু কষ্ট তা হল, নিজে হাতে রান্না করা কিংবা হোটেলের খাবার আনিয়ে খাওয়া, বাকি সবকিছু ব্যবস্থাই এই হোস্টেলের ভাল। উডল্যান্ড নার্সিং হোমের নার্স এই হোস্টেলের আবাসিকা। জলপাইগুড়ি থেকে আসা দীপা ছেত্রী বললেন, 'এখানকার অ্যারেঞ্জমেন্ট খুব ভাল। তবে তিনবছর পর আর থাকতে দেবেন না একথা জেনে এখন

থেকেই চিন্তা হচ্ছে তখন কোথায় যাব?'

'চাকরিতে যাওয়া-আসার পথে স্থানীয় ছেলেদের কোনো টিজিং শুনতে হয় কি?'

'হ্যাঁ, লেডিস হোস্টেলের আশেপাশে এমন ধরনের ছেলে কিছু তো থাকবেই।'

৮৪, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলকাতা-১৪ এই ঠিকানায় অবস্থিত ব্যাপটিস্ট মিশন উইমেনস হোস্টেলেও এই প্রতিবেদককে তথ্যের সন্ধানে যেতে হয়েছিল। উইলিয়াম কেরীর আমলে তৈরি এই হোস্টেলটির সাম্প্রতিক ভগ্নদশাগ্রস্ত, জরাজীর্ণ চেহারা দেখলে ভূতুড়ে বাড়ি বলেই মনে হবে। এই হোস্টেলটির অব্যবস্থা ও পরিবেশ দেখলে সত্যিই মনে হবে এখানে মেয়েরা থাকেন কী করে? এখানে স্কুল কলেজের ছাত্রীদের সঙ্গে চাকুরে মেয়েরাও থাকেন। একটা মাঝারি সাইজের ঘরে উনিশজন মেয়ে একত্রে থাকেন, এটা ভাবা যায় না। অথচ থাকা ও খাওয়া খরচ বাবদ প্রতিমাসে দু'শো দশ টাকা আবাসিকারা দিয়ে থাকেন। এখানে আবাসিকাদের যে খাদ্য দেওয়া হয় তাতে তাঁরা অসন্তুষ্ট।

এই হোস্টেলে আন্দামান থেকে আসা তিন তরুণী যথাক্রমে শমিতা বিশ্বাস, ঝর্ণা সাধুখাঁ, রোশান আরা বেগম, সাগরদ্বীপ থেকে আসা কল্যাণী মাইতি এবং বহরমপুর মুর্শিদাবাদ থেকে আসা স্কুল শিক্ষিকা শিখা মণ্ডলের সঙ্গে কথা হল। এঁরা প্রত্যেকেই প্রায় বললেন, 'এখানকার খাওয়ার মান অত্যন্ত খারাপ। কর্তৃপক্ষ আমাদের কোনরকম সুযোগ সুবিধাই দেখেন না। কোনো অভ্যর্থনা কক্ষ নেই, বান্ধবীদেরও ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। কেউ দেখা করতে এলে আবাসিকাদের ডেকে দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। স্যানিটেশন ব্যবস্থা ভাল নয়, কোনো সিকরুম নেই। আবাসিকারা অসুস্থ হয়ে পড়লে জরুরী অবস্থায়ও কর্তৃপক্ষের সাহায্য পাওয়া যায় না, টেলিফোন ব্যবস্থাও নেই যাতে আমরা নিজেরা প্রয়োজনমত ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। এই হোস্টেলের নিয়ম আবার ডাক্তারবাবু তরুণ বা মধ্যবয়সী হলে চলবে না, তাকে বৃদ্ধ হতে হবে। অবিলম্বে এখানে একটি অভ্যর্থনা কক্ষ ও সিক রুম দরকার, প্রয়োজন খাবারের মান উন্নত করা।' উপরের বক্তব্যের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য দুদিন সন্ধ্যায় সুপারের খোঁজে ওই হোস্টেলে গিয়েছিলাম, কিন্তু সুপার ছিলেন না এবং কর্তব্যরত দারোয়ানও এই প্রতিবেদকের সঙ্গে অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজের ব্যবহার করেন। হোস্টেলটির যা অবস্থা তাতে করে যেকোনো দিন সন্ধ্যেবেলায় কোনো আবাসিকা হোস্টেলে ঢোকার মুখে গেট পেরিয়ে 'কোনো সমাজবিরোধীর খপ্পরে পড়তে পারেন। এখনও যে এই ধরনের ঘটনা ওই হোস্টেলে ঘটেনি এর জন্য স্থানীয় তরুণদের মার্জিত আচার-আচরণ অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য।



খাওয়ার টেবিলে

ছোট, বড়, ভালমন্দে মেশানো ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত চাকুরিজীবী মহিলাদের জন্য মেস বা বোর্ডিংএর সংখ্যা এই কলকাতায় প্রায় চল্লিশ। তবে থাকা-খাওয়া বাবদ ওই সব বোর্ডিং-এ গড়ে খরচ লাগে সাড়ে চারশো' টাকার মতো। এর উপর কোথাও কোথাও মেস 'মালিকের জুলুম আছে। আজ আলোর জন্য ভাড়া বাড়ছে, তো কাল খাওয়ার জন্য, সেইসঙ্গে কুরুচিপূর্ণ সামাজিক পীড়ন। ডালহাউসি পাড়ায় বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন বাঁকুড়া থেকে আসা এক তরুণী, যিনি উত্তর কলকাতায় অমন একটি মেসে থাকেন এবং সেখানকার রুম মেটের ব্যবহারের কথা বলছিলেন। তরুণীটির রুম মেট প্রচণ্ড মাত্রায় সমকামিতা এবং সেক্সচুয়াল পারভারশনে ভুগছেন। এমন রুম মেটের সঙ্গে থাকাই গ্রাম থেকে আসা তরুণীটির পক্ষে দায় হয়ে পড়েছে। সরকারি আবাসনের জন্য জোর চেষ্টা করছেন, পেলেই চলে যাবেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছা কেন, একথার উত্তরে তরুণীটি বললেন, 'ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে গেলে মেস মালিক কালই ঘর ছেড়ে দিতে বলবেন, কিন্তু এখন আমি যাব কোথায়? তাই প্লিজ আমার নাম বা মেসের নাম দেবেন না, আমি বিপদে পড়ব।'

সবশেষে ওয়াই-ডবলিউ-সি-এ-র হোস্টেলের কথা বলা যেতে পারে। মিডলটন রোডে ওদের যে হোস্টেল আছে সেখানে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের চাকুরে মেয়েদের থাকা রীতিমত বিলাসিতা। থাকা-খাওয়া বাবদ সাড়ে ছয় শো থেকে সাড়ে সাতশোর টাকার নিচে যাঁরা চিন্তাভাবনা করেন তাঁদের জন্য ওই হোস্টেল নয়। তাই সাধারণ ঘরের চাকুরে মেয়েদের কাছে ওয়াই-ডবলিউ-সি-এ-র হোস্টেলের আকর্ষণ বা প্রয়োজনীয়তা নেই বললেই চলে।

বিভিন্ন হোস্টেল ঘুরে এই প্রতিবেদকের যে ধারণা হয়েছে তা হল স্বনির্ভর নিরাশ্রয় মেয়েরা একটু আশ্রয়ের আশায় এক আবাস থেকে আর এক আবাসে ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই শুনে রোজই ফিরে আসছেন। ১৯৫৭ সালে সরকারি উদ্যোগে যা হয়েছিল তা থেকে আজ আর নতুন কিছু হয়নি; অথচ ভিন রাজ্য বা জেলা থেকে আসা চাকুরে মহিলাদের আবাসন সমস্যার প্রয়োজনীয়তার কথা মুখে সবাই উপলব্ধি করলেও, কাজে কী করা যায় তা কেউ কিন্তু ভাবছেন না। মেয়েদের কাজের পরিধি যেমন বেড়েছে, সমস্যাও বেড়েছে। '৫৭ সালে যে সমস্যাকে কেন্দ্র করে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় 'ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেল' গড়ে তুলেছিলেন সেই সমস্যা আজ আরও জটিল ও বিচিত্র হয়ে উঠছে—একথা ভাববার সময় বোধহয় পেরিয়ে যাচ্ছে।

জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়

ফটো: অচিন্ত্য রায়

ধবল বা শ্বেতীর
আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায়
ভারগব ক্লিনিকের এক অনবদ্য সফলতা

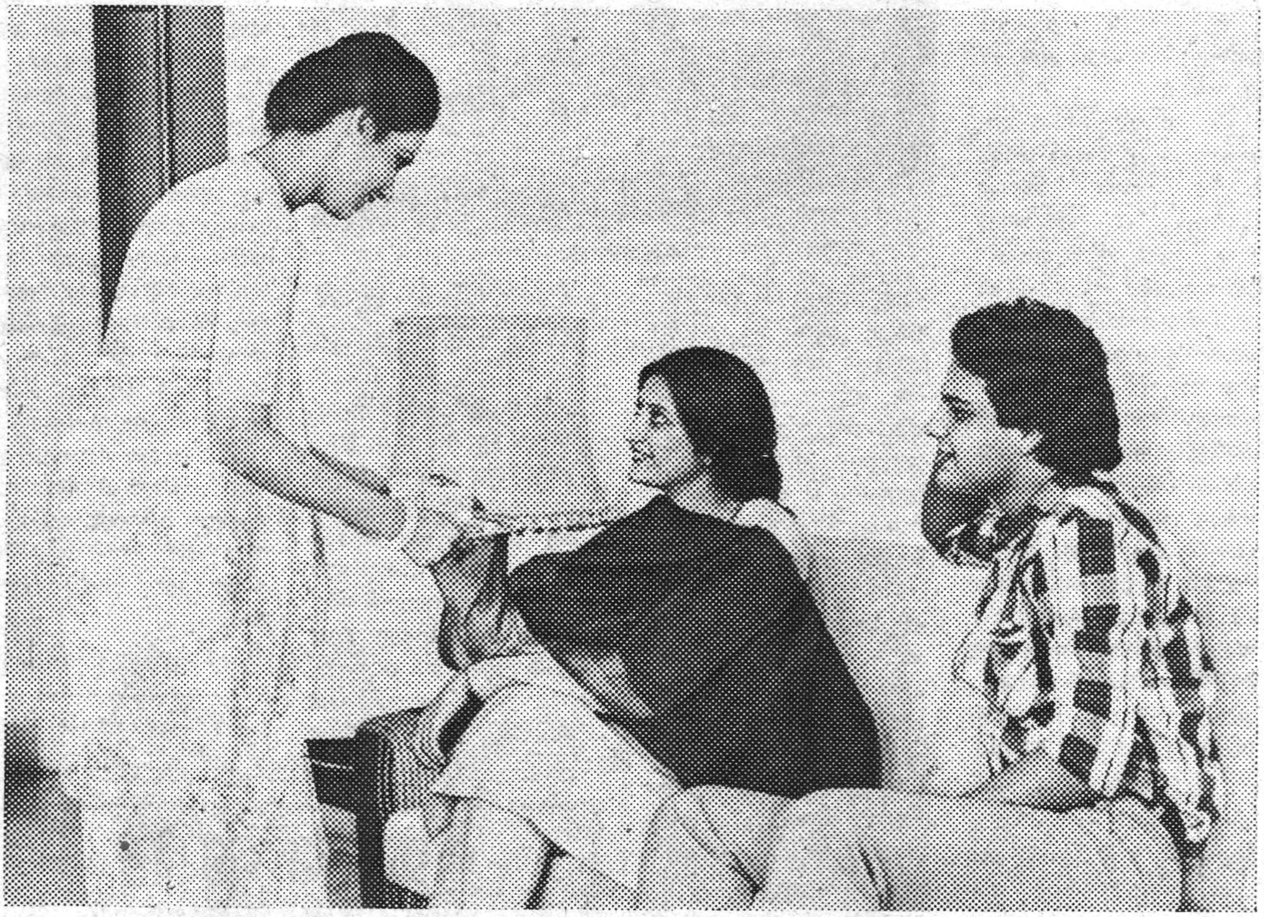


দ্বিধাবোধ করছেন? সাদা দাগ অসাধ্য রোগ নয়। আমরা সাদা দাগের চিকিৎসা করে অনেক রুগীর রোগ নিরাময় করে প্রশংসা পত্র অর্জন করেছি। অনেক পরিশ্রম করে আমরা এই সাদা দাগের চিকিৎসায় সক্ষম হয়েছি। আমাদের চিকিৎসা এতবেশী প্রভাবশালী যে চিকিৎসা শুরু করার সাথে সাথে সাদা দাগের রং বদলাতে থাকে এবং শীঘ্র স্বাভাবিক রং-এ ফিরিয়ে আনে, যদি আপনি বিভিন্ন চিকিৎসার পরও হতাশ হয়ে থাকেন, তবে একবার আমাদের চিকিৎসা নিরক্ষন করে দেখুন। সময় থাকতে চিকিৎসা করালে এই রোগ অবশ্যই সারিয়া যায়। আপনার রোগের পূর্ণ বিবরণ লিখে আমাদের কাছে পাঠান ও বিনামূল্যে পরামর্শ নিন এবং পূর্ণ চিকিৎসার জন্যে লিখুন। প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করুন।

BHARGAV CLINIC
P. O. KATRI SARAI (GAYA)

আপনার ত্বকের সৌন্দর্য্য বজায় রাখা আপনার কর্তব্য

আতিথেয়তার প্রথম সোপান
সাগর স্কিম মিল্ক !



আপনার দ্বারে কোনো অতিথি দেখা দিলেই, সর্বপ্রথম আপনি কি চা দিয়েই তাঁকে আপ্যায়ন করেন না ? আজ্ঞে হ্যাঁ, হাসিমুখে স্বাগত জানিয়ে, গরম গরম এক কাপ চা এগিয়ে দেওয়া, ঐটিই তো হ'ল ভারতীয় ঐতিহ্য, যা ভারতীয় সভ্যতারও অঙ্গ বিশেষ !

তবে হ্যাঁ, যদি ধরুন কোনো অতিথিকে চা দিতে গিয়ে দেখলেন, দুধের বোতল একেবারে ভোঁ ভাঁ—আর, দুধ পাওয়ারও কোনো উপায় নেই, তখন ?

এই সাগর স্কিম মিল্ক পাউডার তো রয়েছে, যা আপনার মা ও তাঁর মায়েদের যুগের সেই বংশপরম্পরার আতিথেয়তাকে বজায় রাখতে সাহায্য করবে, আর তাও, একেবারে সাশ্রয়করভাবে, চটপট্ ও অতি সহজে । আর তাছাড়া, এটি নানান মিষ্টি, পুডিং ইত্যাদির জন্যেও আদর্শ ।

এক আকর্ষণীয়
নতুন প্যাকে



ASP/SMP/5/84 R

সাগর
স্কিম মিল্ক পাউডার

দুধের সমস্ত সংগুণে ভরা, অথচ, ফ্যাট ছাড়া !

বিক্রী-ব্যবস্থায় :
গুজরাত কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড,
পো: বঃ ১০, আনন্দ-৩৮৮০০১, গুজরাত

সন্তান

অজিত মুখোপাধ্যায়



বরানগর স্টেশনের অ্যাশবেস্টসের শেডে এবং পুব প্ল্যাটফর্মের নিচে খোঁদলটাতে অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশটি পরিবার। সব মানুষের চেহারা আর পোশাকের অবস্থা প্রায় একরকম। গায়ের জামাকাপড় যেমন পুরনো আর ছেঁড়াফাটা, দেহের ময়লাও প্রায় তেমন। দু–একজনের পায়ে রাস্তায় কুড়িয়ে আনা জুতো মোটরের টায়ারের, বাকি সকলের খালি পা। চুলে দীর্ঘকাল তেল্ না পড়ায় জটার শামিল। এরা সবাই ভিখারী। বিভিন্ন জেলা থেকে এসে জড়ো হয়েছে। বিভিন্ন কারণে। মূল কারণটা এক। জীবনযুদ্ধে পরাজিত এরা, অসহ্য অভাব এদের ঠেলে দিয়েছে ঘর পরিবার ও নিজস্ব গ্রাম বা অঞ্চলের বাইরে। এরা বেশিরভাগই গ্রামের ক্ষেত মজুর, দু–চার ঘর পুব বাঙলার উদ্বাস্তু।

মাস চারেক সদ্য ভিখারী হওয়া পেঁচি বাউরি পাঁচ ঘাটের জল খেয়ে, রাস্তায় স্বামীকে বিসর্জন দিয়ে নতুন জীবনে প্রায় অভ্যস্ত। সে সারাদিনের ভিক্ষের চাল আর দু নয়া, তিন নয়া, পাঁচ নয়া ও দশ নয়াগুলো যখন পশ্চিম দিকে সূর্যাস্ত হবার পরে রক্তিমাভা, তখন একটা ছেঁড়া ধুতিতে ঢেলে রাখল। ছেঁড়া ধুতির মালিক রাম বাউরি, লোকমুখে শোনা যায় শেয়ালদার এক ভিখারিণীর সঙ্গে বসবাস করছে। ওখানে ছুটে গিয়েছিল পেঁচি, রামের হাতে কপাল ফাটিয়ে ফিরে এসেছে। আর যায়নি – জোর করে তো মানুষের মন বদলানো যায় না।

এ–সময়ে তিনটি ছেলেমেয়েই পেঁচির গায়ে লেপ্টে থাকতে চায়। পেঁচি তখন গজর–গজর করতে থাকে – সব শালা শুয়ারের বাচ্চা, দু–দশ কম দিবেক, বেশি দিবেক নাই। ছেলেমেয়েদের বাঁ হাতে ঠেলে দিতে দিতে বলে, যা, ওদিক পানে যা– তিনটা পাপ – পাপ! পায়ের বেড়ি।

ছোটটি বাদল যায় না – সে মায়ের শুকনো স্তনে সজোরে কামড় বসিয়ে গোগ্রাসে চুষতে থাকে, মাতৃদুগ্ধ প্রায় না থাকার জন্য সে হাঁপিয়ে ওঠে, স্তনের বোঁটা বারবার ফস্কে যায়, আবার সে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কী আছে, যে চুষচিস! যা ভাগ –। বুকে দাঁতের কামড়ের দাগ বসে যাওয়ায় রেগে গিয়ে পেঁচি বাদলকে ঠেলে দেয়। বাদল ছিটকে পড়ে যায় পাথুরে–কাঁকুরে মাটিতে। চিল্লাতে শুরু করে, গলার জোর আছে তার। বেশ কিছুক্ষণ তার দাবি ছড়িয়ে দেয় চারতলা পাঁচতলা বাড়ির এণ্টেনা পর্যন্ত। কতক্ষণ? কয়েক মিনিট। তারপর তার স্বরের শক্তি মিহি হয়ে যায়, পাঁচ–সাত মিনিটের মধ্যে। একটা একটানা সরু সুতোর মতো কান্না শেষ হতে চায় না।

বারোয়ারী পিসি, চন্না, আধবুড়ি – বেঁটে–খাটো বিধবা, বাদলকে কোলে তুলে নিয়ে আসে। কাপড়ের খুঁট দিয়ে গা–মুখ মুছিয়ে দেয়। চকচকে লোভার্ত চাউনিতে বাদলকে দেখতে–দেখতে ধমক দেয় – কী যে হইচিস? কী মা–ই না হইচিস?

গলা টিপে তিনটাকেই শেষ করে দিয়ে একদিন যে-দিকে দু-চোখ যায় চলে যাবো।– ইঁটের উনুনে ফুঁ দিতে-দিতে বলে পেঁচি!

কেষ্টর জীব! তুই মা! অমন কতা বলতে হয়? – জটাজুটধারী ব্রাহ্মণ হরিকিংকর কাশতে কাশতে দলা-দলা গয়ের যন্ত্র-তন্ত্র ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে আসে। ব্রাহ্মণত্ব তার কবে নষ্ট হয়ে গেছে, তার অহংকার নয়। মানে জ্ঞানের অহংকার। কথায়-কথায় কেষ্টর জীব, ভগবান ভাগ্য প্রভৃতি সে প্রতিষ্ঠা করে।

অ্যাই শুরু হবেক মহাভারত! থামেন আপনি। – পেঁচি ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

যে কোনো জাতের ভিখারীর অন্ন সে গ্রহণ করে, আর যে কোনো জাতের ভিখারিণীর পাশে সে শোয় এবং শুতে গিয়ে মারও খায়।

এটা ঘোর কলি চনা, ঘোর কলি – ভালো কতা অ ভালো লাগবে না। – হরিকিংকর বকে চলে।

ছেলেমেয়েদের কুড়িয়ে আনা কাঠ-কুটরো, রেললাইনের ধারে শুকনো আগাছা ইটের উনুনে ঠেলে দিয়ে ত্যাড়াবাঁকা এনামেলের হাঁড়িতে পাঁচ-মিশেল চাল চাপিয়ে দেয়। বাজার থেকে কুড়িয়ে আনা পচা, আধ-পচা আলুপটল একটা ভোঁতা ছুরিতে কাটতে বসে, বড় মেয়ে বিন্তির বয়স দশ – দেখতে ঠিক চার কি পাঁচ বছরের। সে মায়ের সাহায্য করে যথার্থ গিন্নির মতো।

এ সময় প্রায় পঞ্চাশটা উনুন জ্বলে। আগুনের হলকায় আর আভায় অনেকটা জায়গা আলোকিত। ধোঁয়াশায় বাতাস ভারী। যারা একটু পাকাপোক্ত ভিখারী তারা বেপরোয়া গোছের। ওই যে গীতা রমা বাসন্তী – দক্ষিণ পুবের প্রায় শেষ দিকটায় আস্তানা গেড়েছে, ওইখান থেকে মাঝে-মাঝেই হাহা হিহির হুল্লোড় শোনা যায়। তাদের বয়েস কম বা যৌবনের শেষ হতে ক-বছর দেরি, তারা দুনিয়ার ফস্টি-নস্টির খবর রাখে, তাই নিয়ে এই রান্নার সময়ে চটকায়, আর এ ওর গায়ে হাসতে-হাসতে ঢলে পড়ে।

পেঁচি আপন মনে তিক্ততার বিদ্রূপে জ্বলে ওঠে – মরণ দশা! চনা বলে – অদেরও তো শখ-আল্লাদ আচে, নাকি?

মরণ শখ-আল্লাদের!

দুপুরে দেখতে পাওয়া যায় – যারা নানান কারণে ভিক্ষে করতে যেতে পারে না, তারা চার পাঁচ জন একসঙ্গে পরস্পর চুলের উকুন বাছছে – মেয়েরাই।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নিজের নিজের ছেঁড়া মাদুরে বা কাঁথায় পা-ছড়িয়ে বসে সারা দিনের অভিজ্ঞতা উচ্চকণ্ঠে আলোচনা করবে, যেন তারা নিজের ঘরেই কথা বলছে।

ক-মাসে এখানে প্রেম করে বিয়ে হয়েছে – কজন সন্তান প্রসবও করেছে।

হরিকিংকর নিজে ভিক্ষে করে না, সে ভিখারীদের বামুন বা পুরুত। পাঁচজনের কাছে পাঁচ মুঠো চেয়ে নেয় তার সানকিতে –তাই খেয়ে বিড়ি ধরায় লাইটার জ্বেলে আর জ্ঞানগর্ভ বাণী বিতরণ করতে থাকে।

আজ সে বলে ঃ সব সাবধান! বুজেচো, সাবধান! ছেলেধরা দেখা দিয়েছে। সবাই সাবধান!

মানা ভিখারিণীর সাতটি সন্তান। সে বলেঃ দিয়ে যাক, আমার কোনো দুঃখ নাই।

বাদলকে পেঁচি বুকের কাছে চেপে ধরে – তার ঘুমন্ত ঠোঁটে স্তনের শুকনো বোঁটা গুঁজে দিতে-দিতে বলে কী রাকখসী তুমি মানাদিদি!

মানা খেঁকিয়ে ওঠে ঃ তুই কথা কস, ক্যানে ভদ্দর লোকের ব্রউ।

তার স্বামী পঙ্গু – পড়ে পড়ে কাতরায়। সাত ছেলে মেয়ের মধ্যে তিনটি ছেলে পলাতক – মানে একজন রিকশাওয়ালা, একজন সিনেমার টিকিট ব্ল্যাকার, অপর জন ওয়াগনব্রেকার। বাকি চারটির মধ্যে তিনটি মেয়ে। এ-চারজন তার কাছেই থাকে। মানার ভিক্ষার ওপর তাদের বাঁচা। ভিক্ষের চালে পাঁচ-পাঁচটি পেট ভরানো কি সম্ভব?

মানা বলেঃ আমার চাট্টিকেই লিয়ে যাক।

কলিকাল, ঘোর কলি! – হরিকিংকর নাটুকে ভঙ্গিতে বলেঃ কিছুই থাকবে না, মাতৃত্ব, পিতৃত্ব, বন্ধুত্ব, প্রেম –কিছুই না। সব ধ্বংস হবে। শূদ্রের শাসন হবে। কেউ রক্ষা পাবে না।

থামেন আপনি। – মানা খেঁকিয়ে ওঠে – দ্যাকতে পান নাই, কত বড় বড় বাড়ি ওঠে! ব্যালা আটটার মন্দে তিরিশ টাকা কিলো মাচ বাবুদের ব্যাগে ওঠে।

বোঝে না – ওরাও বোঝে না – ওরাও ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রলয়ের আগুন সাধু অসাধু বিচার করে না, রাজাপ্রজা বিচার করে না প্রলয়ের আগুন.....

চায়ের দোকানে রোজই খবরের কাগজটা একবার দেখে আসে হরিকিংকর, বলেঃ আজ কাগজে দেখলাম – ৪৭৮২ জনের মৃত্যুর খবর। দৈনিক যদি তিন চার হাজার মানুষ মারা যায়, তবে বসুমতী মনুষ্যহীন হতে ক-বছর লাগবে?

পেঁচি কারুর কথায় বিশেষ কান দেয় না। সে তার তিনটি পাপের গায়ে হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে চোখ বোজে। আগে এখানে ট্রেনের শব্দে মাটির ঝাঁকানিতে তার ঘুম আসত না, এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। যত দিন যাচ্ছে, তত বেশি হেঁটে ভিক্ষে করতে হচ্ছে – হাঁটু দুটো রোজ কামড়ায়, চোখ ভেতর দিক থেকে টানে, জ্বালা করে। বুকে আজকাল অম্বলের ঠেলায় নিশ্বাস আটকে আসতে চায়। ভিখারীর জীবন, কখন আছে, কখন নেই। সে যদি হঠাৎ মরে যায় – কী হবে এ-তিনটে পাপের? অত ভেবে কী হবে? আর পাঁচটা মৃত ভিখারীর ছেলেমেয়েদের কপালে যা ঘটছে তাই হবে।

এ সময়ে পেঁচি রোজই রাম বাউরির শ্রাদ্ধ করে আপন মনে।

মানা ও তার পঙ্গু স্বামীর ঝগড়ার চিৎকারে পেঁচির ঘুম ভেঙে যায় আচমকা। এ ঝগড়া ওদের প্রায়ই হয়। মানা চায় তার ছেলেমেয়েদের বেচে দেবে, আপত্তি করে স্বামী।

সে বলেঃ জীব দিয়েছেন যিনি, তার চিন্তা করেন চিন্তামণি। তুমার অত চিন্তা কিসের?

খেতে দিতে পার নাই, পরতে দিতে পার নাই। লোজ্জা করে না তুমার? ভিখারী!

ভিখারী বললে চটে মানার স্বামী ভ্যাকা। কত লোক রোজ ভিখারী হয়ে যাচ্ছে। সে কি শুধু শুধু? অথবা নিজেদের দোষে? তারা ছিল চাষী। ক্রমাগত দিনকে দিন অভাবে অভাবে – কাজ না পেয়ে পেয়ে এমন হল। কে ঠকায়নি তাদের? বামুন জমিদার, অনাদি দোকানী, জঙ্গলের কন্টাকটর, বাঁধ কাটার মহাজন – কে বাদ গেছে? ভিখারী কি শুধু শুধু হল, তাই বলে তুই মা হয়ে ছেলে বেচে বেচে খাবি?

মায়ের চেয়ে বাপের দরদ বেশি! শুনলেও হাড় জ্বইলে যায়।

তবে যে?

সে আমি বুঝব। একদিন সব-কটার গলা টিপে রেখে চলে যাব – বিহানবেলা! –বলতে বলতে মানার দু-পাটি দাঁতের কড়কড় শব্দ শোনা যায়।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়ে পেঁচি তার তিনটি পাপ আঁকড়ে ধরে। ক-দিন বাদে সকালে উঠে দ্যাখে বাদল বুকের পাশে নেই। ডাকে – চিৎকার করে ডাকে, নেই – বাদল নেই। বাদল-বাদল-কুথায় গেলিরে –

খবরটা খোঁদলের মানুষদের কানে পৌঁছে যায়। তারা সবাই জড়ো হয়, চারধারে দ্যাখে। না বাদল নেই। ভিখারীর ছেলে হলে হবে কী ছেলেটা যে বাবুদের ছেলের মতোই ডাগর ডোগর ছিল! বাদলের সঙ্গে-সঙ্গে বারোয়ারী পিসি চনাও নেই। নেই তো নেই। পেঁচি যতই বুক চাপড়াক, কপাল ঠুকুক, চিৎকার করে কাঁদুক –বাদলকে কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না।

হরিকিংকর বলে –বিদেশে চালান যাচ্ছে – শিশু ক্রীতদাস করবে।

ভ্যাকা বলে – ছেলে চুরি করেই তো পকেটমার, চোর বাটপাড় তৈরি করে।

পেঁচি সারা দিন ভিক্ষেয় যায় না – বিকেলে তার কান্নার তেজ কমে যায় – অনাহারে আর কতক্ষণ দম থাকে?

মানা বলেঃ থাম তো পেঁচি। তুই তো বেঁচেই গেচিস।

পেঁচি উত্তর দেয় না – নীরব কান্নার দমকে দু-চোখ লাল করে মানার দিকে থমথমে ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

মাস চারেক পার হয়ে যায়। ভিক্ষে করতে বেরোয় পেঁচি, বাদল চুরি যাবার এক দিন পর থেকেই শীত চলে যায়, বসন্ত পার হয়ে গেছে। খাঁখাঁ করছে রোদ। খালি গায়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে গলা পিচে ভিক্ষে করে নিয়ে যখন ফেরে ভিখারীরা, তখন তাদের অবস্থা ভাজা চিংড়ির মতো।

একদিন হরিকিংকরকে পেঁচি বলে, পিসিকে



"মা, আমার খিদে পাচ্ছে..."

বাচ্চাদের সব সময়ই খিদে পায়—আর আশ্চর্য, তার কোনো সময় অসময় নেই। এবং কোনো মা-ই কি এই ছোট্ট সহজ কথাগুলোকে ফেলতে পারে? কিন্তু আপনিও তৈরী। কারণ সুস্বাদু পুষ্টিকর চমৎকার খাবার তৈরী করার জন্য আপনার হাতে আছে ম্যাগি। পাঁচটি চমৎকার ফ্লেবার– চিকেন, মসালা, ক্যাপসিকা, লাসানিয়া এবং সুইট সাওয়ার দিয়ে খাবার তৈরী করে দিন।

অবশ্য বাচ্চারা তো রকমারী খাবারেরই ভক্ত। আর ওদের জন্য নতুন নতুন খাসা রান্না করতে আপনারও ভাল লাগবে।



ক্রাঞ্চি মসালা

উপকরণ

১ প্যাকেট মসালা টেষ্টমেকার সহ ম্যাগি ২ মিনিট নুডলস
বড় (টেবিল) চামচের ১ চামচ তেল
৫০ গ্রাম (½ কাপ) কাঁচা চিনেবাদাম
১½ কাপ (২০০ মিলিলিটার) জল
১টা কাঁচা লঙ্কা, কুচিয়ে
১ গোছা ধনে পাতা, কুচিয়ে

পদ্ধতি

চিনেবাদাম তেলে বেশ বাদামী করে ভেজে রেখে দিন।
জল ফুটতে দিন। জল ফুটে গেলে টেষ্টমেকার এবং ম্যাগি-মিনিট নুডলস ও কাঁচা লঙ্কা মেশান।
২ মিনিট ফুটতে দিন।
ভেজে রাখা চিনেবাদাম মিশিয়ে নিন এবং পরিবেশন করার আগে ধনেপাতা ছড়িয়ে দিন।

বিনামূল্যে!

ম্যাগি
ব্যাঞ্জন পুস্তিকা
আপনার জন্য একটি পুস্তিকা পাঠাতে লিখুন এই ঠিকানায়:
পোস্ট বক্স নং ৩৮৫৫
নিউ দিল্লী

MAGGI®
2-Minute noodles

রান্না হয় তাড়াতাড়ি! খেতে লাগে মজাভারী!

FSL-8554 BEN

আজ ধরতে গিয়েও ধরতে পারলাম নাই। ধল্লে যা করতম নাই? – উত্তেজনায় সে হাঁপাতে থাকে।

কোথায়?

ব্যালঘরিয়ায়। পিসি আমাকে দেখেই ছুটতে-ছুটতে একটা টেরেনে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। আমি উঠতে পারলাম নাই। ধল্লে হোথাকেই চাবড়ে সাবাড় করে দিতম! যা চুলের ঝুঁটিটি ধত্তম নাই। – পেঁচির চোখ দুটিতে হিংস্রতা জ্বলে ওঠে!

সেদিনের পর থেকে পেঁচি আর পাঁচ লাইনে ভিক্ষে করতে যায় না। বরানগর থেকে দমদম, দমদম থেকে বেলঘরিয়া। বলতে গেলে, বেলঘরিয়া কেন্দ্র করে চার দিকে ভিক্ষে করে। কম হলেও করে। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে চনা পিসিকে খুঁজে পাওয়া কি সহজ? দু-মাস চলে যায়। আকাশ প্রায় মেঘাচ্ছন্ন থাকে, বৃষ্টি হয় খুবই কম। দমকা বাতাসে মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যায়। ভ্যাপসা গরমে ঘুরতে ঘুরতে গলা শুকিয়ে যায়, চোখ টেনে আসে।

বি টি রোড পার হয়ে ঘুরতে ঘুরতে চলে আসে গির্জাতলায়। কী রকম একটা যন্ত্রণায় মাথাটা পাহাড়ের মতো ভারী মনে হয় – গির্জার প্রায় সামনে এক বাড়ির রকে আঁচল পেতে শুয়েই, মাটিতে পা ঝুলন্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে। হঠাৎ দেখলে বোঝা মুশকিল জীবিত না মৃত।

– অ্যাই! অ্যাই মাগী! ওট-ওট – দ্যাকো না দিলে রকটা নোংরা করে, অ্যাই মাগী!

একটা লাঠির খোঁচায় ঘুম চটে যায় পেঁচির। লাল চোখ কচলাতে কচলাতে দেখে, এক পেটমোটা, ধবধবে ৫০ ইঞ্চি গেঞ্জি, চওড়া-পেড়ে, ফিনফিনে ধুতি পরা এক ভদ্রলোক – ডান হাতের চার আঙুলে হীরা মুক্তো বসানো চারটি আংটি।

সেদিন ছিল রবিবার। হীরা ঘোষ সামনের পুকুরে, সিমেন্টের সুগোল ছাতার তলায় বাঁধানো চত্বরে সকাল বেলার বৈঠক সেরে বাড়ি ঢুকছিল। পেঁচিকে দেখে তার গা জ্বলে গেল।

গির্জার পাশের দোতলা বাড়িটাও হীরা ঘোষের। তার দোতলায় বারান্দার রেলিংয়ের ফাঁকে একটা শিশু কোলে এক বউ। দুচোখের ঘোলাটে দৃষ্টি যখন থিতিয়ে আসে পেঁচির, সে শিশুটিকে দেখে হীরা ঘোষের গালাগাল ভুলে যায়। কয়েক মিনিট নিঃশব্দে শিশুটির দিকে তাকিয়ে থাকে। বাদল। দু-হাত তুলে ঠিক এক পাগলির মতো গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে – বাদল-বাদল-বাদল বলতে বলতে এগিয়ে যায় রেলিংটার তলায়।

পেঁচির চিৎকারে মানুষ জড়ো হয়। কিন্তু হীরা ঘোষ হাসতে হাসতে সবাইকে বলে –পাগলি। শুনে বাচ্চাদের প্রাণে মজা গেঁজিয়ে ওঠে – পেঁচি যতই বাদল বাদল বলে চেঁচায়, বাচ্চারাও তত চেঁচায়, 'পাগলি পাগলি' বলে। শেষে যখন পেঁচি কান্নায় ভেঙে পড়ে তখন হীরা ঢিল ছুঁড়ে মারে – শালার আপদকে মেরে বিদেয় করবো। বাচ্চারাও ঢিল ছুঁড়তে থাকে।

পেছোতে হয় পেঁচিকে। ইতিমধ্যে তার ভিক্ষের সব চাল মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। তাকে স্টেশনের পথ ধরতে হয় এক সময়।

হীরা ঘোষ নামকরা মুহুরী। লোকে বলেঃ এ অঞ্চলের যত ফ্যাক্টরির মালিক, এক নম্বর বা দু-নম্বর ব্যবসা চালায়, হীরা ঘোষের তারা সবাই মক্কেল। আর জজ-সাহেবকে হাত করার কৌশল নাকি হীরা ঘোষের বিশেষ গুপ্ত। এমন বেশ কয়েকজন মক্কেল আছে, যাদের একটি কারখানা পাঁচটিতে পরিণত হতে যে কেসগুলি হয়েছে, তাদের পরিচালক হীরা ঘোষ। পঞ্চাশ ষাট থেকে এক দেড়শো শ্রমিক কাজ করে এমন কারখানা। মালিকেরা বাঙালি পাঞ্জাবি বিহারি বা মারোওয়াড়ি। হীরা ঘোষের একটাও বাড়ি ছিল না। এখন সে ছোট-বড় পাঁচটি বাড়ির মালিক।

বেলঘরিয়া স্টেশনে চার নম্বর লাইনের শেডের তলায় বাঁধানো বেঞ্চে বসে বসে পেঁচি চোখের জল মোছে। কেমন ক্লান্ত লাগে তার। ইচ্ছে হয় না ফিরে যায়। কষ্ট যেন আর সহ্য হয় না। মনে হয়, এ মুহূর্তে যদি তার প্রাণটা চলে যেত।

আকাশ পরিষ্কার। খাঁ খাঁ করছে রোদ। অ্যাশবেস্টরে হলকায় গা ঝলসে যাচ্ছে।

উত্তর প্রান্ত থেকে চনা আসছে! দু-চোখ কচলে তাকায় পেঁচি – হ্যাঁ চনা পিসি! সে বেঞ্চির পেছনে চুপচাপ বসে পড়ে। কাছে আসতেই, উঠে ছুটে গিয়ে দু-হাতে চনা পিসির গলা আঁকড়ে ধরে। এখখুনি এখখুনি শেষ করে দেবে। চনা ঝটাপটি করে। পড়ে যায় মাটিতে। লোকজন জড়ো হয়ে যায়। এলাকার যুবকরা মাথা গলায়। পিসি ও পেঁচিকে গণ সংস্কৃতির অফিসে যেতে হয়। শ্রমিকের পড়ুয়া ছেলে বিভাস বলেঃ সকলে একটা করে রুটি নিয়ে এসো। দু-জনেই অভুক্ত। পনের কুড়ি মিনিটের মধ্যেই ১৫/১৬টা রুটি জড়ো হয়। এলাকার নরনারী অফিস ঘরে এসে কেউ কেউ দেখছে, কেউ কেউ দেখে শুনে চলে যাচ্ছে। যে-যেমন মন্তব্য করছে।

হাতে বালা, বুক খোলা টেরেলিন হাওয়াই শার্ট, জিনের চোঙা ফুলপ্যান্ট, কাঁধ পর্যন্ত চুল –তপন সব দেখে শুনে বলেঃ পিসি না ছাই। এটা ডাইনি। পিটিয়ে মেরে ফ্যাল।

তপনদা তুমি মারো না।

মারতে পারি। দেখতে চাও?

সবাই জানে, এ বিষয়ে তপনের অখ্যাতি আছে। যুবকরা চনা পিসিকে বেষ্টন করে রাখে। পিসি কাঁদছে, আপন মনে বিড়বিড় করছেঃ যা করছে সে পেটের জ্বালায়। আর, করে কি তেমন কিছু লাভ হয়েছে? বলেছিল ৫০, টাকা মিলবে। মিলেছে মাত্র ১০ টাকা। আর দমদম ক্যান্টনমেন্টের জাপান ও বাবলু ওরা পেয়েছে পাঁচশো টাকা – একসঙ্গে, থোক।

তপন বলেঃ পুলিসে দিয়ে দে। প্যাঁদানি খেলেই সব জানা যাবে।

পুলিস? – একজন বলে – পুলিস তো বড়লোকের মুখ শুঁকবে।

কী করা যায়? এই আলোচনা অনেকের অনেক কাজ বাতিল করে দেয়। পেঁচি খোঁদলে একবার ফিরে যাবার জন্য ছটফট করে। বাদলকে কোলে করে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেটাও পরিত্যাগ করতে পারে না। শেষে ঠিক হয়, আজকের মতো পেঁচি ফিরে যাক, কাল সকালে ছেলেরা আগে হীরা ঘোষের সঙ্গে কথা বলুক নটা-দশটার সময় যেন পেঁচি অফিসে আসে।

সব বয়সের মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে সকালে জনা দশেক ছোকরা হীরা ঘোষের পুকুর ধারে সেই সিমেন্টের ছাতার তলায় হাজির হয়। হীরা ক-জন মক্কেলের সঙ্গে সেদিনের কেস-টেস নিয়ে কথা বলছিল।

কী দরকার?

আপনার বাড়িতে একটা বাচ্চা আছে।

একটা কেন, তিন-তিনটে বাচ্চা আছে – হীরা এদের দেখে বুঝে নিয়েছে ছেলেরা বে-পাড়ার।

বিভাস, যার গলার স্বর ফ্যারেনজাইটিসে ফ্যাশফেশে, খুবই রোগা, কিন্তু খুবই তেজী, সামনে যায়, বলে, আপনি একটা বাচ্চা কিনেচেন, পাঁচশো টাকা দিয়ে, তাকে দিতে হবে। সে এক ভিখিরীর ছেলে।

কে বললে, সেই পাগলিটা? – হো হো শব্দে হেসে ওঠে হীরা ঘোষ, পাশের আম গাছ থেকে কটি পাখি উড়ে যায় – যা মানুষ বেড়ে যাচ্ছে, সরকার তাই ঠেকাতে পারচে না। এ সময় কেউ মানুষ কেনে!

বিভাস নাছোড় সে বলে, আপনার মেজো বউয়ের ছেলেপুলে নেই। তার জন্যে একটা ছেলে কিনেচেন, নাম বাদল?

হীরা ঘোষ তেড়িয়ে ওঠে, যাও যাও, আমার কাজ আছে।

মানুষ জড়ো হয় যারা হীরা ঘোষের পরিচিত ও প্রভাবিত, তারাই সংখ্যায় বেশি। বিভাসরা বেগতিক বুঝে পশ্চাদ্‌পসরণ করে। লজ্জায় পরাজয়ে ছেলেরা বিশেষ কথা বলতে পারে না।

বাড়ি ফেরার আগে তারা থানায় একটা ডায়েরী করে যায়। এটাও বলে, তারা সন্ধে বেলা আর একবার চেষ্টা করবে।

ফিরে এসে ছেলেরা পিসির ওপর ঝাল ঝাড়ে। চনা পিসি মেঝেতে কপাল ঠুকতে ঠুকতে বলে সে নিজের হাতে হীরা ঘোষের মেজো বউয়ের কোলে বাদলকে তুলে দিয়ে এসেছে। প্যাটের জ্বালায় অপকম্ম করেছে বলে কি একবারে অমানুষ হয়ে গেছে?

দশ বছর থেকে তেইশ বছরের কিশোর যুবক বাহিনী সন্ধের পর হীরা ঘোষের বাড়ির সামনে হাজির হয়। সঙ্গে চনা পিসি ও পেঁচি।

মুক্তাময়, হীরার বড় ছেলে, লনে স্কুটারের স্টার্ট বন্ধ করে এক দৌড়ে বাড়ি ঢোকার মুখে 'ও বড়দা, শুনুন, একটু শুনুন' শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে, ফিরে এগিয়ে আসে পায়ে পায়ে। মুক্তাময়ের চুল কদমছাঁটি, মোটা গেঞ্জি, খাকি জিনের দামী প্যান্ট,

পায়ে কম্বাইন্ড শু। ব্যায়াম করা পেশী, ছোট-ছোট কুতকুতে চোখ, চাপা থ্যাবড়া নাক –বেশ ফর্সা গায়ের রঙ।

কী চাই?

একটি কি দুটি বাক্য শুনেই তেড়ে-মেরে মারতে যায়, যাও, ভাগো হিঁয়াসে।

চনা পিসি বকে চলে। তাকেও ধমক লাগায় – কী যা তা বকচিস বুড়ি। যা ভাগ এখান থেকে।

আশপাশের প্রায় এক ডজন বাড়িতে রেডিওতে তখন রবীন্দ্রনাথের 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো' গানটা গেয়ে চলেছে কোনো নারীকণ্ঠ।

হীরার দ্বিতীয় পুত্র মানিকরত্ন বেরিয়ে আসে, আশপাশের মানুষও জড়ো হয়। মানিকরত্ন বলেঃ কী শুনতে হবে? অ্যাঁ? – তার চোখে মুখে আক্রমণাত্মক হাবভাব।

আমাদের কথাটা একবার শুনুনই না। – এই বাক্যটা কতবার বলল বিভাস তার হিসেব নেই।

আমি দিয়েচি তুমাদের মেজো বউয়ের হাতে – বাদলকে।

পিসিও এই একটাই কথা তখন থেকে সাতবার বলেছে।

বাদলকে ওই দোতলায় দেখেচি। – পেঁচিও হুংকার ছাড়ে বাঘিনীর কণ্ঠে, যদিও তার বুকে একটা গোপন ভয় শিরশির করে।

লোকজন আরও জড়ো হতে দেখে মানিকচন্দ্র ফেটে পড়ে, মজা পেয়েচো তোমরা? জানো না, তোমরা আমাদের প্রেস্টিজ পাংচার করে দিচ্চ! – পিসিকে দেখিয়ে বলে – এটা এক ডাইনি। ব্ল্যাকমেইল কত্তে এয়েচে। দাদা; ঝাড়ো দেখি কয়েকটা – সব সিধে হয়ে যাবে।

মানিকচন্দ্র ধাঁ করে চনা পিসির পেটে ঘুঁসি চালিয়ে দেয়, পিসি পড়ে যায়, মুক্তাময় কোত্থেকে একটা বাঁশ নিয়ে এসে পিসিকে পেটায়, দুচার ঘা পড়ে পেঁচির কপালে। কাঁচা রক্ত, পিসি ও পেঁচির আর্তনাদ। ছেলেরা হতভম্ব হয়ে যায়। তারা তো আর মারামারি করতে আসেনি, এসেছিল ভদ্রভাবে ব্যাপারটার একটা ফয়সালা করতে। তারা মর্মাহত সুরে কেবল বলে চলেঃ কী কচ্চেন, কী কচ্চেন? আপনারা যে ভদ্রলোক! অবলা মেয়েদের মারধোর কচ্চেন।

শালা শুয়ারকা বাচ্চা, ভদ্রলোক না তো কি ছোট লোক? – বলে এবারে মুক্তাময় বাঁশটা বনবন শব্দে ঘোরাতে থাকে। লাঠির মতো, – বলে চলেঃ ভিখিরী কখনো ভদ্রলোক হয় নাকি?

পিসি ও পেঁচিকে ধরাধরি করে ছেলেরা ফিরে আসে। নিজেরাই রুমাল দিয়ে কাটা জায়গাগুলো চেপে ধরে। বিটি রোডের ওপর এক ডিসপেন্সারী থেকে তুলো -নিয়ে ওদের ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ করে দেয়।

কে বলেঃ চল। থানায় চল।

কিস্যু হবে না। – বিভাস বলে।

ডিসপেন্সারীর কাউন্টারে একজন বলে, হীরা ঘোষের বাড়িতে নাকি পুলিস এসেছিল। ঝুটঝামেলা হটিয়ে দিতে বলে গেছে।

কী করবি। কী করা যায়। – সকলের গভীর প্রশ্ন।

আমরা একটা ভুল করেচি। স্থানীয় মানুষদের কাছে ব্যাপারটা বলিনি। বাদলকে বের করে আনতেই হবে।

সবাই বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ আনতেই হবে। এমন পরাজয় কি সহ্য করা যায়?

সকলেই হতাশায় অপমানে উত্তেজনায় মনে-মনে নিজেদের ধিক্কার দিতে থাকে। কী করলাম আমরা?

পিসি ও পেঁচির চোখ মুখ বসে গেছে – ওদের চোখের জল শুকিয়ে গেছে। দিশেহারাও হয়ে গেছে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকছে কিছু শুনলেই।

আপনারা কাল, না না পরশু সক্কালে আসুন, আমরা ও-পাড়ার মানুষদের বলে রাখি। পরশু সকালে আরও বেশি মানুষ নিয়ে যাবো হীরা ঘোষের বাড়ি। কোনো ছাড়ান নেই। বিভাস বলে কথাগুলো খুবই আন্তরিকতার সুরে।

সবাই সজোরে বলেঃ হ্যাঁ হ্যাঁ। পরশু!

পরশু? ঠিক আচে বাবা। পরশু সকালেই চলে আসব। চল পেঁচি – চল – তোর কপালে খুব লেগেছে, না রে? – পেঁচির কপালটা পিসি সস্নেহে দেখতে থাকে অথচ নিজের সারা অঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা।

ছবি: পোলারিশ

মাত্র কয়েকমিনিট সবুর, হয়ে উঠুন ফর্সা, আরও লাবণ্যে ভরপুর

ফেম ইনস্টোব্লীচ পরখ করুন আর দেখুন একবার তফাতটা



আপনার সৌন্দর্য পুরোপুরি খোলতাই হতে বাধা দেয় এক আপনার ময়লা রং, আর মুখে অবাঞ্ছিত রোম। প্রায়ই আপনি ভাবনায় পড়েন—তাইতো, এব্যাপারে কিই বা করা যায়?

এবার ভাবনাচিন্তায় পালা আপনার চুকল, পেয়ে যাচ্ছেন খুবই সহজ এক চটজলদি সমাধান। এর যাদু আপনাকে করে তুলবে রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে চেয়ে দেখার মত কমনীয় লাবণ্যে ভরপুর, আর তা মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই!

ফেম ইনস্টোব্লীচ ক'রে তোলে আপনার ত্বক আরও উজ্জ্বল, আরও পেলব

আপনার বাহুর দিকেই চেয়ে একবার দেখুননা, যে অংশটুকু জামায় ঢাকা থাকে, তার সঙ্গে খোলা অংশের রং ও পেলবতার কতখানি পার্থক্য। সূর্যের তাপে মেলে রাখা বাহুর আঢাকা অংশটা দেখুন কত কালচে। যখন এই আঢাকা অংশে আপনি ফেম ইনস্টোব্লীচ ব্যবহার করবেন, তখন আপনার ত্বকের রং অন্ততঃ দুই বা তিন পোঁচ বেশি ফর্সা দেখাবে! শুধু তাই নয়, আপনার ত্বক হয়ে উঠবে আরও স্নিগ্ধ ও মোলায়েম!

সেইসঙ্গে—নিশ্চিন্ত হোন, ফেম ইনস্টোব্লীচ লুকিয়ে ফেলে মুখের রোম

মুখে রোম, ইস্ কি বিচ্ছিরি লাগে বলুনতো! ফেম ইনস্টোব্লীচ কি করে জানেন, অবাঞ্ছিত রোম আপনার গায়ের রংএর সঙ্গে একেবারে বেমালুম মিলিয়ে দেয়! এমন মিশ খাইয়ে দেয় যে দেখাই যায়না।

ফলাফল? সেই আপনিই, রংএ আরও উজ্জ্বল, লাবণ্যে আরও ভরপুর, আকর্ষণে অনন্য আর এক আপনি।

তবে আর দেরী কিসের? কিনে ফেলুন ফেম ইনস্টোব্লীচ আর হ'য়ে উঠুন নজরে-পড়া মনে-ধরা এক রূপের প্রতিমা! আজকেই!

ফেম ইনস্টোব্লীচ ভারি সুবিধের এক নিরাপদ ক্রীম ব্লীচ। আপনাকে আর হাইড্রোজেন প্যারক্সাইড, অ্যামোনিয়া ও ব্লীচিং পাউডার মেশাবার ঝামেলা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবেনা!

ভি.পি. ডাকে পেতে ও ব্যবসায়িক অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন

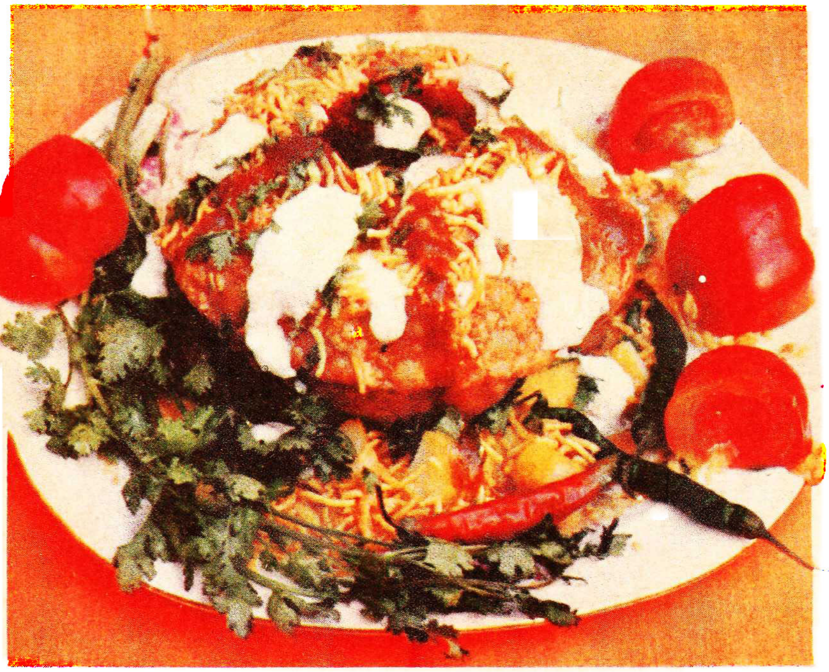
এ-১০, মডেল হাউস, প্রোক্টর রোড, বম্বে ৪০০ ০০৪.

৭০গ্রাম প্যাকের ভি.পি. ডাকখরচা সমেত টা ৩০/-

ফেম

ইনস্টোব্লীচ

বিনা ঝামেলায় ব্লীচিং করুন।



দহি-কচুরি

লাইট হাউসের সামনে দিয়ে যেতে যেতে দোকানের শো-কেসে রাখা লালচে রঙের বড় বড় সাইজের দহি-কচুরি বা রাজ-কচুরি কার না মন টানে! এগুলি খেতে খুবই ভাল – বাড়িতে তৈরি করাও এমন কিছু শক্ত নয়। নামী খাবারের তুলনায় তৈরি করার খরচও খুব কম। সম্পূর্ণ নিরামিষ এই খাবার। বোম্বাইয়ে দহি-কচুরি জনপ্রিয় – সেই হিসেবে দহি-কচুরি বা রাজ-কচুরিকে মহারাষ্ট্রের খাবার বলা যেতে পারে।

উপকরণ ঃ ময়দা ২০০ গ্রাম, বেসন ৪ টেবিল চামচ, ময়ানের জন্য বাদাম বা রেপসিড তেল ২ চা-চামচ, মিষ্টি চাটনি ১ বাটি, নুন দিয়ে ফেটানো পাতলা টক দই ১ বাটি, মিহি কাঠিভাজা ৪ টেবিল-চামচ, কুচোনো ধনেপাতা ২ টেবিল-চামচ, ওপর থেকে ছড়াবার জন্য নুন, জিরেভাজা গুঁড়ো, লংকার গুঁড়ো ও বিট নুনের গুঁড়ো।

পুরের জন্য চাই ঃ সেদ্ধ করে খোসা ছাড়ানো ও কুচোনো আলু ২ কাপ, পকৌড়ি ২৪টি।

পকৌড়ির উপকরণ ঃ বেসন ১ কাপ, আটা ১ কাপ, নুন আন্দাজমত, হিং সামান্য, খাওয়ার সোডা সামান্য, ভাজবার জন্য বাদাম বা রেপসিড তেল।

মিষ্টি চাটনির উপকরণ ঃ পাকা তেঁতুল ৫০ গ্রাম, গুড় ৩ টেবিল-চামচ, ভাল পাকা খেজুর ৮টি, নুন আন্দাজমত, জল আন্দাজমত, ফোড়নের জন্যে সামান্য সরষে, হিং ১ চা-চামচ ও বাদাম বা রেপসিড তেল।

মিষ্টি চাটনির প্রস্তুত-প্রণালী ঃ তেঁতুল ও গুড় অল্প জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখবার পর হাত দিয়ে চটকে তেঁতুলের কাই বার করে নিতে হবে। গুড় গলে গেলে সবটা ছেঁকে দিতে হবে। আন্দাজমত নুন দিতে হবে।

খেজুর আগে থেকেই জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। শিলে মিহি করে পিষে নিতে হবে।

১ চা-চামচ তেল গরম করে সরষে ও হিং ফোড়ন দিতে হবে।

তেলটা খেজুর ও তেঁতুলের মিষ্টি চাটনির ওপর ঢেলে দিতে হবে।

পকৌড়ির প্রস্তুত-প্রণালী ঃ ১ কাপ আটা, ১ কাপ বেসন, নুন, হিং ও খাওয়ার সোডা জলে গুলে ফেটিয়ে নিয়ে গরম ছাঁকা বাদাম বা রেপসিড অয়েলে মাঝারি সাইজের বড়া হালকা বাদামি করে ভেজে নিতে হবে।

ভাজার সংগে সংগেই বড়াগুলিকে জলের মধ্যে ফেলতে হবে।

১০ মিনিট পরে জল থেকে তুলে নিংড়ে নিয়ে কোনো বাসনে রাখতে হবে।

দহি-কচুরির প্রস্তুত-প্রণালী ঃ ২০০ গ্রাম ময়দা জল দিয়ে মেখে নিতে হবে। অল্প লাল রঙ (খাওয়ার রঙ) মিশিয়ে নিতে হবে। নুন বা ময়ান দিতে হবে না। ভিজে কাপড় ঢাকা দিয়ে অন্তত কুড়ি মিনিট রাখতে হবে।

বেসন শুকনো খোলার অল্প আঁচে হালকা বাদামি না হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিতে হবে।

নামিয়ে নিয়ে ২ চা-চামচ তেল মেশাতে হবে এবং কয়েক ফোঁটা জল ছেটাতে হবে। সমস্তটা ঝুরঝুরে থাকবে।

ময়দার ছোট ছোট লেচি কেটে নিতে হবে। হাত দিয়ে চেপে চেপে লেচিটা একটু বড় করে নিয়ে, বাটির মত করে নিয়ে ভেতরে বেসন ভরে দিতে হবে।

এবারে হালকা হাতে লুচির মত বেলে নিতে হবে। কড়াইয়ে বেশি তেল দিয়ে অল্প আঁচে শক্ত না হওয়া পর্যন্ত ভাজতে হবে।

কীভাবে পরিবেশন করতে হবে ঃ কচুরির মাঝখানে ফুটো করে নিতে হবে। কচুরির ভেতরে টুকরো করে কাটা আলু ও দুটি করে পকৌড়ি ভরতে হবে।

ওপর থেকে নুন মেশানো পাতলা টক দই ও খেজুর-তেঁতুলের মিষ্টি চাটনি ছড়িয়ে দিতে হবে।

তার ওপর থেকে নুন, লংকার গুঁড়ো, জিরেভাজা গুঁড়ো ছড়িয়ে দিতে হবে।

সবচেয়ে ওপরে ছড়াতে হবে মিহি কাঠিভাজা ও কুচনো ধনেপাতা।

পরিবেশন করার সংগে সংগেই খেয়ে ফেলতে হবে। তা না হলে মুচমুচে থাকবে না। খাওয়ার সুবিধের জন্যে অনেকে কচুরিতে চাটনি দেওয়ার আগে কচুরিটা দাবিয়ে দিয়ে ওপর থেকে চাটনি ছড়িয়ে দেন।

এইভাবে কোনো এক ছুটির দিনে বাড়িতে বিকেলের জলখাবারে দহি-কচুরি বানিয়ে ফেলুন। দেখবেন ছেলে-বুড়ো-বাচ্চা সকলেই খেয়ে কীরকম খুশি হবে ও তারিফ করবে।

সাধনা মুখোপাধ্যায়

দিল্লিতে মাছ বাঙালির গর্ব হয়ে আছে

রাজীব গান্ধী মন্ত্রিসভার প্রথম বাজেটে অর্থমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং পেট্রল, ডিজেলের দাম বাড়াবার প্রস্তাব দিলেও রাজধানী দিল্লির ট্যাক্সি, অটো, বাস, মিনিবাসের দাম মার্চের শেষ সপ্তাহেও বাড়েনি। ওই নিয়ে হৈচৈও নেই। কিন্তু এই সময় দিল্লিতে এবার বাতাসে আগুনের উত্তাপটা যেন একটু বেশি। তবে সূর্যোদয়ের আগে বা সূর্যাস্তের কিছু পরের আবহাওয়াটা বেশ ভাল, ইংরাজিতে যাকে বলে প্লেজান্ট। একেই তরুণ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সর্বত্র কাজে চাঞ্চল্য বেড়েছে। কোনো দফতরে গিয়ে চাতক পাখির মত দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হচ্ছে না। লালফিতের বাঁধন আপাতত অনেক কম।

কিন্তু দোকান বাজার করেন যারা, তাদের বড় দুঃসময়। দিল্লিতে নিরামিষ-ভোজী মানুষের সংখ্যাই অধিক। তাই শাক-সবজির দামটা তুলনামূলকভাবে বেশিই। কিন্তু শীত এলে ভারতের অন্যান্য শহরে যেমন, এখানেও দাম খানিকটা তার কাছাকাছি নামে। তবে রাজধানী তো, তাই অন্যান্য শহরের মত হয় না। বরং বলব এবার শীতে রাজধানীর প্রতিটি বাজার – তা চিত্তরঞ্জন পার্ক হোক, আই এন এ মার্কেট হোক, হোক না খান বা খান্না মার্কেট – সর্বত্রই দামটা একটু চড়া ছিল। তবুও তা

গায়ে লাগেনি। দাম চড়ার কারণ পাঞ্জাব থেকে সরবরাহ কম ছিল।

তবে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে বাজারের হাল দিল্লির গরম আবহাওয়ার সঙ্গে যেন মিল রেখে এগিয়ে চলেছে। এখানে যে কটি বাজারের নাম লিখেছি, তার মধ্যেও দামে ফারাক আছে কিছু কিছু। তবে সব বাজারে নানা জিনিসের গড় দাম ধরে এখানে বাজারদর জানাচ্ছি।

শীতে যে আলু ছিল দেড় থেকে দু টাকা কিলো, এখন তা তিন টাকা। পিঁয়াজ ছিল দু টাকা, এখন আড়াই থেকে তিন টাকা। করলা ছিল ছয় থেকে সাত টাকার মধ্যে। এখন তিনি প্রায় দ্বিগুণ – দশ থেকে বারোয় উঠে আরও তেতো হয়েছেন। টম্যাটো চার থেকে বেড়ে আট টাকা। কাঁচা লঙ্কা রাউন্ড ফিগারে – কিলো প্রতি দশ টাকা। ফুলকপি এখানে ওজনে বিক্রি হয়। শীতে ছিল তিন টাকা, এখন ছয় টাকা, দাম বাড়েনি কেবল বাঁধাকপির। সে সাড়ে তিনেই বাঁধা রয়েছে। বেগুন ছিল তিন টাকা, এখন পাঁচ। তবে কাঁটাওলা সবুজ গোলাকৃতি বেগুন দিল্লিতে মিলবে না। গাজর চার টাকা ছিল, এখন আট টাকা। বিট বারো টাকা। শিম চার টাকা। বেশ দাম পটলের। ষোল টাকার কমে পাবেন না। স্যালাডের জন্য শসা কিনবেন ? তাও বারো টাকা কেজি। হাসি পাবে লাউ কিনতে গেলে। ৪০০ বা ৫০০ গ্রাম ওজনের গোটা লাউ এক-একটি। তার কিলো চার টাকা। সজনে ডাঁটার কিলো আট টাকা। ইঁচড় দশ টাকা। মাদ্রাজী ওল পাঁচ টাকা, কচুরমুখী ছয় টাকা, পেঁপে তিন টাকা।

কলকাতায় যারা নিত্য বাজারে যান, তারা বুঝবেন দিল্লিতে সবজির দাম কত বেশি! তবে কড়াইশুঁটিকে যদি সবজির মধ্যে ফেলেন, বলব ইনিই কেবল নেমে রয়েছেন। শীতে ছিলেন দু টাকা, এখন চার টাকা কিলো। সস্তা নিশ্চয়ই!

এ তো হল। অগ্নিমূল্যের সবজি, যা দিয়ে খাবেন সেই ভাত বা রুটির জন্য চাল ও আটার দামটা জেনে নিন। মোটামুটি ভাল সিদ্ধ চাল চার টাকা কিলো। খুব ভালটি সাত টাকা। আটা তিন টাকা। চালের পরেই ডালের কথা আসে। মসুর আট টাকা, মুগও তাই।

সরষের তেল – গণেশ কুড়ি টাকা। পোস্টম্যান আটাশ টাকা। কর্ণ অয়েল তিরিশ টাকা।

তবে রাজধানীতে বাঙালির একমাত্র ভরসা মাছ। দিল্লির গরমে কলকাতার মত ঘামতে হয় না। লোডশেডিংও নেই। শীতে যারা বেড়াতে আসেন, তাদের কষ্ট হয় ঠাণ্ডাটা বড় বেশি বলে। কিন্তু তখন সবজির দাম কম থাকে, আগেই বলেছি। কম থাকে মাছের দামও। এখন এই গরমেও মাছ সস্তা। এবং বাঙালির কাছে সে গর্ব হয়েই আছে।

বড় কাটা রুই আটাশ টাকা। দুই বা তিন কেজি ওজনের গোটা টাটকা পোনা পাবেন আঠার থেকে কুড়ি টাকা কিলোয়। আড়াইশ গ্রামের চারা পোনার কিলো পনের টাকা। এক বা দেড় কিলো ওজনের ইলিশ কিলো প্রতি বড়জোর কুড়ি টাকা। বড় শোল বার থেকে পনের টাকা কিলো। কাঁটা নেই – এমন মাছের দাম শুনলে ওর কাছে যেতে মন চায় না। পম্পলেট কলকাতায় কজন খান? এখানে তিনি ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে থাকেন সারা বছর। একটি কাঁটা, তাই বিদেশীদের কাছে এর ফ্রাই প্রিয়। আর চিংড়ি? গলদার বাচ্চা বলতে যা বুঝি, তারা ষাট থেকে পঁচাত্তরের মধ্যে। বড় ট্যাংরা কুড়ি টাকা। কলকাতায় যারা মৌরলার দাম শুনে ভয় পান, তারা দিল্লিতে আসুন। ভাল সাইজের টাটকা মৌরলা দশ টাকা কিলো। সস্তা পুঁটিও। দশের মধ্যেই। অন্যান্য মাছের দামও বেশ কম। এখানে জিয়ল মাছ পাবেন না। না মাগুর, না সিঙি বা কই।

তাই বলছিলাম মাছ খাবেন তো দিল্লিতে আসুন।

মাংসও কমে আছে। পাঁঠা বাইশ। মুরগি ব্রয়লার ড্রেসড পঁয়ত্রিশ, গোটা ত্রিশ টাকা। ডিমের ডজন আট টাকা।

আরও কয়েকটি জিনিসের দাম জানাই। রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বাজেটের আগে ছিল পঁয়তাল্লিশ টাকা। এখন একান্ন টাকা। বনস্পতি আঠার টাকা। প্যাকেট নুন এক কিলো দেড় টাকা। চিনি আট টাকা। মাদার ডেয়ারির দুধ এক লিটার পাঁচ টাকা দশ পয়সা, কিন্তু টোকেনে এক লিটারের দাম এক টাকা চল্লিশ পয়সা। টোকেনের দুধ সস্তা হলেও বেশ ভাল। আমাদের হরিণঘাটার চাইতে অনেক অনেক ভাল।

দিল্লিতে একটা জিনিস ভাল লাগবে। প্রতিটি বাজার বেশ পরিচ্ছন্ন। অন্তত কলকাতার যে কোনো বাজারের চাইতে তো বটেই। নোংরা জায়গায় কোনো জিনিস বিক্রি হয় না। সব জিনিস সুন্দর ঠোঙা বা প্যাকেটে দেন দোকানীরা। একটু ব্যতিক্রম চিত্তরঞ্জন পার্ক। বোধহয় বাঙালিবাজার বলেই। আর একটা কথা। এখানে কোনো বাজারই সকালে বসে না। সবজি, মাছ সব বসা শুরু তিনটার পর থেকে। কারণ সকালে বাজারের পর তা রান্না করে খেয়ে অফিস যাওয়া সম্ভব নয়। সকলেই তাই বাজারঘাট করেন বিকালে বা সন্ধ্যায়।

দোকান-বাজারের সঙ্গে সাধারণের যাতায়াত ভাড়াটাও জানাই। মার্চের শেষ সপ্তাহ অবধি বাসে ন্যূনতম ভাড়া ছিল চল্লিশ পয়সা। মিনিবাসে ষাট পয়সা। ম্যাটাডোর ও ডিলাক্সে সবচেয়ে কম ভাড়া। এক টাকা। যতদূরই হোক, সব দ্রুত চলে। জ্যাম-জট নেই। সময়মত অফিস-কাছারিতে পৌছনো আগেও যেত। এখন এসব আরও দ্রুত হয়েছে।

চন্দ্রিমা

ফটো : শংকর নাগ দাস



মুসলিম মেয়েরা অনেক স্বাধীন

নীনা আতাহার

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দুনিয়ায় মুসলিম নারীরা সবচেয়ে পরাধীন। কিন্তু না, হজরত মোহাম্মদের নির্দেশ অনুযায়ী বলা যায় মুসলিম ধর্মে নারীর অনেক বেশি অধিকার আছে যা অন্য কোনো ধর্মে নেই। বর্তমান প্রতিবেদনে মুসলিম সমাজের মেয়েদের অধিকারের সমস্ত দিকগুলি নিয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে।

এবং পুরুষের উপর তাহাদের ঠিক সেইরূপ ন্যায্য অধিকার আছে—যেমন তাহাদের উপর পুরুষদের আছে।'

[২ : ২২৮ নারী সম্বন্ধে আল কোরআন]

পর্দানশীন কিছু নারী, পথে বোরখা পরে স্বামীর পাশে পাশে গোবেচারী হয়ে হেঁটে যাওয়া মেয়ে, বিভিন্ন পুস্তকের বর্ণনায় তালাক এবং আশেপাশে শহরের বস্তি বা গাঁয়ের কিছু অশিক্ষিত মানুষদের একাধিক বিবাহের ঘটনা দেখে বেশিরভাগ মানুষেরই ধারণা, এই দুনিয়ায় যদি পরাধীন মানুষী বলে কিছু থাকে তাহলে তা মুসলিম নারী। এরা বাপের দাপটে অস্থির, ভাইয়ের শাসনে কম্পমান। —আর পড়ালেখা করতে হবে না খুব হয়েছে, অমন ধেই ধেই করে বাজে মেয়েদের মতো ঘুরে বেড়াস না, বিয়ের আগে এই শুনছে ঘরে বসে।

পরবর্তীকালে স্বামীর ভয় দেখানো, নিকাল দেগা, দুসরা শাদি করেগা। এইসব নানান খণ্ডচিত্রে মুসলিম মেয়েদের সম্বন্ধে অনেকেই ভেবে নেন, সত্যিই এরা বড় দুঃখী! এদের উপর সমাজে নানা অত্যাচার হয়। এরা ব্যক্তিত্বহীন, এদের প্রকৃত স্বাধীনতা বলে কিছু নেই।

কিন্তু উপরের যে ছবিগুলো তুলে ধরা হলো, মনে হয় সব ধর্মের মেয়েদের উপরই তা কিছু কিছু প্রযোজ্য। রকমফের আছে এইমাত্র। এবং সমাজে অশিক্ষিত ও কিছু গোঁয়ার মানুষদের জন্যে এসব ঘটে থাকে। আসলে স্বাধীনতা প্রাপ্তিটা বড় কথা নয়, কতোটা ভোগ করার প্রচেষ্টা, প্রবণতা সেটার উপর অনেকটা নির্ভর করে। যে পক্ষ ভোগ করবে, সমাজে তাদের মেরুদণ্ড কতো শক্ত, মানুষের সহানুভূতি কতোটা তাও দেখা দরকার।

আজ থেকে প্রায় চোদ্দশ বছর আগে ইসলাম ধর্মের সৃষ্টি। এবং পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদের সময়েই তার নানা বিকাশ হয়েছে। তিনি ৬৩ বছর বেঁচেছিলেন। মুসলিম ধর্মের যাবতীয় বিধান, যাবতীয় নিয়মকানুন, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে এই ধর্মাবলম্বীদের কাজকর্মের নির্দেশ সবই তিনি জানিয়ে গেছেন। আল্লাহর বাণী কোরানের নির্দেশও তিনি সবাইকে জ্ঞাত করিয়েছেন।

মুসলিম নারীরা সমাজে কিভাবে গণ্য হবে, কি তাদের কাজকর্ম, কতোটা স্বাধীনতা ভোগ করবে এর সবকিছুই জানা যায় কোরান ও হাদিসের বাণী থেকে। এ সব বিচার করলে এবং অন্য ধর্মের সঙ্গে তুলনা করলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই মনে হবে মুসলিম মেয়েরা অনেক স্বাধীন।

নারীদের সম্বন্ধে হজরত মোহাম্মদের বক্তব্য : 'তোমাদের মধ্যে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ, যাঁরা তাঁদের স্ত্রীদের প্রতি শ্রেষ্ঠ ব্যবহার করে।'

'কোন মুসলিম তাঁর স্ত্রীকে ঘৃণা করবে না। সে যদি তার একটি দোষের জন্যে অসন্তুষ্ট হয় তবে অন্য আর একটি গুণের জন্যে তার উপর সন্তুষ্ট হবে।'

'তোমার স্ত্রীকে সদুপদেশ দাও, ক্রীতদাসীর মতো সম্ভ্রান্ত স্ত্রীকে প্রহার কোর না।'

'তোমরা যখন খাবে স্ত্রীদেরও খেতে দেবে। যখন নতুন বসনভূষণ পরবে স্ত্রীদেরও পরতে দেবে।'

এইরকম বহু উপদেশ তিনি দিয়ে গেছেন। তাঁর সময়ে সমাজে মেয়েদের স্থান ছিল খুব নিচে। তাদেরকে ভোগের সামগ্রী মনে করা হতো, অত্যাচার করা হতো প্রায়ই। কোনোরকম ভাবে তাদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না বললেই হয়। কিন্তু যখন তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচার করলেন তখন নারীজাতির স্বাধীনতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিলেন, নির্দেশ দিলেন।

হজরত মোহাম্মদকে একাধিক যুদ্ধ করতে হয়েছিল। অন্যত্র তো বটেই, তার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রেও অংশ নিয়েছিল মেয়েরা।

পিতার সম্পত্তিতে ভাগ মুসলিম মেয়েদের অবশ্যই প্রাপ্য। গ্রামদেশে অনেক জায়গায় বলা হয় মুসলমান মেয়েরা বাপের মুরগির ভাগও ছাড়ে না। কথাটা মিথ্যে নয়। বাপের সম্পত্তির মধ্যে হাঁস মুরগি ছাগল ভেড়া থাকলে আইনত তার ভাগও মেয়েরা পেয়ে থাকে।

সমাজে ব্যভিচার বন্ধ করার জন্যেও নারীর স্বাধীনতা প্রয়োজন। অবশ্যই সে স্বাধীনতা উগ্র বা চরম আধুনিক নয়। বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা মেয়েদের পুনরায় বিবাহের নির্দেশ ইসলাম ধর্মে আছে। কোরান বা হাদিসে কোথাও নারীর প্রতি অবহেলার নির্দেশ নেই বরং পুরুষদের মতোই তাদেরও প্রকৃত মর্যাদা দেওয়ার কথাই আছে।

মুসলিম বিবাহ অনেকটা পারস্পরিক চুক্তির মতো। এই বিয়েতে নারী ও পুরুষের মত নিয়ে পরস্পরের কথা পরস্পরকে জানিয়ে তারপর বিয়ে সম্পন্ন হয়। এ ক্ষেত্রে মেয়েদের স্বাধীনতা কতোখানি তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এখন তো ছেলেমেয়েরা দুজন দজনকে দেখে কথাবার্তা বলে বিয়ে করছে কিন্তু যখন এসব ছিল না তখন ধর্মীয় নির্দেশ কেমন ছিল (যা এখনো পালিত হয়)।

পাত্রীর এই সম্মতির উপর পুরো বিয়েটা নির্ভর করছে। আগে তাঁর সম্মতি, পরে পাত্রের। নারীর এই স্বাধীনতা অন্য ধর্মে কতোটা আছে জানা নেই। যাই হোক রাজি কথাটা তিনবার বলতে হয়। সবাই শোনেন। উকিল সাক্ষীদের জিজ্ঞেস করেন, শুনেছেন তো! পরপর পাত্রকে এবং সমবেত ভদ্রজনকে পাত্রীর সম্মতির কথা জানানো হয়। অবশেষে পাত্রের সম্মতি।

এরপর পাত্রকে একটি কাবিলনামায় সই করতে হয়। যাতে এই দেনমোহরের কথার সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু থাকে। যেমন, তোমাকে সসম্মানে শরিয়তী বিধান অনুযায়ী রাখবো, তোমার ইচ্ছেমতো মাঝে মাঝে পিতৃগৃহে পাঠাবো ইত্যাদি।

দেনমোহর সম্বন্ধে যাঁরা জানেন না তাঁদের বলছি। তালাক কথাটা সবাই শুনেছেন এবং এও শুনেছেন তিনবার তালাক তালাক তালাক বললেই হয়ে গেল। উপন্যাস ও সিনেমার দৌলতে এইসব ব্যাপার প্রায় সবাই জেনে ফেলেছেন।

তিনবার তালাক বলাটা ফর্মালিটি মাত্র। আগেই তো ঠিক হয়ে যায় এ বউ রাখা চলবে না। কেননা পাত্রীর চারিত্রিক বা অন্য দোষ থাকলে কিংবা বদমেজাজী বউ হলে তাকে নিয়ে ঘর করা আর না-করা সমান। জবরদস্তি কিছু সম্ভব নয়। অনেকক্ষেত্রে পাত্রীও চান স্বামী তাকে মুক্তি দিক। অতএব তালাক। তোমাকে মুক্তি দিলাম। কিন্তু তারপর? এবার ওই দেনমোহর। সঙ্গে সঙ্গে ওই টাকার অর্ধেক স্ত্রীকে দিয়ে দিতে হবে। পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে পঁচিশ হাজার নগদে চাওয়া মাত্র দিতে হবে। আর যতোদিন না সেই বউ পুনশ্চ বিয়ে করছে ততোদিন তার খোরপোষ চালাতে হবে। বাস্তবের

পরিপ্রেক্ষিতে তাই শুভবিবাহ হলেও অশুভ দিকটাও ভেবে নিতে হয়। যেমন শাস্ত্রের কথা, যখন বাড়ি তৈরি করবে তখন দরজা এমনভাবে তৈরি করো যেন লাশ বের করা যায়।

স্ত্রীদের মর্যাদা ও স্বাধীনতা দিতে নানাদিক থেকে ভাবা হয়েছে, সে রকম নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। নারীর মর্যাদা ও অধিকার সম্বন্ধে কোরানের নির্দেশ : 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের অঙ্গাবরণ এবং তোমরা তাদের অঙ্গাবরণ'। [২ : ১৮৭]

হাদিস (হজরত মোহাম্মদের উপদেশ, বাণী) বলছে—জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর অবশ্য কর্তব্য। শিক্ষা ও জ্ঞান সংগ্রহ মেয়েদের জন্য প্রায় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মুসলিম মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা অবশ্য প্রয়োজন, এও তাদের স্বাধীনতার অঙ্গ।

মেয়েদের স্বাধীনতাকে কতোখানি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তা হাদিস শরিফের এই নির্দেশ পড়লেই বোঝা যাবে ঃ 'স্ত্রীলোক তোমার মনের মতো সোজা হয়ে চলবে না। অতএব ওর দ্বারা লাভবান হতে চাইলে ওই বাঁকা অবস্থাতেই তুমি ওর দ্বারা কাজ উদ্ধার করো। যদি ওকে সোজা করার চেষ্টা করো তাহলে তা ভেঙে ফেলবে। ভেঙে ফেলার অর্থ হলো তালাক দেওয়া।'

এই বাস্তবসম্মত উপদেশ ব্যবহারিক জীবনে কতো সত্য তা সমাজসংসারে যাঁরা বাস করেন তাঁরাই জানেন। বেশিরভাগ পুরুষই ভাবেন মেয়েরা তাঁদের মতেই চলবেন। বউ মানেই সে পতির অধীন। স্বামীর পথই তার পথ। তার নিজস্ব কোনো ব্যক্তিত্ব থাকবে না। আর ব্যক্তিত্বের অন্য নামই স্বাধীনতা। হজরত মোহাম্মদ জানতেন, জোর করে স্ত্রীদের দিয়ে কাজ করানো তাদের মর্যাদা-হানিকর। তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। এ উচিত নয়। এবং তাই এই বাস্তব বাণী।

পরবর্তীকালে একদল মানুষ তাদের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে নানারকম ভুল ব্যাখ্যা করে, ধর্মীয় নির্দেশের ওলোটপালোট করে নারীদের বন্দী ও হাতের পুতুল করে রাখার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। পুরুষশাসিত সমাজে গৃহের শান্তিরক্ষার তাগিদে মেয়েরা অনেককিছুই মেনে নিয়ে নিজেদের স্বাধীনতা ক্রমশ হারিয়েছে। কিছু মানুষ ভয় দেখিয়েছেন, স্বাধীনতা মানেই শৃঙ্খলহীন খারাপ আচরণ। সমাজে মেয়েদের প্রগতি মানেই গৃহের শান্তিহানি।

তবুও এরই মধ্যে এই ভারতবর্ষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিম মহিলারা তাদের ব্যক্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। স্বাধীনতার সুফলও দেখিয়েছেন। ইতিহাসে আমরা সুলতানা রাজিয়াকে দেখেছি, মোগল যুগে পরোক্ষভাবে কাজকর্ম চালিয়েছেন নূরজাহান। হুমায়ুনের মেয়ে গুলবদন খুব ভালো কবিতা লিখতেন। শাহজাহানের মেয়ে জাহানআরা অনেককিছু গড়ে সমাজসেবা চালিয়েছেন। রাজনীতিতে এসেছেন আরো বহুজন। এই কলকাতায় বেগম রোকেয়া স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্যে অনেক সংগ্রাম করেছেন। নিজের চেষ্টায় গড়ে তুলেছেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। জিন্না সাহেবের বোন ফাতেমা জিন্না রাজনীতিতে অংশ নিয়েছেন। এখন বাংলাদেশে হাসিনা ওয়াজেদ, খালেদা জিয়ার কথা তো সবাই জানেন।

চলচ্চিত্রে, সঙ্গীতে, খেলাধুলোয় বহু মুসলিম মেয়ে সামনের সারিতে এসেছেন। স্বাধীনতা পাওয়ার ফলেই এগুলো সম্ভব হয়েছে। স্বাধীনতাকে প্রকৃত কাজে লাগাতে পারলেই প্রতিভা পুরস্কৃত হয়।

পরিশেষে হজরত মোহাম্মদের আর একটি বাণী (আল হাদিস) স্মরণ করিয়ে দিই। নারীকে মুসলিম ধর্মে কতো উঁচুতে স্থান দেওয়া হয়েছিল এটি তার প্রমাণ।

'তোমরা কি জানো না যে, নারীরা পুরুষ অপেক্ষা অধিক পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। কারণ মহান আল্লাহ্ বেহশ্‌তে (স্বর্গ) পুরুষের মর্যাদাবৃদ্ধি করেন যেহেতু তার স্ত্রী তার উপরে সন্তুষ্ট ছিল।'

সুপার ফ্রেশ বিনাকা টপ
টুথপেস্টের ভরপুর
সজীবতা অনুভব করুন



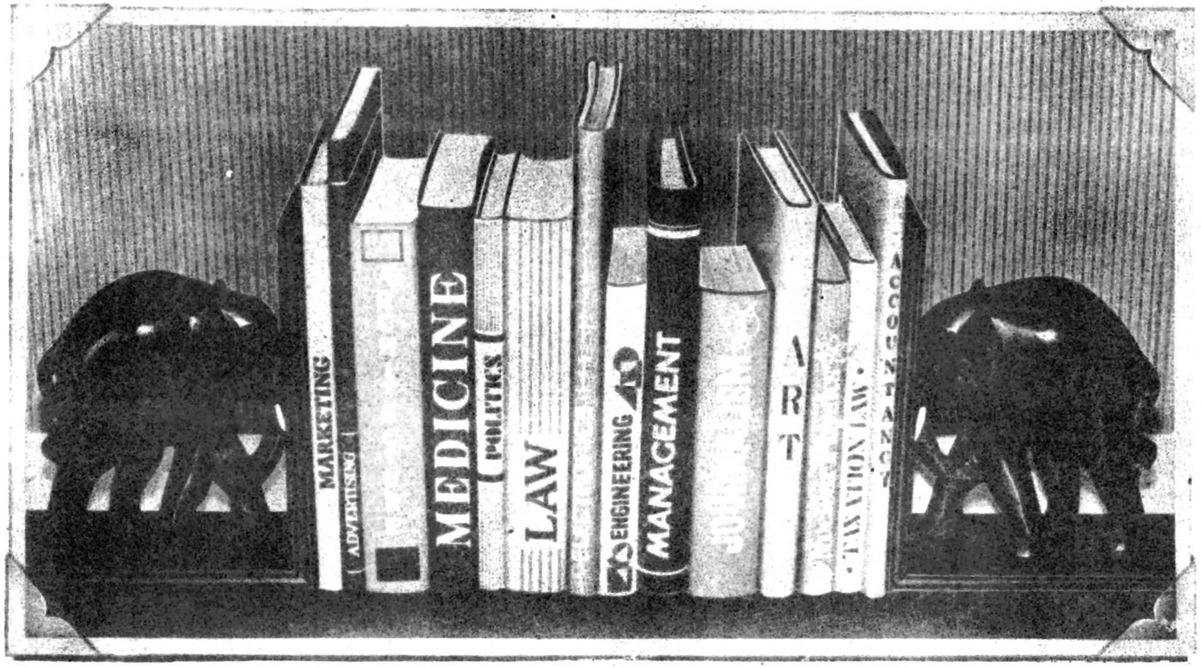
সুপার ফ্রেশ বিনাকা টপ—এখন এক সুন্দর আকর্ষণীয় প্যাকে। দেখুন, এর ছড়িয়ে পড়ার বিশেষ উপাদান কেমন মুখের ভেতরে প্রতিটি কোণে নিমেষে ছড়িয়ে প'ড়ে দাঁতের ক্ষয়কারী বীজাণু নাশ করে আর নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করে। সুপার ফ্রেশ বিনাকা টপ আপনার মুখ পুরোপুরি সাফ করে আর নিঃশ্বাসে ভরে দেয়—
ভরপুর সজীবতা!
এই ভরপুর সজীবতা অনুভব করুন, আজই!



RCA/BT/1-84-85-BG

সুপার ফ্রেশ
বিনাকা টপ
টুথপেস্ট
মুখের ভেতরকে সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষা করে

কম সময়ে কম খরচে মনের মত ঘটক।
লাখো সম্বন্ধ থেকে বেছে দেবে রাজযোটক



টাইম্‌স যখন বিয়ের ঘটকালির ভার
নেয় তখন তার জোড়া মেলা ভার।
না, না, ভয় নেই, টাইম্‌সের খরচা
নেহাতই নামমাত্র। অথচ অল্পসময়ে একটি
দুটি নয়, লাখখানেক সম্বন্ধ জুটিয়ে আনবে।
সেগুলি খতিয়ে দেখে খুঁটিয়ে করে যাচাই
মনের মত রাজযোটক করে ফেলুন বাছাই।

এত কম খরচে এতগুলি ভাল ভাল
সম্বন্ধ আন্‌তে পারার মত ঘটক জানা থাকলে
সে আলাদা কথা। কিন্তু বহু সম্বন্ধ থেকে
বাছাই করা একেবারে পছন্দসই একটি যদি
চান, বিবাহের বিজ্ঞাপন টাইম্‌স-এ ছাপান।

THE TIMES OF INDIA

ACIL-BC-38/85C-B.

দুঃসাহসী যৌবনের প্রতীক : প্রিয়রঞ্জন



কলকাতার ছেলে হতে হবে। তা না হলে সব বৃথা। পশ্চিম দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের ছেলে কলকাতার ছেলের কাছে দাঁড়াতেই পারবে না। কিসে দাঁড়াতে পারবে না? সব কিছুতেই। খেলাধূলা, গানবাজনা, অভিনয়, আবৃত্তি, সাহিত্যচর্চা, রাজনীতি সব কিছুতেই কলকাতার ছেলের চেয়ে পিছিয়ে থাকতে হয়।

স্মার্ট হতে হবে। স্মার্টনেসই পয়লা নম্বর গুণ। তারপর ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড, চেহারায় চাকচিক্য ..... দূর এসব না হলে কি আর এ যুগে কেউ কলকাতার ছেলের সংগে পাল্লা দিতে পারে? কিন্তু ছেলেটা বোধ হয় হতাশা ব্যর্থতা শব্দগুলো ওর জীবনের অভিধান থেকে আগেই মুছে ফেলে দিয়েছিল। 'পারিব না এ কথাটি বলিও না আর, একবার না পারিলে দেখ শতবার।' এই লাইন দুটো বোধ হয় জীবনের এগিয়ে চলার পথে পাথেয় করে নিয়েছিল।

পায়ে পায়ে অনেক পথ পেরিয়ে আজকের প্রিয়তম একটি নাম প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী। প্রিয়রঞ্জন নামের কিন্তু একটা সার্থকতা মিলেছে, ছোটবেলা থেকেই বহুজনের প্রিয়। ব্যর্থতা অনেক এসেছে। আবার সাফল্য এসেছে যখন সব ব্যর্থতাকে ম্লান করে দিয়েছে।

এত অল্প বয়সে এত সাফল্য ক'জনের ভাগ্যে জুটেছে? না, এ সাফল্য পাইয়ে দেওয়া নয়; নিজের অধিকারে অর্জিত। রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতার দাবি যেমন সোচ্চার হতে পারে, রাজনৈতিক দলে ব্যক্তির বিকাশের তাগিদে অধিক ক্ষমতার দাবি কিন্তু অচল। কংগ্রেসের রাজনীতিতে ক্ষমতা ক্ষয়িষ্ণু, পায়ে বেড়ি বাঁধা। পায়ে পায়ে পথ চলার অধিকারও সীমিত, পথচলার নামে আসলে পদচারণা। তার বেশি নয়।

কালিয়াগঞ্জের ছেলেটা আর পাঁচটা ছেলের সংগে খেলার ছলে শ্লোগান দিত 'উর্দু নয় বাংলা চাই'। স্কুল ছুটির পর সংগীদের সংগে মিছিল মিছিল খেলা করত 'নইলে গদি ছাড়তে হবে।' তখন ওপার বাংলার বাংলা ভাষার দাবিতে ভাষা আন্দোলন আর এপার বাংলায় কংগ্রেস বিরোধী বামপন্থীদের শ্লোগান ধ্বনিত হচ্ছে। শিশুমনকে নাড়া দিয়েছে ধ্বনি।

প্রিয়রঞ্জন তখন ক্লাস টু'র ছাত্র। মুখে মুখে ছড়া বলতে পারে, সুকুমার রায়, উপেন্দ্র-কিশোর মুখস্থ। সুনির্মল বসুর 'গান্ধীজী এসো ফিরে' কবিতা আবৃত্তি করে পুরস্কার পেল।

কালিয়াগঞ্জে দাশমুন্সী পরিবারের বরাবরই একটা সুনাম ছিল। মা রেণুকণা ছিলেন কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী, বাবা প্রয়াত জ্যোতিরিন্দ্র অশ্বিনী দত্তের অনুগামী স্বাধীনতা সংগ্রামী। এক দাদা যোগ দিয়েছিলেন বিমান বাহিনীতে।

তবু প্রিয়রঞ্জন মনের দিক থেকে ছিলেন বামপন্থীদের দিকে। বামপন্থীরা যেন রোমান্স সৃষ্টি করেছিলেন। বাড়িতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, অতুল্য ঘোষের মত বহু নেতা এসেছেন।

প্রিয়রঞ্জনের ঝোঁকটা কিন্তু খেলাধুলো, নাটক, গানবাজনার দিকে। কালিয়াগঞ্জে বসে রেডিওতে কলকাতার ফুটবল মাঠের ছবি কল্পনা করতেন। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান – একদিন যদি প্রথম ডিভিশনে খেলতে পারে! প্রিয়রঞ্জন কিন্তু আদৌ কল্পনাবিলাসী নন, পুরোপুরি বাস্তববাদী।

মা বলতেন, ভাল করে লেখাপড়া করতে হবে। কলকাতায় গিয়ে কলেজে পড়তে হবে, ইউনিভার্সিটিতে পড়তে হবে। কলকাতার মন জয় করতে হবে। কলকাতা যাকে চেনে না সে অচেনা, চির-অচেনাই থেকে যাবে। কিন্তু কলকাতার মনের নাগাল পাওয়া বড় কঠিন কাজ।

প্রিয়রঞ্জন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, কলকাতায় যেতে হবে। কালিয়াগঞ্জ কলকাতাকে জয় করবে, করতেই হবে। কলকাতার ছেলে ছাড়া কেন এগিয়ে যেতে পারবে না। এই ট্র্যাডিশন, এই জগদ্দল পাথরটাকে সরিয়ে দিতে হবে।

ষাটের দশকে প্রিয়রঞ্জন কলেজের ছাত্র। ১৯৬২-তে চীন আক্রমণের সময় মনে দেশাত্মবোধের উন্মেষ ঘটল। সেজদা বিমান বাহিনীতে কাজ করতেন। চিঠি লিখতেন ভাইকে, প্রেরণা যোগাতেন। সেই বছরই ছাত্র-পরিষদের সদস্য, সেই সংগে রায়গঞ্জ মণ্ডল কংগ্রেসের চার আনার সদস্য। পরের বছর রায়গঞ্জ মহকুমা ছাত্র পরিষদের সম্পাদক। তারপর স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়ার জন্য মফঃস্বলের ছেলে এল কলকাতায়। ১৯৬৪-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের অর্ধেকটা ছাত্র পরিষদের দখলে চলে এল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র প্রতিনিধি হিসাবে তিনটি পদ দখল করে 'ত্রিমুকুট' পেয়েছিলেন প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, সমস্ত কলেজে তখন বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের রমরমা। সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচনে কলকাতা কালচারের ছেলে, পরবর্তীকালে মন্ত্রী এবং সি পি আই (এম) নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ক্লাস রিপ্রেসেনটেটিভ নির্বাচনে পরাস্ত হলেন অজানা – অচেনা, অখ্যাত কে এক প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীর কাছে।

১৯৬৪ সালে প্রিয়রঞ্জন হলেন প্রদেশ ছাত্র পরিষদের কোষাধ্যক্ষ। শ্যামল ভট্টাচার্য তখন সভাপতি।

তখন প্রদেশ কংগ্রেস অফিসে অর্থাৎ কংগ্রেস ভবনে ঢোকার অনুমতি ছিল না। শ্যামলবাবুর সংগে যেতেন আর কংগ্রেস ভবনের বাইরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হত। মফঃস্বলের ছেলে শুনলেই নেতারা নাক সিঁটকিয়ে বলতেন, কলকাতায় থাকো না অথচ নেতা হতে চাও?

অবশ্য কংগ্রেস নেতারাও তখন চার দেওয়ালের মধ্যে বসেই রাজনীতি করতেন। জনসাধারণের সংগে মেলামেশার তেমন বালাই ছিল না। কংগ্রেসের নাম করলে মার খেতে হত।

কংগ্রেস, ছাত্র পরিষদ মানে তখন ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের মন্ত্রী আর নেতাদের প্রচারযন্ত্র। জনস্বার্থ, ছাত্রস্বার্থ বলে কোনো স্বার্থ নেই। সরকার যা করবে হাত তুলে সায় দিতে হবে। আর তার জনাই কংগ্রেস ছাত্র পরিষদের প্রতি মানুষ ক্ষুব্ধ।

প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীর নেতৃত্বে একরাশ অচেনা মুখ এগিয়ে এল। তুলে ধরল ছাত্রদের দাবিদাওয়া, মুখোশ খুলে দিতে লাগলো ভুয়ো নেতাদের।

কথায় কথায় অতীত ফিরে এল। প্রিয়রঞ্জন বললেন, ১৯৬৭ সালের ১৮ এপ্রিল আমার জীবনের স্মরণীয় দিন। সেদিন রহড়ায় ছাত্র পরিষদের সংগঠন সভা করেছি। বিরোধীদের সমালোচনা করেছি। 'বন্দে মাতরম' শ্লোগান দিয়েছি। বোধহয় এটা সেদিন আমার সবচেয়ে বড় অপরাধ হয়েছিল। তাই 'গণ আদালতে'

আমার বিচার হল। রাস্তার মধ্যে গুন্ডার দল সেই রাতের অন্ধকারে কাপুরুষের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। সে কি প্রচন্ড মার। পাঁজরা ভেঙে গেল। বাঁ হাতটা এখনও ভাঙা। কিডনি জখম হল। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রাস্তার ধারে ফেলে রেখে দিয়ে কাপুরুষের দল অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ওরা ধরে নিয়েছিল আমি মরে গিয়েছি। সেদিন কিন্তু রহড়ার মানুষ, অতি সাধারণ মানুষ আমাকে বাঁচাতে ছুটে এসেছিলেন। আমি বুঝেছিলাম সাধারণ মানুষের কথা বললে, জনস্বার্থকে তুলে ধরলে মানুষই পাশে এসে দাঁড়ায়। সাধারণ মানুষের কোনো গোঁড়ামী নেই, অন্ধ বিশ্বাসের দাস নয়। কংগ্রেস সাধারণ মানুষের থেকে দূরে সরে গিয়েছে। কংগ্রেস সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ালে, কংগ্রেস আবার জনগণের আপনজন হয়ে উঠবে।

তখন চারিদিকে কলেজে কলেজে ছাত্র পরিষদ জিতছে, ছাত্র ফেডারেশন হারছে। পিছনের দিকে তাকালে হবে না, পিছিয়ে পড়লে এগোনো যায় না। ভোটে জেতার পর এম এল এ মন্ত্রীরা সাধারণ মানুষকে এড়িয়ে চলেন। মন্ত্রী আর এম এল এ-রা ধরে নিতেন, তাঁদের একমাত্র কাজ ক্ষমতাসীন দলের সব সিদ্ধান্তকে চোখ কান বুজে সমর্থন করে যাওয়া।

প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীর নেতৃত্বে ছাত্র পরিষদ সেই ট্র্যাডিশনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। আর কংগ্রেস নেতারাও 'গেল গেল' রব তুললেন।

ছাত্র পরিষদের অগ্রগতি দেখে সেদিন সাধারণ কংগ্রেস কর্মী ও অনেক নেতা বুঝেছিলেন, কংগ্রেস দলে কিছু লোকের জমিদারির অবসান ঘটাতে হবে। তা না হলে কংগ্রেস ভুঁইফোঁড় আর বড়লোকদের দল হয়ে থাকবে। কংগ্রেস দলের কার্যক্রমের সমালোচনা করতে গিয়ে অনেকের বিষ নজরে পড়লেন প্রিয়রঞ্জন।

কংগ্রেস ভবনের নেতারা প্রিয়রঞ্জনদের হাতের মুঠোয় রাখতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। প্রিয়রঞ্জন এন সি সি করা ছেলে। এন সি সি'র আনডার অফিসার হয়েছিলেন।

ছাত্র পরিষদকে কংগ্রেসের কবল থেকে সরিয়ে এনেছেন। মহাজাতি সদনে ছাত্র পরিষদের অফিস তখন জমজমাট। জেলা থেকে, গ্রাম থেকে হাজার হাজার ছেলে আসে মহাজাতি সদনে। কংগ্রেস ভবন আর মহাজাতি সদনে বিস্তর ব্যবধান। মহাজাতি সদনের অফিসে চাটাই পাতা। নেতা প্রিয়রঞ্জন সকলের সঙ্গে সেই চাটাইতেই রাত কাটান। হেঁটে গ্রামে গ্রামে ঘোরেন। যেখানে অত্যাচার, যেখানে হামলা সেখানেই প্রতিরোধ, সেখানেই ছাত্র পরিষদ।

প্রিয়রঞ্জনরা কংগ্রেস ভবনে ঢোকার অনুমতি পেল ১৯৬৮ সালে। তখন প্রিয়রঞ্জন প্রদেশ ছাত্র পরিষদের সভাপতি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র।

যে ছেলেটি ১৯৬৪-তে কলকাতার মাটিতে পা দিয়েছিল সে কেমন জাদুমন্ত্রে কলকাতাকে জয় করে নিচ্ছে। ১৯৬৯ সালে প্রিয়রঞ্জন একটা নাম, দুঃসাহসী যৌবনের প্রতীক, যুব কংগ্রেসের তখন গ্রামে চলো কর্মসূচি সফল হতে চলেছে। গান্ধীজীর 'গাঁও মে কংগ্রেস' জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

১৯৬৯ সালে কংগ্রেস ভবনে এলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। সেদিন প্রিয়রঞ্জনকে দেখিয়ে অতুল্য ঘোষ প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলেন, 'ছেলেটা খুব ভাল সংগঠক, একে দেখো'।

সেই প্রথম ইন্দিরা গান্ধীকে খুব কাছ থেকে দেখা।

তারপর এলো ১৯৭১, লোকসভা এবং বিধানসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন। ছাত্র পরিষদ-যুব কংগ্রেস দাবি তুললো, কিছু আসন তাঁদের ছেড়ে দিতে হবে। নিরুপায় হয়ে নেতারা ঠিক করলেন, এমন প্ল্যান করতে হবে যাতে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। নেতারা ধরে নিলেন, ছেলেছোকরারা হেরে ভূত হয়ে যাবে। এমন সব সিট ছেড়ে দেওয়া হবে যেখানে কংগ্রেসের জেতার কোনো আশা নেই।

লোকসভার দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রে প্রার্থী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী আর যুক্তফ্রন্টের জবরদস্ত মন্ত্রী জ্যোতি ভট্টাচার্যর বিরুদ্ধে সুব্রত মুখার্জি। লোকসভার আসনে বয়োকনিষ্ঠ প্রার্থী প্রিয়রঞ্জনের পক্ষে কি সবচেয়ে প্রবীণ, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের-বীর, সি পি আই (এম) প্রার্থী গণেশ ঘোষকে হারানো সম্ভব? কেউ ভাবতেই পারেননি। একটা মফঃস্বলের ছেলে, ২৬ বছরের তরুণ, দক্ষিণ কলকাতার সাত আট লক্ষ মানুষের কাছে মাত্র সাত বছরের মধ্যে এত পপুলার হতে পারে!

পোর্টেবল মাইক নিয়ে নিজেই পথসভায় বক্তৃতা করছেন, হাজার হাজার মানুষের নানান প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছেন। দলবল নিয়ে দেওয়াল লিখছেন, পোস্টার মারছেন। এ এক নতুন দৃশ্য। এমন অদ্ভুত কংগ্রেস প্রার্থী আগে কেউ দেখেনি। প্রিয়-সুব্রত জিতলেন। প্রমাণ করলেন ক্রিকেটের মতই রাজনীতিতে নিশ্চিত বলে কিছু নেই।

সেই ১৯৭১ সালেই প্রিয়রঞ্জন সারা ভারত যুব কংগ্রেস সভাপতি হলেন ইন্দিরা গান্ধীর আহ্বানে। ১৯৭২ সালে প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং এ আই সি সি-র ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য।

প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী কিন্তু আলাদা জাতের রাজনৈতিক কর্মী। রাজনীতি ওঁকে গ্রাস করতে পারেনি। আসলে প্রিয়রঞ্জন একজন শিল্পী, জাত শিল্পী। জীবন গড়ার কারিগর। সমাজ সংস্কৃতিকে পরিপূর্ণতার পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজনীতিকে হাতিয়ার হিসাবে কাজে লাগিয়ে চলেছেন।

ওঁর আসল জীবনটা রাজনীতির বাইরে। সেই শিশুমন, তারুণ্যকে সযত্নে লালন করেছেন। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা কিংবা ইডেনের ক্রিকেট টেস্ট, বাংলা ছবিতে উত্তমকুমার, হিন্দিতে বলরাজ সাহনী, দিলীপকুমার, মার্গ সংগীতে ভীমসেন যোশী, রবীন্দ্র সংগীতের দেবব্রত বিশ্বাস, আলি আকবরের সরোদ, রবিশঙ্করের সেতার ছেড়ে কংগ্রেসের মিটিং-এ যেতে মন চায় না। নাটকে অভিনয়ের নেশা এখনও ছাড়তে পারেননি।

হাতে সময় পেলেই সেতারটা নিয়ে বসেন। আর রাজনীতি যতই জরুরী হোক সাহিত্যচর্চা বাদ যায় না। উপন্যাস, ছোট গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লেখার জন্য ওঁর সময়ের অভাব হয় না। 'দক্ষিণী বার্তা'র সম্পাদনার কাজে কোনো ফাঁকি নেই।

সঙ্গী সাথী নিয়ে মেতে থাকতে বোধ হয় সবচেয়ে বেশি আনন্দ পান। কোনো দায়িত্ব নিতে পিছপা নন। বিধাননগরে কংগ্রেস অধিবেশন হল ১৯৭২ সালে। সমস্ত রাজ্য থেকে আগত প্রতিনিধি, কেন্দ্র ও রাজ্যের মন্ত্রী, সাংবাদিক – সকলের সব রকম ব্যবস্থার দায়িত্ব প্রিয়রঞ্জনের। কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলা নেই। নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে পাঁচ দিনের অধিবেশন।

সংগঠক হিসাবে বোধ হয় কংগ্রেসে ওঁর জুড়ি নেই। সেই সঙ্গে বক্তা হিসাবেও। অনেকে কংগ্রেস বিরোধী, কিন্তু প্রিয়রঞ্জন বিরোধী নয়। পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতি বসু ছাড়া বক্তা হিসাবে প্রিয়রঞ্জনের প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, রাজ্যে রাজ্যে প্রিয়রঞ্জন আজ জনপ্রিয় একটি নাম। কট্টর কংগ্রেস বিরোধী, অটলবিহারী বাজপেয়ী, জর্জ ফারনান্ডেজ, বহুগুণা, শারদ পাওয়ার, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, প্রয়াত জ্যোতির্ময় বসুর কাছে প্রিয় প্রিয়তম। ব্যক্তিগতভাবে কোনো রাজনৈতিক–অরাজনৈতিক ব্যক্তির সঙ্গে প্রিয়র বিরোধ নেই।

প্রিয়রঞ্জন হিন্দি সিনেমার প্রতিভাবান নায়ক দিলীপকুমারের ফ্যান। কিন্তু প্রিয়রঞ্জন জানতেন না, দিলীপকুমারও তাঁর ফ্যান। এখন দু'জনে বন্ধু।

প্রিয়রঞ্জনকে কেউ বিমুখ করেন না। প্রবীণ জননেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেন থেকে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় – সকলের কাছেই প্রিয় আজ প্রিয়তম।

প্রিয়রঞ্জনের সঙ্গী সাথীদের অনেকেই আজ বিবাহিত। কিন্তু প্রিয়রঞ্জন? কথা উঠলেই বলেন, আমার বন্ধুদের তো দেখছি। রাজনীতি করতে এসে বিবাহিত জীবনের অবকাশ কতটুকু? তার চেয়ে এই তো বেশ আছি। সকলের সুখে সুখী। □

নিশীথ দে

ফটো : অভিজিৎ দাস

ফিরে দেখা



সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত

সমরেশের সংগে আমার এভাবে আবার দেখা হবে কোনোদিন ভাবিনি। সময়টা শরৎ শেষ হয়ে হেমন্তের দিকে গড়িয়ে পড়েছে। এরকম দিনে বিকেল হতে থাকলেই মন যেন কেমন খালি হয়ে যায়। হঠাৎ কোত্থেকে এক ঝলক হাওয়া আসে চেনা-অচেনা ফুলের গন্ধ নিয়ে। গাঢ় নীল আকাশের গায় ইতস্তত ধবধবে শাদা মেঘের টুকরো স্থির হয়ে ঝুলে থাকে। অনেক দিন আগের কোনো কোনো স্মৃতি হঠাৎ অস্পষ্টভাবে মনকে নাড়া দেয়।

আমি দাঁড়িয়ে আছি চোখে জ্বালা-ধরানো একটা ধোঁয়ার জগতের মাঝখানে। আরও অনেকেই রয়েছে। কারো কারো চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে কান্নায় ও ধোঁয়ায়। অনেক মহিলাকেই দেখা যাচ্ছে শাড়ির আঁচল দাঁতে চেপে কান্না চাপবার অক্ষম চেষ্টা করতে। পুরুষেরা কেউ কেউ শিশুর মতো কাঁদছে, কেউ বা স্থির। অন্যরা ভাঁড়ে চা খেতে খেতে নানান কথায় ব্যস্ত। চারদিকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঘুরছে। কাঁচা কাঠ, টায়ারের টুকরো ও মানুষের মাংস পোড়ার গন্ধ একাকার হয়ে সমস্ত জায়গাটার ওপর চেপে বসেছে।

আমরা ক'জন নিমতলা শ্মশানে গিয়েছি উমাদিকে নিয়ে। উমাদি কাল রাতে পোকামাকড় মারার ওষুধ বেশ কিছুটা গিলে ফেলে আত্মহত্যা করেছেন। ভোর থেকে থানা পুলিশ মর্গ সমস্ত ঝামেলা শেষ করে বেলা দুটো নাগাদ শ্মশানে আনা গেছে শেষ পর্যন্ত। নেহাত আমাদের হেড মিস্ট্রেস-এর জানাশোনা পুলিশের ওপরতলার লোক ছিলো বলে হুজ্জত কম হয়েছে। একই ওয়ার্কিং উওমেনস হসটেলে দু'জনে থাকি। কাল রাতের খাবার টেবিলে বসেও বুঝতে পারিনি উমাদি এমন কাজ করতে যাচ্ছেন। কী ঠাণ্ডা নার্ভ রে বাবা। কিন্তু কেন উমাদি এ কাজ করলেন কেউ জানে না। অনেকের বেলায়ই যা ঘটে থাকে, একটা চিরকুট রেখে যান চিরাচরিত কথা লিখে : 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়……', তাও ঘটেনি। বছর বিয়াল্লিশ বয়স, দেখতে খারাপ নন, বিধবা। সব সময় হেসে কথা বলতেন। এ সংসারে ওঁর কেউ আছেন বলে কোনোদিন শুনিনি। হঠাৎ মহিলার জীবনের ওপর এমন বিতৃষ্ণা কেন জাগলো সে কথা উনিই হয়তো বলতে পারতেন।

উমাদি লাইনে চার নম্বর। তিনটে শব ওঁর আগে চিতায় ওঠার জন্য অপেক্ষা করছে। বৈদ্যুতিক চুল্লি দিন দুয়েক ধরে খারাপ হয়ে রয়েছে, ফলে কাঠের চুল্লিতে প্রচণ্ড ভিড়। পয়সার হাঁকও বেশ উঁচু পদার্থ। আশি টাকা দিতে হবে। কেউ-কেউ বলছিলেন ইলেকট্রিক চুল্লির লোকদের সংগে নিশ্চয়ই সাট আছে। খুব মোলায়েম গলায় একজন ডোম সবাইকে বলছিলো যে যাঁরা লাশ নিয়ে এসেছেন তাঁরা ইচ্ছে করলে নিজেরাই পোড়াতে পারেন, কিন্তু ডোম দিয়ে পোড়ালে আশি টাকাই দিতে হবে। সুড়সুড়িটা ঠিক জায়গা মতোই দিচ্ছিলো সে। কে আর নিজের আপনজনকে চিতায় তুলে জনসমক্ষে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পোড়াতে চায়!

আমরাও উমাদিকে ডোমের হাতে সঁপে দিয়ে এক পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম। কাঁচা কাঠগুলো ঠিকমতো ধরছে না বলে গাদাগাদা টায়ারের টুকরো ছুঁড়ে দিচ্ছিলো ডোমরা চিতায়। অনেকক্ষণ আগে হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়ি উমাদিকে নামিয়ে রেখে চলে গেছে। এখনো প্রায় ঘণ্টা আড়াই ওঁকে অপেক্ষা করতে হবে চিতায় উঠতে। আশ্চর্য শান্ত দেখাচ্ছে উমাদির মুখ। ভয়ঙ্কর বিষ খেয়ে কষ্ট পেয়ে উনি যে মরেছেন মুখ দেখলে বোঝা যায় না। মৃতদেহের মুখ বোধহয় এরকমই হয়।

এ সংসারে উমাদির কেউ ছিলো বলে জানতাম না। মৃত্যুর পর ওঁর একটা ছোট্ট ডায়রি থেকে জানা গেলো উনি পাঁচ হাজার টাকার একটা ইনস্যুরেনস পলিসির নমিনি করে গেছেন রতনকে। ব্যাঙ্কে যা টাকা-পয়সা আছে তাও দিয়ে গেছেন রতনকে। রতন আমাদের স্কুলের পিওন। ছেলেবেলায় মা-বাবাকে হারিয়েছে। বড়ো ভালো ছেলে। ওকেই আমরা নিয়ে এসেছি উমাদির মুখাগ্নি করার জন্য। শিশুর মতো হু-হু করে কেঁদে যাচ্ছে ছেলেটা।

পড়ন্ত রোদে গংগার বুকে হাজার ঢেউ তুলে একটা লনচ চলে যাচ্ছে বাঁশি বাজিয়ে। এক ঝলক হাওয়া নদীর দিক থেকে ছুটে এসে শ্মশানগুলোর ধোঁয়াকে এলোমেলো করে দিলো। ডোম ও ওর সাংগোপাংগরা খুবই ব্যস্ততা নিয়ে ছুটোছুটি করছে। মৃতদেহ আসছে একটার পর একটা। হঠাৎ একটা বিকট চিৎকার শোনা গেলো : ওঃ মাইরি, ডবকা বউটা মরে গেলো। কেলো শালা এখন কী করে থাকবে – সোনাগাছির টিকিট কেটে দেবে শালা …… একটা টেমপোর ওপর লম্বা চুলঅলা একটি ছেলের চিৎকার থামলে কোমরে গামছা বাঁধা তার সংগীরা হি-হি করে হেসে ওঠে। টেমপোর ওপর কোনো গৃহবধূর শব রয়েছে নিশ্চয়ই। মৃতদেহ দেখে এখনও অনেকে কপালে হাত ঠেকিয়ে সম্মান দেখায় – হয়তো নিতান্তই অভ্যাসবশত। কিন্তু শ্মশানে এলেই বোঝা যায় সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন প্রাণহীন ব্যবসা, স্থূল। মধ্যরাতের নিস্তব্ধতা খানখান করে ভাড়াটে শববাহকদের চিৎকার যেমন সবাইকে চমকে দেয় তেমনি ওদের কথাবার্তা, অংগভংগি ও আচার-ব্যবহার আতঙ্কের সৃষ্টি করে। এদের কাছে নারী বা পুরুষের শব লাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

যে চিতাটায় উমাদি উঠবেন বলে লাইনে শুয়ে আছেন তার ওপর এখন একজন মাঝবয়সী মহিলার দেহ পুড়ছে। জ্বলন্ত কাঠের স্তূপ থেকে আলতাপরানো সুন্দর পা দুটো বেরিয়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে এসব কথা ভাবছিলাম। শ্মশানের অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। নানারকম মানুষের কান্নাকাটি, চিৎকার, আগুন, ধোঁয়া ও গন্ধ সব মিলিয়ে একটা দমবন্ধকরা পরিস্থিতি। শ্মশানের পবিত্রতা, নিস্তব্ধতা আরো কি সব ভালো ভালো কথা আগে শুনেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে হিন্দি গান বাজানো বারোয়ারি কালীপুজোর মণ্ডপে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

একদিন আমাকেও মরতে হবে। কিভাবে মরবো জানি না। মরলে কারা আমাকে শ্মশানে নিয়ে আসবে কে জানে! হয়তো ঐ খিস্তিখেউড় করা ভাড়াটে চাঙারারাই কুৎসিত রংতামাশা করতে করতে আমাকে এনে শ্মশানে তুলবে। কেউ জানবে না অনেকদিন আগে শ্মশানে দাঁড়িয়ে আমি এসব কথা ভেবেছিলাম এবং ভেবে দুঃখ পেয়েছিলাম। না

মরে উপায় নেই, না মরলে পৃথিবীতে তিল ধারণের জায়গা থাকবে না। তাই সব জিনিসই আস্তে আস্তে পুরনো হয়ে শেষে ভেঙে পড়ে। নতুনের জন্য জায়গা করে দেয়।

পাঁচ-ছ জন মাঝবয়সী ভদ্রলোক খাট শুদ্ধু একটি শব এনে নিঃশব্দে রাখলেন। ওদের সঙ্গে কোনো মহিলা নেই, আছে বছর পনের-ষোল বয়সের একটি তরুণ। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। ছেলেটি আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে উঠলো। এ কার মুখ! এতো মিল থাকে দুটো মুখের! ছেলেটির সারা মুখে দুঃখের ছাপ। দেখলেই বোঝা যায় অনেক কেঁদেছে ও। চারদিকে অসহায়ের মতো তাকাচ্ছে। আমার মতোই ছেলেটি বোধহয় এই প্রথম শ্মশানে এলো। ওর কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা ভয়ঙ্কর কিছু বলে মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই।

দু'পা এগিয়ে মৃতদেহের মুখটা দেখার চেষ্টা করলাম, কিন্তু দেখা গেলো না। পাশ থেকে অরুণা জানতে চাইলো আমি কি দেখার চেষ্টা করছি। ওকে কিছু না বলে পেছনে সরে এলাম। ছেলেটা আমার দিকে তাকালো। মনে হলো আঠারো বছর আগে কোনো একদিন আরেকজন কেউ আমার মুখে ঠিক এমনি তাকিয়েছিলো। খুব ইচ্ছে করছে ছেলেটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করি ও কে। কিন্তু পাশেই রয়েছে অরুণা, সীমা ও অপর্ণারা। একবার মনে হলো এ সবই আমার দেখার ভুল, ভাবার ভুল। সমস্ত চিন্তাটাকেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইলাম।

কিন্তু পারলাম কই। ঘুরে ফিরে ছেলেটির মুখ আমার মনের প্রতিরোধ ভেঙে দিতে চাইলো। এবং ভেঙে ফেললোও শেষ পর্যন্ত। আমি দেখলাম ছেলেটি শ্মশানের চত্বর ছেড়ে রাস্তার দিকে ভিড়ের মধ্যে চলে গেলো। ওর সঙ্গে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের একজন হাত নেড়ে ওকে যেন কীসব বোঝালেন। চোখ জ্বালা করার অজুহাত দেখিয়ে আমি সহকর্মীদের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে বাইরে রাস্তায় এলাম। কী নোংরা রাস্তা। শুয়োর নেড়ি কুকুরারা রাস্তার পাশের আবর্জনা খাচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে আমার চোখ ছেলেটিকে খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলো চায়ের দোকানের সামনে একটা বেঞ্চির ওপর। পকেট থেকে রুমাল বের করে ছেলেটি মুখ মুছছে। আমি কাছে এসে দাঁড়াতেই সে আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো। আমি পাশে বসলাম। ছেলেটি একটু সরে বসলো।

'তোমার নাম কি?'

'কেন বলুন তো?'

'বলো না, নাম বলতে তোমার আপত্তি আছে?' আমার শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে। ওর প্রশ্ন করার ঢঙটাও যেন হুবহু একরকম।

'অমিতাভ দত্ত। কিন্তু আপনি নাম জানতে চাইলেন কেন?'

'বাবু, আপকা চায়।' আমাদের কথার মাঝখানে চা-দোকানের লোকটি ভাড়ে করে চা এগিয়ে দিলো ছেলেটির দিকে।

'আপনি চা খান?' হাত বাড়িয়ে চা নিতে নিতে ও আমাকে জিজ্ঞেস করে।

'খাই, তবে তো এখানে খেতে ইচ্ছে করছে না। তোমার নাম অমিতাভ?' আমি আবার চমকে উঠলাম। বললাম 'কাকে তোমরা নিয়ে এসেছো? উনি কে হন তোমার?'

'আমার বাবা। আজ ভোর রাতে হঠাৎ স্ট্রোক হয়েছিলো। কিছুই করা গেলো না।'

দূর থেকে ছেলেটিকে যতো শোকার্ত ও দুঃখী মনে হয়েছিলো কথা শুনে কিন্তু বুঝতে পারলাম ওর ভেতরে এক ধরনের দৃঢ়তা রয়েছে যা বাইরে থেকে অনুভব করা যায় না। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওঁর নামটা আমি জানতে পারি কি?'

'কি ব্যাপার বলুন তো? বাবার নাম আপনি জানতে চাইছেন কেন?'

'কোনো ভয় নেই তোমার, আমি পুলিশের লোক নই। একটা স্কুলে পড়াই।'

'বুঝলাম। কিন্তু আমার বাবার নাম জেনে আপনার কী হবে বুঝতে পারছি না।' অমিতাভর কথার সুরে ঔৎসুক্য এবং চাপা বিরক্তি প্রকাশ পেলো যেন।

'এমনি। তোমার আপত্তি থাকলে বলবে না।' একটু অভিমানের সুরেই বললাম আমি।

'সমরেশ দত্ত।'

'সম –' আমার হৃৎপিণ্ডে হঠাৎ একসঙ্গে কেউ যেন বরফ এবং ফুটন্ত তেল ফেলে দিলো। গলার ভেতরে কী যেন একটা আটকে গেছে, কথা বেরুচ্ছে না। অমিতাভ নিশ্চয়ই আমার আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ করেছে।

'বাবাকে কি আপনি চিনতেন? আপনি কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।' বিব্রত সুরে বললো অমিতাভ।

'না – না, তোমার বাবাকে আমি চিনবো কি করে!' নিজেকে কোনোমতে সামলে নিলাম। 'তা তোমার মাকে দেখছি না, উনি আসেননি?'

'না। আমি যখন খুব ছোটো মা তখন আমাদের ছেড়ে চলে যায়।'

'আহা, মাকেও হারিয়েছো।' আমার কেন জানি কান্না পেয়ে গেলো।

'আপনি দুঃখ পাচ্ছেন কেন অযথা? মা হয়তো বেঁচে আছে এখনও এবং ভালোভাবেই বেঁচে আছে।'

'মানে?'

'মানে খুব সহজ। মা বাবাকে ও আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলো বাবার এক বন্ধুর সঙ্গে।' খুব ঠান্ডা গলায় আস্তে আস্তে বললো অমিতাভ।

প্রচণ্ড হুইসিল বাজিয়ে ঝকঝক শব্দ করে চক্ররেল চলে গেলো দক্ষিণ দিকে।

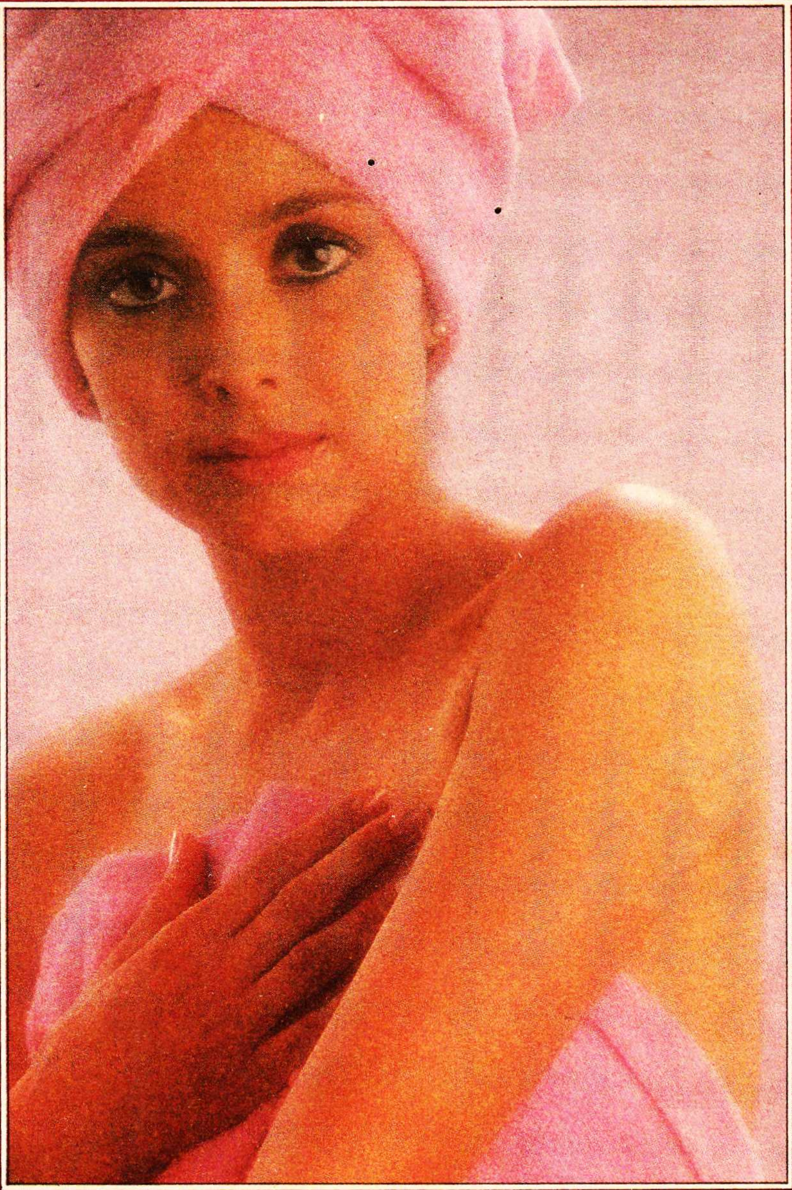
উমাদির চিতা জ্বলছে। সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। আগুনের লেলিহান শিখা এক-একবার বাড়ছে, আবার কমছে। ডোম টায়ারের টুকরো দিতে চেয়েছিলো। আমরা বারণ করেছি। দোকান থেকে আমরা তিন কেজি বনস্পতি এনে দিয়েছি চিতায় দেবার জন্য। চিতা জ্বলছে। ডানপাশে যে ডোমের আওতায় সমরেশ রয়েছে তার হাত ভর্তি। এখনো আরও দুজনকে পোড়াতে হবে। সমরেশের চিতায় ওঠা আমার দেখা হবে না। সেই ভাল।

জ্বলন্ত ছটা শ্মশানের ধোঁয়ার আস্তরণের ওপার থেকে আঠারো বছর আগের সমরেশ উঠে দাঁড়াল। হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবী আর পাজামা পরা সমরেশ। লাইটহাউস সিনেমায় দুপুরের শোতে সিনেমা দেখতে গিয়ে প্রথম পরিচয়। পাশের একটি বদমাশ ছোকরা অন্ধকারে গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করতেই চিৎকার করে উঠেছিলাম। পেছনেই ছিল সমরেশ। ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোকরার কলার চেপে ধরল। ছেলেটি সাঁ করে ছোরা বার করতেই সমরেশ ছোরাশুদ্ধ হাত মচকে দিল। হৈচৈ চিৎকার। শো বন্ধ। আলো জ্বলে উঠল। পাশের আরেকটি লোক আচমকা ছেলেটির নাকে চালাল ঘুসি। ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগলো নাকমুখ বেয়ে। হল থেকে বেরিয়ে এলাম।

সেদিন সমরেশ আমাকে হস্টেল অবধি পৌঁছে দিয়েছিল। অনেক কথা হয়েছিল সেদিন। তারপরে আরও অনেকদিন। আমি তখন কলেজে পড়ি। সমরেশও। পড়াশোনার বাইরে সমরেশের যে আরেকটা জীবন ছিল সেটা পরে জেনেছিলাম। পৃথিবীকে বদলাতে হবে, জঞ্জাল সরাতে হবে, মানুষকে মানুষের মত বাঁচতে হবে। আর সেই বদলানোটা রবীন্দ্রনাথ বা অতুলপ্রসাদের গান গেয়ে হবে না। বিপ্লব করতে হবে – রক্তাক্ত বিপ্লব। সমরেশ এসব কথা বলত। শুধু বলতই না, ভাবতো এবং নিজের ভাবনাকে কাজে পরিণত করবে বলে প্রতিজ্ঞাও করেছিল। ও বলতো ও একা নয়ই আরও অনেকেই আছে ওর সঙ্গে। বাধা আসবে, বিপদ আসবে এমনকি মৃত্যুও আসতে পারে অতর্কিতে। তাই বলে ক্লীবের মত হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। এসব কথা সমরেশ যখন বলতো, ওর দুচোখে আগুন জ্বলতো।

একদিন, হ্যাঁ একদিনই সমরেশ নিয়ে গিয়েছিলো ওদের বাড়িতে। বেশ ভাল অবস্থা। বাবা পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসার। বেশ রাশভারী লোক। বছর দুয়েক বাদেই অবসর নেবেন। আমার সঙ্গে কোনো কথাই বললেন না। মা খুব ঠান্ডা মানুষ। একটা ম্লান হাসি ওর মুখে লেগে থাকে সবসময়। আমার হাত চেপে ধরে অনুরোধ করেছিলেন ছেলেকে সর্বনাশা নেশা থেকে ফিরিয়ে আনতে। সমরেশের বাবা নাকি সাফ

নতুন ল্যাকমে কস্‌মেটিক সাবান



ত্বকের স্বপ্নময় লাবণ্যের জন্যে.

ল্যাকমে কস্‌মেটিক সাবান বিশেষ ত্বক মোলায়েমের অয়েলে সমৃদ্ধ.

অনুভব করুন অঙ্গ ঘিরে ল্যাকমে কস্‌মেটিকের ক্রীমেভরা ফেনা, নিজেই বুঝবেন সুরভিত এই ফেনার জাতই আলাদা।

এইতো ত্বককে মোলায়েম করা বিশেষ তেলের আদরভরা পরশ, যা আপনার ত্বককে করে তোলে পেলব কোমল, লাবণ্যে ঢলঢল।

ল্যাকমে কস্‌মেটিক সাবান।

প্রতি রমণীর কমনীয় ত্বকের স্বপ্ন আজ সার্থক।



Lakmé

Enterprise/LL/1bB

বলে দিয়েছেন পুলিশ যদি ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মেরে ফেলে উনি কিছুই বলবেন না।

সমরেশের দুবছরের ছোট বোন উত্তরা হাসতে হাসতে বলছিলো ওর দাদার বিপ্লব নাকি ওর জ্যাঠাইমার সেই ভাগলপুরি গাই-এর মতো। দিনে দশ-বারো সের দুধ দেবার সার্টিফিকেট নিয়ে অনেক দামের বিনিময়ে সে এসেছিলো জ্যাঠাইমার ঘরে। দুধ দেওয়া তো দূরের কথা, পাঁচ বছর কেটে যাবার পরও সে সন্তানসম্ভবা হলো না। এদেশে বিপ্লব বন্ধ দরোজার বাইরে অপেক্ষা করছে, শুধু দরোজা খুলে দেওয়ার অপেক্ষা – এ ধরনের কথা অতীতেও শোনা গেছে। কিন্তু দরোজা খুলে দেখা গেছে বাইরে শুধু বন্ধ্যা হাওয়া হাহাকার করছে।

সমরেশ সেদিন তাড়া করে গিয়েছিলো বোনকে মারতে।

আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলাম সমরেশকে ফিরিয়ে আনতে। কারণ, আমার কেন জানি মনে হয়েছিলো এক ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে ও এগিয়ে যাচ্ছে। সেই সময়কার দিনরাত্রিগুলি দ্রুতগতিতে অন্ধকার হয়ে আসছিলো। ভোরের আলোয় দেখা যেতো রাস্তার ধারে একদল তাজা তরুণের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ। অনেক তরুণ হঠাৎ চিরকালের জন্য হারিয়ে গেলো। রাস্তার মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ খুন হচ্ছে। বেলেঘাটায় রাতের অন্ধকারে দেওয়ালে দাঁড় করিয়ে কারা একদল তরুণকে গুলি করে মেরে রেখে গেলো। তারপর এলো বরাহনগর।

হঠাৎ একসময় মনে হলো সমরেশ কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠেছে। ওর কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম দলের নেতৃত্বের সংগে মতের অমিল হচ্ছে। কিছুতেই সমরেশ মানিয়ে নিতে পারছে না। ওর স্বপ্নের জগৎ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। কিন্তু ফেরার রাস্তা বন্ধ। রাস্তার দুই মুখেই মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে, হাতে উদ্যত খড়্গ।

তারপর একদিন সমরেশ হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলো। ওদের বাড়িতে ফোন করে জেনেছিলাম কোনো খবর নেই। উত্তরা ফোনে বলেছিলো মা বিছানা নিয়েছেন, কাঁদছেন সারাক্ষণ। সমরেশের বাবা কোনো কথাই বলছেন না। নির্বিকারভাবে অফিস করেন আর বাড়ি ফিরে মদের গ্লাশ নিয়ে বসেন। কেউ সমরেশের প্রসংগ তুললে উনি অন্য কথায় চলে যান। উত্তরা কেঁদে ফেললো টেলিফোনে।

বাকি ইতিহাসের কিছুটা জেনেছি অমিতাভর কাছ থেকে। সমরেশ বম্বেতে এক ওষুধ কোম্পানির সেলস এগজিকিউটিভ হয়েছিলো। বিয়ে করেছিলো কোনো এক প্রবাসী বাঙালি ব্যবসায়ীর মেয়েকে যার ফিল্মস্টার হবার উদগ্র বাসনা ওকে ঠেলে দেয় সমরেশের এক করিতকর্মা বন্ধুর বুকে। বছর তিনেক হলো সমরেশ কলকাতায় এসেছে কোম্পানির ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হয়ে।

উমাদির শরীর পুড়ে প্রায় ছাই হয়ে গেছে। একটু পরেই অপেক্ষমান আরেকটি শব উঠবে এই চিতায়। ডোমের লোক দক্ষতার সংগে কাজ করে যাচ্ছে। ওই তো ওপাশে সমরেশ শুয়ে আছে। ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না। না দেখা যাওয়াই ভালো। অমিতাভ দাঁড়িয়ে কথা বলছে এক ভদ্রলোকের সংগে। ওর সংগের লোকরা হচ্ছেন সমরেশের অফিসের।

সমরেশ ওইখানে শুয়ে আছে। সমরেশ, তুমি একদিন বলেছিলে আমাদের ছেলের নাম রাখবে অমিতাভ। তুমি বলেছিলে যেমন বিপ্লবের জন্য তেমনি আমার জন্যই তুমি প্রাণ দিতে পারো। জানি না তোমার বিপ্লব তোমাকে শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে গিয়েছিলো। আজ এই এতো মৃতদেহের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তোমার মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি না। তোমার মুখ একরাশ লাল গোলাপের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে।

উমাদির শেষ চিহ্ন নাভিকুণ্ড গংগায় ভাসিয়ে দিয়ে এলো রতন। শিশুর মতো কেঁদে উঠলো আবার। শেষবারের মতো অমিতাভকে দেখে বেরিয়ে এলাম আমরা। বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে ব্যস্ত কোলাহলের ওপর।

গোধূলিগগনের মেঘে ঢেকে গেছে তারা!

ছবি : পোলারিশ




স্নিগ্ধ সুরভিত আইরিশ
তনুমন ভরে তোলে
সজীব অনুভবে–অপরূপ সৌরভে
স্নিগ্ধ সতেজ সুগন্ধ সম্ভার
IRIS
IRIS
fresh 'n' fragrant
TALC
Sprinkle the freshness of a bouquet of flowers on yourself
সব বয়সের
ত্বক পরিচর্যায়
মসৃণ বডি পাউডার
এমনকি শিশুদের
কোমল ত্বকের
জন্যেও
বিনামূল্যে!
প্রতি ৪০০ গ্রাম
পাউডারের সঙ্গে
একটি ৫ মিঃলিঃ
আইরিশ হ্যাংকি
পারফিউম
IRIS
FREE GIFT
HANKY PERFUME
আইরিশের অন্যান্য প্রসাধনী সম্ভার
ALL PURPOSE CREAM
VANISHING CREAM
IRIS
LIQUID MOISTURISER
CREAM
আইরিশ ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড ডাগ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট কলিকাতা-৭০০ ০৩৪
STUAD 85


“লোকের প্রশ্ন আমাদের সিন্থেটিক
দেখে যখন সিল্ক বলে ভুল হয়,
তখন আবার সিল্ক বানাবার
সখ কেন হয়?”
Garden*®
VARELI

"সিন্থেটিক যদি আমাদের ব্যবসা হয়, তো সিল্ক হল আমাদের আনন্দ !

বহু শতাব্দী ধরে, সিল্ক ছিল রানী মহারানীদের মনের মত কাপড়। এখন বহু শতাব্দী পরে, সিল্ক হয়ে উঠেছে সকল কাপড়ের সেরা··· মহারানী ! দুনিয়ার এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে সিল্কের চাহিদা নেই, কদর নেই আর তার নকল তৈরী হয় না।

আট বছর আগে, গার্ডেন এগিয়ে এলো বিলাস-তন্তুর জগতে নতুন দ্বার উদ্ঘাটন করতে— তৈরী করলো বিশ্বশ্রেণীর খাঁটি সিল্ক।

ভারতীয় সিল্কের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য — 'অসমতা' থেকে দূরে হটে, গার্ডেন-ভারেলী গ্রহণ করলো ইটালীয়ান সিল্ক বিশেষজ্ঞদের পিউরা সেটা কারিগরী জ্ঞান !



তন্তু বাছাইয়ের কঠোর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ফলে এমন সমান আর মসৃণ সিল্ক তৈরী হল যা আগে কখনও দেখা যায়নি। বিশিষ্ট প্রণালীতে সেরেসিন বা সিল্ক সূতোর স্বাভাবিক আঠা বার করে দিয়ে আমাদের কাপড় এত কোমল আর ভাঁজ-রহিত হল — যা আগে জানা ছিল না।

মহিলারা প্রথমে বললেন, এই সিল্কের শাড়ী নাকি অতিরিক্ত মসৃণ··· ঠিক সিন্থেটিকের মত। তবে "অতিরিক্ত রেশমী বা মসৃণ" কথাটা সিল্কের পক্ষে খাটে না। সিল্ক যত মসৃণ হয় ততই উৎকৃষ্ট !

আমরা হলাম সিন্থেটিকের বিশেষজ্ঞ, সিল্ক হল আমাদের চরম লক্ষ্য !"

প্রফুল্ল এ শাহ্, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, গার্ডেন সিল্ক মিল্স প্রা. লিঃ; চেয়ারম্যান, ভারেলী গ্রুপ।

Rediffusion/G/2585 g BN

আমেরিকায় ভারতীয় মায়ের ভাবনা

নিজের পরিবেশ থেকে অন্য পরিবেশে সন্তান পালন করা ভীষণ কষ্টকর। বংশগত সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতিতে যদি ছেলেমেয়ে বড় হতে থাকে তাহলে অভিভাবকরা খুব দুশ্চিন্তায় পড়েন। সন্তানের মধ্যে নানা অসঙ্গতি, অসম চিন্তাভাবনা মায়ের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। মা তখন ভাবতে থাকেন, তিনি কর্তব্যে ঠিক মতো মনোযোগী হতে পারছেন না – তিনি হেরে যাচ্ছেন। নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে সন্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে অন্য আবহাওয়ায়, অন্য ধরনের শিক্ষায়। এমনই একজন আমেরিকা প্রবাসী মা আমেরিকান স্কুলে সদ্য শিক্ষারত মেয়ের মানসিক পরিবর্তনের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন এই প্রতিবেদনে। যা তাঁর কাছে অন্য এক সমস্যা।

আমি অনেক বইতে পড়েছি শিশুদের মানসিক বিকাশ ঘটে চার বছর বয়সের মধ্যে। শতকরা আশি থেকে নব্বই ভাগ মস্তিষ্কের গঠনও এই সময়েই হয়। এটা জানার পর থেকেই আমি শঙ্কিত বোধ করছি, কারণ আমি আমার মেয়ের প্রতি সঠিক কর্তব্য পালন করতে পারিনি। আমার মেয়ের বয়স প্রায় সাড়ে তিন বছর, তার মানসিক বিকাশও নিশ্চয় সম্পূর্ণ হতে চলেছে আমার প্রায় কোনোরকম সাহায্য ছাড়াই। সদিচ্ছা থাকলেও আমার তেমন বিশেষ কোনো আদর্শ বা নীতি ছিল না মেয়েকে বড় করার।

ও এখন নার্সারি স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে। ওর মানসিক বিকাশের দায়িত্ব এখন আর আমার একার নেই, ওর শিক্ষিকারাও এই দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁদের নিশ্চয় অনেক নীতি, আদর্শ আছে। আগেই বলেছি, আমার অনেক আশা আর ইচ্ছা ছিল কিন্তু সময়ের অভাবে বিশেষ কিছু করে উঠতে পারিনি। আমি এতই ব্যস্ত ছিলাম যে, ওর প্রাত্যহিক কাজকর্ম ঠিক মতন দেখা শোনা করতে পারিনি।

আমার মেয়ে স্কুলে যাওয়ার ফলে আমার যে লাভটা হয়েছে তা হল – আমি গত সাড়ে তিন বছরের চেয়ে অনেক বেশি সময় পাচ্ছি। এই সময় পাওয়ার ফলেই বোধহয় ওকে নিয়ে আমার চিন্তা বেড়ে গিয়েছে। সময় পেলেই আমি ভাবতে বসি ওর কথা। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ওর শিক্ষিকারা ওকে নানা আদর্শে এবং শিক্ষায় গড়ে তুলছেন কিন্তু তাঁদের পদ্ধতিটা কি ঠিক এবং নির্ভুল?

তিন বছরের বাচ্চা নিশ্চয় সাহিত্য বা সমাজ বিজ্ঞান শিখছে না। ও যা শিখছে বা যাকে বলা হয় ওর মস্তিষ্কের গঠন হচ্ছে তা হল পৃথিবী সম্বন্ধে একটা ধারণা, এখানকার মানুষের সম্পর্ক সম্প্রীতি আর ভালমন্দের বিচার। এক কথায় বলা যায় ও একটা সাংস্কৃতিক জগৎকে চিনছে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সব ঠিকই হচ্ছে। স্কুলে তো ন্যায়-অন্যায়, ভালমন্দ বিচার বোধ জাগবেই। কিন্তু আমার সংশয় অন্য জায়গায়। বেশিরভাগ সময় আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারি না কোনটা ভাল আর কোনটা খারাপ। তবে এটা বুঝি এই ভালমন্দ ব্যাপারটা সর্বত্রই ভিন্ন রকমের। আমার মেয়ে যদি ভারতবর্ষে থাকত তাহলে হয়তো আমার এই সংশয় জাগত না। আমি যেমন শিক্ষা সংস্কৃতির মধ্যে বড় হয়েছি, সেও তাই হত। কিন্তু এখানে সংস্কৃতির বদলে যে অপসংস্কৃতি বয়ে চলেছে তা দেখে সত্যি শঙ্কিত হই।

হঠাৎ লক্ষ্য করছি, আমার সাড়ে তিন বছরের কচি আর নিষ্পাপ মেয়ে নিজেকে আমার সমান ভাবছে। সে সব কিছুই তার নিজের মতন করে ভাবছে, তার বিরুদ্ধাচরণ, অবাধ্য হওয়ার পিছনে একটাই যুক্তি, 'আমার খুশি'। সে নিজে ভাল বোঝে সে কী চায়, কী চায় না, সেই মতনই সে কাজ করে। কিছুই তাকে থামাতে পারে না; ভালবাসা, নির্ভরতা এসব তার কাছে খুব বড় মনে হয় না। তার নিজের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সে আমার চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। আমি তার চেয়ে বয়সে দশগুণ বড় হয়েও আজ এতটা ভাবতে শিখিনি।

আমার মনে হয় ছেলেমেয়েদের বন্ধুই ভাবা উচিত। তবে তারা যে অল্পবয়সী বন্ধু এটাও মনে রাখা দরকার। তাদের বুদ্ধি কম বা তারা অধীনস্থ এই ধারণা কখনোই গড়ে উঠতে দেওয়া ঠিক নয়। মা হলে কিছু সুবিধা থাকে সেই সঙ্গে কিছু দায়িত্বও এসে পড়ে। সুবিধাগুলো হল সকলের সম্মান লাভ, শ্রদ্ধা ভাজন হওয়া বা প্রত্যেকেই তাকে মেনে চলে। আমার দায়িত্বের মধ্যে অবশ্যই আছে সুখাদ্য রান্না করে সকলকে ভালবেসে পরিবেশন করা। মেয়েরও কিন্তু উচিত ভালবেসে চুপচাপ খেয়ে নেওয়া। খাওয়া ছেড়ে উঠে যাওয়া বা নষ্ট করা একেবারে উচিত নয়, বিশেষ করে খাবারের সমালোচনা করা তো খুবই অশোভন। আমি সবকিছুরই স্পষ্ট কারণ জানা পছন্দ করি এবং চাই আমার মেয়েও সবের কার্যকারণ জানতে শিখুক। তাকে সব থেকে প্রথমে যা শিখতে হবে তা হল 'কথা শোনা'। বাবা-মা যা বলেন তা শোনা উচিত। তাঁরা বয়সে বড়।

বয়সের গুরুত্বটা বুঝে ওঠা আমার মেয়ের পক্ষে বেশ কষ্টকর। মাঝে মাঝে সে ভাবে হঠাৎই ও বড় হয়ে গেছে বা সকলে ওর চেয়ে সত্যি বড় কিনা। কখনো না বুঝে বলে, 'যখন আমি বড় হব আর তুমি ছোট হবে......।' কিছুদিন পর ও নিশ্চয় বয়স বাড়ার মানেটা বুঝবে আর আমার ভয় ও আমার মতো করে বুঝবে না। ও বড়দের নাম ধরে ডাকতে শিখছে, বড়দের সঙ্গে বিষয় নির্বিশেষে গল্প করছে, তর্ক করছে, তাচ্ছিল্যও করছে। তার প্রধান উদ্দেশ্যই নিজের খুশি মতন কাজ করে নিজের পথে চলা।

কিন্তু তার শেখা দরকার বড়রা সব সময়ই সম্মানীয়, তাঁদের উপযুক্ত সম্বোধন করা উচিত। বড়দের দেখলে উঠে দাঁড়ানো, প্রণাম করা বা 'আপনার আশীর্বাদে', 'আপনার অনুমতি নিয়ে' এই জাতীয় কথাগুলো বলতে তো কোনো বাধা নেই। বড়দের সঙ্গে তর্ক করাও ঠিক নয়, মতামত না চাইলে দেওয়াও উচিত নয়। তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা বা গুরুজনদের নিয়ে হাসাহাসি করাটা অত্যন্ত অশোভন। নিজেকে বড় ভাবারও কোনো কারণ নেই। ছোটরা কখনোই বড়দের সমান নয়, হতেও পারবে না।

আমার মেয়ে এখনই মনে করে যে, সে যেটা চাইবে সেটা তারই হবে। ও যদি কোনো চেয়ারে বসে থাকে তাহলে কেউ ওকে সরিয়ে বসতে পারবে না। কারণ 'আমি প্রথম বসেছি, আমার অধিকার বেশি।' তাকে কেউ বোঝাতে পারবে না যে, অন্যদেরও বসতে দেওয়া উচিত। এই শিক্ষা নিশ্চয় সে স্কুলে পাচ্ছে না। আত্মসুখ, স্বার্থপরতা এখনই তার মধ্যে ঢুকে গেছে। 'কে আগে অধিকার করেছে?' এই প্রশ্নটা সে সবার আগে শিখেছে। সোজা কথায় বলতে গেলে, 'কে আগে ছিনিয়ে, জোর করে তুলে এনে লুকিয়ে রাখতে পেরেছে?' তাকে কিন্তু কোনো ভাবেই সহিষ্ণু হতে শেখানো হচ্ছে না। তাহলে তো নিজের খুশির বাইরে অনেক কিছু করতে হবে। যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ করত তাহলে বলতাম, 'চেয়ারটা ওঁকে দাও, উনি আমাদের অতিথি', 'ও তোমার চেয়ে ছোট, ওকে খেলনাটা দাও', 'আমি তোমার মা, আমার সঙ্গে তুমি ওটা ভাগ করে নেবে না?' – এইরকম আরো কিছু কথা। কিন্তু সামাজিক শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়ার দিন আমার আর নেই, গুরুত্বও নেই। ও এখন অন্যের হাতে চলে গেছে, যাঁরা ওকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে গড়ে তুলবেন।

সেদিন সকালে আমি আমার জীবনের সব চেয়ে বড় চমক পেলাম। আমার মেয়ে দুধটা অর্ধেক খেয়ে বলে উঠল, 'আমার আর খেতে ইচ্ছা করছে না, এটা বেসিনে ফেলে দিচ্ছি।' আমার বাড়িতে ওকে কখনো এই ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয়নি তাই অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'তোমাকে কে বলল তুমি এটা করতে পারো?' 'আমার টিচার বলেছে।' মাত্র কয়েক সপ্তাহ স্কুলে গিয়েই ওর মন থেকে সব সুন্দর ভাবনাগুলো মুছে গেছে। খাবার ফেলতে নেই, খাবার ভগবানতুল্য, কত গরীব দুঃখী খেতে পায় না এসব কথা ভুলে শুধু সুবিধাবাদী আর স্বার্থপরতা শিখেছে। আমি অনুভব করছি আমি একটা যুদ্ধে হেরে যাচ্ছি। এই যুদ্ধটা প্রায় প্রতিটি বাবা-মাকেই করতে হচ্ছে ছেলেমেয়ের স্কুলের শিক্ষার সঙ্গে। আমি আরো পরাজিত হয়েছি আমেরিকান সভ্যতা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আমার ভারতীয় সংস্কৃতি আর চিন্তাধারা নিয়ে। আমার আশা এই পরাজয়ের গ্লানি শীঘ্রই ঘুচে যাবে।

শিকাগো থেকে
নীতা মজুমদার



শিশুর প্রথম বছর

শিশুর জীবনের প্রথম বছরটাকে আমরা কোনো হিসেবের মধ্যে ধরি না। অথচ এই এক বছর বয়সের মধ্যেই শিশু যেসব অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়, পরবর্তী জীবনে সেগুলো জন্মগত প্রবৃত্তির মতো জীবনের উপর জেঁকে বসে। তা থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

এই সময়ে সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে দুটি বিষয়। শিশুর স্বাস্থ্য ও স্বভাব গঠন। আমাদের প্রয়োজন শিশুকে ঠিক সময়ে খাওয়ানো, ঠিক সময়ে শোয়ানো, ঠিক সময়ে মলত্যাগ করছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা। অন্য সময় তাকে আপনমনে থাকতে দেওয়া। অথচ এটুকুই আমরা ঠিকমত করি না। শিশু কান্নাকাটি করলে কর্মব্যস্ত মা তাকে স্তন্যদান করতে ছুটে আসেন, নয়তো ফিডিং বটলের নিপল তার মুখে গুঁজে দেন। আমরা ভুলে যাই শিশুরা যথেষ্ট চালাক। কাঁদলেই যদি আদর বা খাবার পাওয়া যায় তাহলে ও দুটো পাওয়ার খেয়াল হলেই তারা কাঁদবে।

শিশুকে কোনো কিছুতে অভ্যস্ত করতে নেই। তার নিজের গতিতে তাকে শিখতে দিন। আপনার মনের কিছুই শিশুর ওপর চাপিয়ে দেবেন না। শিশুদের শেখবার ইচ্ছা প্রবল। তাকে বুঝতে দিন, কোনো কৃতকার্যতার জন্য তার নিজেরই মেহনত বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

তাই এই সময়টায় আদর-অনাদরে একটা ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। স্বাস্থ্যের জন্য যতটুকু প্রয়োজন যেমন খাওয়ানো, স্নান করানো, জামা পরানো, জামা বদলানো, স্বাভাবিকভাবে সময়মত করতে হবে। তবু যদি শিশু কাঁদে আপনমনে তাকে কাঁদতে দিতে হবে। অহেতুক আদর দিয়ে যদি এই বয়সেই শিশুর আত্মগরিমা বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে পরবর্তী জীবনে যখন সে সমাজের থেকে অহেতুক আদর-আপ্যায়ন পাবে না, তখন তার অযথা মন খারাপ হবে। সে বিষণ্ণ হবে।

অনেক বাড়িতে দেখি বাচ্চাকে ঘুম পাড়ানোর জন্য কী ব্যস্ততা! মা বা দিদি কোলে নিয়ে পায়চারি করছেন, নয়তো দোলনায় দোলাচ্ছেন, কতরকমের ছড়া বলছেন! ফলে ঘুমোনো – যেটা স্বাভাবিক ব্যাপার, সেটা প্রতিদিনের একটা কাণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক সময়ে, ঠিকমত বিছানায় শিশুকে শুইয়ে দিন। কথায়, আভাসে শিশুকে ঘুমোতে বলুন। তারপর সেখান থেকে চলে যান। প্রথম প্রথম সে হয়তো কাঁদবে, তাকে কাঁদতে দিন। তারপর সে নিজে থেকেই ঘুমিয়ে পড়বে। সে বুঝবে তাকে ঘুম পাড়ানোর জন্য কারো কোনো ব্যস্ততা নেই। তা যদি না করেন, তাহলে ঘুমোনোর আগে এই ব্যস্ততার অভিনয়ের জন্য সে ব্যস্ত হবে!

শিশু কাঁদে তার দৈহিক কষ্ট হলে, নয়তো আদর পাওয়ার জন্য। যখন দেখছেন তার দৈহিক কষ্টের কোনো কারণ নেই, তবুও সে কাঁদছে, তখন বুঝতে হবে সে মায়ের মনোযোগ চাইছে, আদর চাইছে। তাই এই অবস্থায় কান্নাকে স্বীকৃতি দেবেন না। অর্থাৎ কাঁদতে দিন। আপনি নিজের মনে নিজের কাজ করে যান।

শিশুদের শিখবার ইচ্ছা প্রবল। সে নিজে থেকেই হামাগুড়ি দেয়, নিজে থেকে হাঁটতে শেখে। বল, খেলনা, নিজে থেকেই হাতের মুঠোয় ধরতে শেখে। তাই হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে তাকে হাঁটতে শেখানোর দরকার নেই, বা কোনো-কিছু শেখানোর জন্য ব্যাকুল হওয়ার প্রয়োজন নেই। শিশুকে তার নিজের গতিতে শিখতে দিন। দেখা যাবে সে নিজেই চেয়ার, টেবিল বা দেয়াল ধরে হাঁটতে শিখছে। হয়তো অনেকবার পড়ে যাচ্ছে, তারপর আবার নিজে নিজেই হাঁটতে পারছে। এই যে প্রথম প্রথম না পেরে, পরে পারা – এটা খুব মূল্যবান। এ সময় তাকে প্রশংসা করুন। তাহলেই সে বুঝবে, তার কোনো কিছু করতে পারায় আপনি আনন্দিত। আরো বুঝবে, কোনো কৃতকার্যতার জন্য তার নিজেরই মেহনত বা চেষ্টার প্রয়োজন।

তাছাড়া আর একটি জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশু নিজের খেয়ালে যে বেলুনটা ওর মুখের কাছে ঝুলছে, সেটাকে হাত দিয়ে ঠেলছে, ঠেলুক। কি শুয়ে শুয়ে ঝুমঝুমিটা নাড়ছে, নাড়ুক। তাকে খেলা দেবার জন্য, তাকে ভোলানোর জন্য – মা, মাসি, দাদা, দিদি যেই হোক না কেন আর কাউকে চাই – এটা ভালো কথা নয়। তার খেলা, তার ঘুমোনো – সব সে নিজে নিজেই করুক। অপরের সঙ্গ বা সহায়তা পেতে তাকে অভ্যস্ত করা কোনোভাবেই উচিত নয়।

শিশুর জন্য কোনো ভাবনা হলে শিশুকে তা বুঝতে দেবেন না। নিজেরা ভয় পেলেও সেই ভয় শিশুর মনে সংক্রামিত হতে দেবেন না।

শিশুর প্রথম বছরের গুরুত্ব স্মরণ করে তাকে কোনো রকমের বদভ্যাস রপ্ত করানো যাবে না। অকারণ আদর দিয়ে তাকে অমানুষ করা এবং ভয় দেখিয়ে তাকে ভীত করা চলবে না। দক্ষ মালী যেমন প্রয়োজনমত বৃক্ষশিশুর পরিচর্যা করে, তাকে আপন গতিতে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে, শিশুর সম্পর্কে আপনার কাজটা হবে ঠিক সেইরকম।

শিশুর প্রতি আমাদের আচার-আচরণে মনে রাখতে হবে, সে ভাবীকালের একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। বাঘের বাচ্চাকে যেমন ভাবীকালের একটি হিংস্র বাঘ বলে লালনপালন করতে হয়, নেহাত বিড়াল মনে করলে ভুল হয়, তেমনি শিশুকেও মনে করতে হবে সে প্রাপ্তবয়স্কেরই একটি শিশু-সংস্করণ।

ডঃ সুখময় সেনগুপ্ত

[পরবর্তী সংখ্যায় 'শিশুমনের চাহিদা']



CHAITRA-BLS 437 BEN



ফটো : শংকর নাগ দাস

রবি শাস্ত্রী

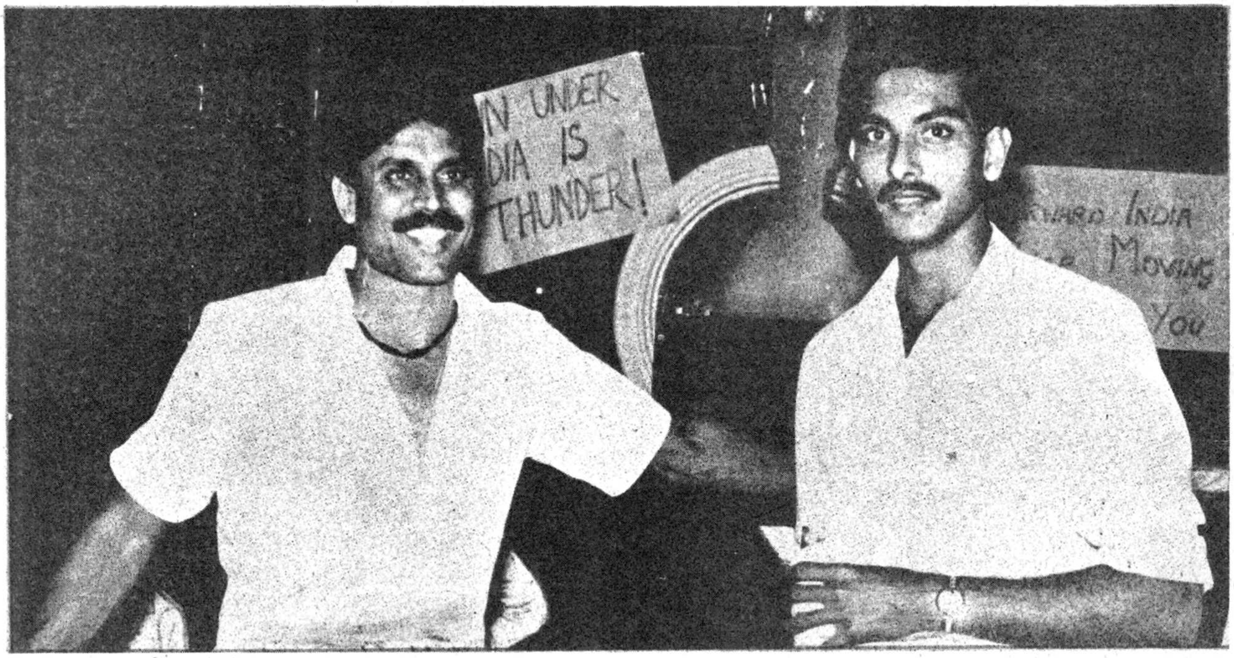
ভাগ্যের চাকাটা কার কখন কীভাবে ঘুরে যাবে কেউ বলতে পারে না। যেমন পারেননি 'দ্য চ্যাম্পিয়ন অব্ চ্যাম্পিয়নস্' রবিশঙ্কর শাস্ত্রী।

বছর সাতেক আগেও বোম্বাইয়ের মরি রোডের (দাদার-মাহিম স্ট্রেচ) নবজীবন হাউসিং সোসাইটির বাসিন্দা রবিকে কেই বা চিনতেন। কেই বা ভাবতে পেরেছিলেন, ওই বাড়ির একতলার ডানপিটে ছেলেটাই একদিন ক্রিকেট খেলে বিশ্বজোড়া নাম করবে। অন্য কারুর কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল, যাকে নিয়ে এখন বিশ্বক্রিকেটে এত হৈচৈ সেই রবি নিজেই কী ভাবতে পেরেছিলেন, যে ক্রিকেট খেলার জন্য ছোটবেলায় যে পাড়াপড়শীরা তাকে দুচোখে দেখতে পারতেন না কিংবা তার নামে যারা প্রায়ই তার বাবা ডাক্তার জয়াদিত্য শাস্ত্রীর কাছে নালিশ জানাতেন, সেইসব লোকেরাই এখন তার সঙ্গে একটু কথা বলার জন্য, তার একটা অটোগ্রাফের জন্য অথবা তার সঙ্গে একটা ছবি তোলার জন্য এরকম হাঁকপাঁক করবেন।

প্রতিবেশীদের কী দোষ! ভারতের গর্ব রবির এত বড় সাফল্যে প্রতিবেশী হিসেবে তারা তো একটু গর্ববোধ করতেই পারেন, এতে যদি একটু-আধটু আতিশয্য ঘটেই যায় তাতে রবির রাগ করার কিছু নেই। অবশ্য বাইশ বছর বয়সী এই তরুণের—যিনি ভারতীয় ক্রিকেটের 'শ্রী-ভরসা' নামে পরিচিত, রাগ করার উপায়ও নেই। কারণ ছোটবেলায় তিনি এই পাড়াপড়শীদের ওপর কম অত্যাচার করেননি। তখন এমন একটা দিন যায়নি যেদিন রবি বাড়ির কম্পাউণ্ডের মধ্যে ক্রিকেট খেলেছেন, অথচ আশেপাশের সব ফ্ল্যাট বা বাড়িগুলির জানালার কাঁচ আস্ত রয়েছে। শুধুই কি ক্রিকেট, ডাংগুলি খেলেও তিনি সেসময় কত জানালার কাঁচ ভেঙেছেন তার হিসেব বোধ হয় রবির নিজেরও মনে নেই। কাঁহাতক আর জানালার কাঁচ বদলানো যায়। তাই প্রতিবেশীরা ওর বাবা-মার সঙ্গে যুক্তি করে একদিন কম্পাউণ্ডের মধ্যে রবির সবরকম খেলার অধিকারই কেড়ে নিয়েছিলেন। তাতে অবশ্য রবি আদৌ দুঃখিত হননি, বরং দ্বিগুণ উৎসাহে বাড়ির সামনের রাস্তায় তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে ক্রিকেট খেলায় মেতে থাকতেন। একদিন ক্রিকেট খেলেই সবার মন জয় করার বাসনাটা সম্ভবত সেদিন থেকেই ছোট্ট রবির মনে বাসা বেঁধেছিল।

রবির মা লক্ষ্মী শাস্ত্রী বান্দ্রা ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপিকা। ছোটবেলায় রবির দৌরাত্ম্যে তিনিও কম হয়রান হননি। ছেলের ক্রিকেট-প্রীতিতে মাঝে-মধ্যে তার বিরক্তি আসত বটে কিন্তু রবিকে খেলাধুলো করতে তিনি কখনো বারণ করেননি। তবে রবি যে এই ক্রিকেটের দৌলতেই এরকম নতুন একটা ইতিহাস রচনা করবে এটা ইতিহাসের অধ্যাপিকা লক্ষ্মী দেবীর কাছেও খুব সুখের ছিল না। বরং রবির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অনেক রাতেই তার ঘুম আসত না। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহেও বেশ কয়েকটা রাত তার বিনিদ্র ভাবে কেটেছে। আগে ঘুম হতো না ছেলের চিন্তায় এবার ঘুমোতে পারেননি ছেলের সাফল্যের আনন্দে। ছোটবেলায় রবি তাকে হয়রান করতেন ডানপিটেমি করে। এবার লক্ষ্মী দেবী হিমসিম খাচ্ছেন রবির সাফল্যের অভিনন্দন জানাতে আসা বন্ধু আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীদের আদর আপ্যায়ন করতে।

এখন আর সে রামও নেই, নেই সেই অযোধ্যা। অর্থাৎ রবি যেমন এখন আর ছোট্টটি নেই, তেমনি নেই

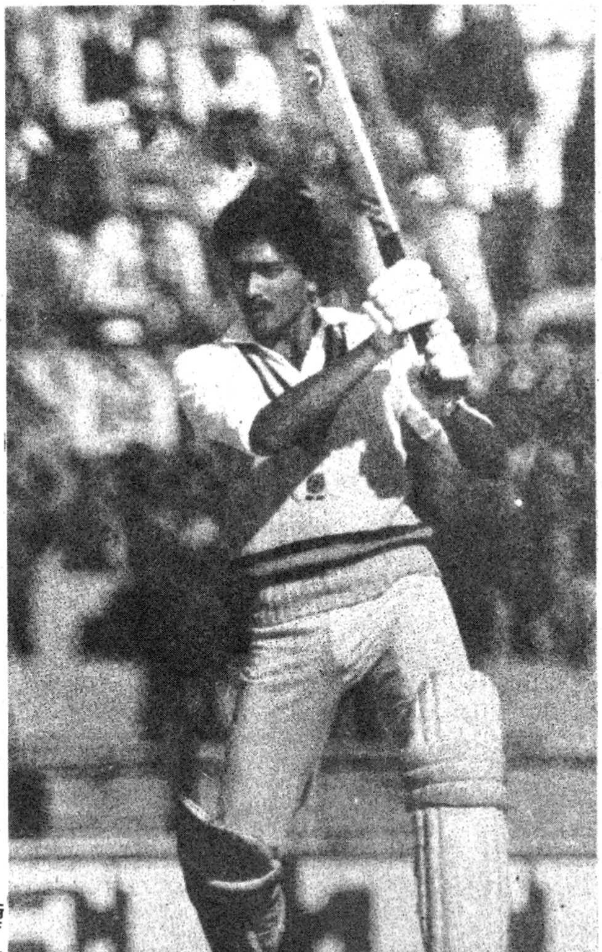


কপিলদেব ও রবি শাস্ত্রী

তার স্বভাবের চাঞ্চল্য। ছোটবেলায় যিনি এক মিনিটও চুপচাপ বসে থাকতে পারতেন না, তার মতো ধীরস্থির কিম্বা শান্তশিষ্ট ছেলে এখন আর দুটি হয় না। আরো পরিষ্কার করে বললে, ছোটবেলায় অধৈর্য রবির কাজই ছিল ভাঙচুর করা। আর এখন তিনি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে ক্রিজে দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষ বোলারদের মোকাবিলা করেন এবং গড়ে তোলেন বড় রানের ইনিংস।

অবশ্য কিছু-কিছু ক্ষেত্রে রবির স্বভাবের এখনও কোনো পরিবর্তন হয়নি। যেমন ছোটবেলা থেকেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে রবির আকর্ষণটা বেশি। এমনিতে ওরা নিরামিষাশী (কানাড়ী ব্রাহ্মণ)। রবির কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোনদিনই বাছবিচার ছিল না। সর্বভুক, হাতের কাছে যা পেতেন তাই খেয়ে ফেলতেন, এক্ষেত্রে এখনও রবি অপরিবর্তিত। এখনো প্রায়ই ছোটবেলার মত ফ্রিজ থেকে নিজের পছন্দসই খাবার বের করে খেয়ে ফেলেন রবি। বলাবাহুল্য এই কাজটা বরাবরই তিনি মাকে লুকিয়ে করতেন। বিশেষ করে সেই জিনিসটা যদি 'শ্রীখন্দ' (একজাতীয় মিষ্টি, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটে খুবই জনপ্রিয়) হয় তাহলে আর রক্ষে নেই। রবি অনায়াসেই এক কিলো শ্রীখন্দ সাবাড় করে দিতে পারেন এবং দেনও।

ছোটবেলা থেকেই রবি গান শুনতে খুব ভালবাসেন। এখনো অবসর সময়ের অনেকটাই কাটে গান শুনে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের 'রেগো' মিউজিকই (ড্রাম এবং গিটারের সংমিশ্রণে তৈরি) তার বেশি পছন্দ। বিশ্বখ্যাত রেগো গাইয়ে বব সারলের অন্ধ ফ্যান রবি দুবছর আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের সময় তার সমাধিস্থানে গিয়ে বব সারলের মৃত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছিলেন।



আর যে ব্যাপারে রবির মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি তাহল ক্রিকেট সাধনা। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে দৌড়তে যাওয়া এবং তারপর হাজারের ওপর স্কিপিং করার অভ্যাস রবির বহুদিনের। এই ব্যাপারে ওর নিষ্ঠার অভাব নেই।

এমনিতে ক্রিকেট খেলা নিয়ে রবি এত ব্যস্ত থাকেন যে অন্য কোনো দিকে নজর দেওয়ার সময় পান না, খেলা বাদ দিয়ে যতটুকু সময় বাঁচে তার মধ্যে অনেকটাই রবি খরচ করেন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কিম্বা গল্প-গুজবের পেছনে। বিশেষত মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেই তিনি বেশি উৎসাহী, সুদর্শন রবির এরকম একটা বদনাম আছে। এ ব্যাপারে সিরিয়াস ক্রিকেটার রবি কতখানি সিরিয়াস জানা নেই। তবে তিনি একে খুব উপভোগ করেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেউ যদি রবিকে প্রশ্ন করেন আপনার হবি কি ? তাহলে এক মিনিটও না ভেবে ভারতীয় ক্রিকেট দলের 'বচ' (অমিতাভ বচ্চনের ফ্যান বলে রবিকে ভারতীয় খেলোয়াড়রা ওই নামে ডাকেন) যে উত্তরটা দেবেন তা হল—ওয়াকম্যান লাগিয়ে গান শোনা, দেশ-বিদেশের কাগজ এবং ম্যাগাজিন পড়া অবশ্যই এন্টারটেইনিং গার্লস।

সন্দীপ দত্ত


নেস্টাম বেবি সিরিয়্যাল। আদর্শ, শুরু করার জন্য। বেড়ে ওঠার পক্ষে অনন্য।
নেস্টাম আর দুধ—পুষ্টির দিক থেকে এক পরিপূর্ণ খাবার।
আপনার বাচ্চার চার মাস বয়েস হলেই দুধের সংগে সংগে তার শক্ত খাবারেরও দরকার। নেস্টাম বেবি সিরিয়াল দিয়ে ওকে শক্ত খাবার ধরান—শিশুদের সহজে হজম করার উপযোগী করে বিশেষভাবে এটি তৈরী।
আগে থেকে ফোটানো কুসুম কুসুম দুধে নেস্টাম শুধু মিশিয়ে নিন। সংগে সংগেই পুষ্টিকারক খাবার তৈরী।
শিশুকে মোটাসোটা আর প্রাণোজ্জ্বল করে তুলতে সাহায্য করে।
টিনের গায়ে লেখা নিয়মাবলী ঠিকমত মেনে চলুন।
নেস্টাম ও আপনার প্রস্তুত প্রণালী—শিশুর খাবারে অসংখ্য রকমারিত্ব।
আপনার বাচ্চা যেমন যেমন বড় হবে তেমনি আপনিও তাকে নানারকম স্বাদের খাবার তৈরী করে দিতে পারেন। নেস্টামের সংগে চটকানো সব্জী, সেদ্ধ করা ফল ও ডাল মিশিয়ে নতুন নতুন স্বাদের খাবার ওকে দিন। এমনি করেই ও বাড়ির সবার সংগে মিলে নানারকম খাবার খেতে শিখবে।
নেস্টাম® রাইস
আয়রণ ও ভিটামিনে ভরপুর দুধে মিশিয়ে নিন
এখন পাওয়া যাচ্ছে নতুন প্যাকে
Nestlé
Nestum
Rice
mix with milk
বিনামূল্যে !
খাবারে রকমারী স্বাদ আপনার বাচ্চাকে খুশি করবে। সুতরাং বিনামূল্যে নেস্টাম রেসিপি পুস্তিকার জন্য নীচের ঠিকানায় লিখুন :
নেস্টাম পোস্ট বক্স নং ৩০১৬, নিউ দিল্লী ১১০০০৮
FSL N/3800BN

আমেরিকায়
শাশুড়ি দিবস পালন প্রসঙ্গে

আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

সম্প্রতি আমেরিকার বয়স্কা মহিলারা দাবি তুলেছেন – জাতীয় ভাবে শাশুড়ি দিবস পালন করা হোক। এদেশে সারা বছর ধরে প্রতি মাসেই প্রায় কোনো না কোনো দিবস পালন চলেছে। ফেব্রুয়ারিতে আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের জন্মদিন। স্কুল, কলেজ, ব্যাঙ্ক, সরকারি দপ্তর, বহু বেসরকারি দপ্তর – ছুটি থাকে সেদিন। মার্চের শেষে বা এপ্রিলে গুড ফ্রাইডে, ইস্টার ইত্যাদির পর্ব। মে মাসের শেষে 'মেমোরিয়াল ডে'। অর্থাৎ দেশের জন্যে যত লোক প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের স্মরণ দিবস। বাড়ির ছাদে ছাদে জাতীয় পতাকা উড়ল, কবরখানায় ফুলের তোড়া সাজানো হল। রাস্তায় রাস্তায় কুচকাওয়াজ করে গেল বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, স্কাউটের দল। জুলাইতে স্বাধীনতা দিবস। আবার ছুটি। বাজি পোড়ানো, বড় বড় সাজোয়া গাড়ি নিয়ে ওয়াশিংটনে শোভাযাত্রা, টেলিভিসনে সারাদিন ধরে উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা। সেপ্টেম্বরে শ্রমিক দিবস। ছুটি এবং অবিশ্রাম আনন্দ, উত্তেজনা। দোকানে বাজারে ঢালাও 'সেল'-এর বিজ্ঞাপন। দামী জিনিস এরকম কম দামে কেনার সুযোগ একমাত্র বড়দিনের সময় ছাড়া আর কখনো পাওয়া যাবে না। তিনদিনের টানা ছুটিতে শ্রমিকরা এমন আনন্দ করে ফেলেন যে, শেষে অনেকের প্রাণ নিয়ে টানাটানি। মাতাল অবস্থায় গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে তাঁদের আনুমানিক মৃত্যুর হার আগে থেকেই খবরে ঘোষণা করে দেওয়া হয় এবং সেই সংখ্যার বিশেষ হেরফেরও হয় না। অক্টোবরে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের জন্মদিন। আবার ছুটি, আবার ড্রাম বাজিয়ে কুচকাওয়াজ, দোকানে বাজারে বিরাট সেল। নভেম্বরে থ্যাংকস্ গিভিং-এর উৎসব। বারদিনের এই ছুটির বিশেষ একটি তাৎপর্য আছে। বহু বছর আগে এদেশে একবার অজন্মা হয়ে খাদ্যের অভাব দেখা দিলে, ক্ষুধার্ত মানুষজন ঈশ্বরের কাছে খাদ্য প্রার্থনা করেছিল। তখন আকাশ থেকে বিশাল আকারের টার্কি পাখি উড়ে আসায়, তার মাংস ঝলসে খেয়ে তারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছিল। অতএব আজও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে এরা টার্কির রোস্ট করে এবং সবাইকে নেমন্তন্ন করে একসঙ্গে খায়। ডিসেম্বরের বড়দিনের জাঁকজমক তো সবচেয়ে বড় রকম জাতীয় উৎসব। এর ওপর আছে মে মাসে 'মাদার্স ডে' এবং জুন মাসে 'ফাদার্স ডে'। 'মাদার্স ডে'তে মাকে উপহার দেয় এবং ভাল রেস্টুরেন্টে খেতে নিয়ে যায় ছেলেমেয়েরা। ফাদার্স ডেতে সে আনন্দ বাবার প্রাপ্য। কিন্তু শাশুড়িরা এবার ধুয়ো তুলেছেন – 'মাদার-ইন-ল ডে' চাই। সেদিন শুধু শাশুড়ি জামাই ডিনারে যাবেন কিংবা ছেলের বউ আর শাশুড়ি। কার্ড ছাপা হওয়া চাই 'মাদার-ইন-ল ডে' উপলক্ষে। দোকানে বাজারে সেল-এর বিজ্ঞাপনে থাকতে হবে 'মাদার-ইন-ল' স্পেশ্যাল।

আমেরিকান শাশুড়িদের বিশেষত ছেলের মায়েদের এই দাবির পেছনে অবশ্যই কোনো কারণ আছে। তাঁরা জানাতে চান – সংসারে, সমাজে তাঁদেরও একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এ সমাজে এঁদের কী পরিস্থিতি, ছেলের বউ কী ব্যবহার করে, এঁরাই বা তাদের কীভাবে গ্রহণ করেন, সে আলোচনায় আসার আগে আমাদের দেশের এই বিষয়টি নিয়ে একটু তুলনা করে দেখা যাক।



শাশুড়ি মিসেস ভ্যান্ডার বেক

ভারতবর্ষে শাশুড়ি বউয়ের সম্পর্ক নিয়ে যে সব পরিবারে জটিলতার সৃষ্টি হয়ে থাকে, তার পেছনে অনেকেই অনেক কারণ আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। একান্নবর্তী পরিবার, অর্থনৈতিক চাপ, নিত্যদিন কাছাকাছি থাকার ফলে অসহিষ্ণুতা, অসন্তোষ। বিয়ের পর থেকে বাপের বাড়ির সমালোচনা শুনে শুনে বউয়ের আশাভঙ্গ, ছেলের এতকালের মাতৃনির্ভরশীল ভাব ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসায় মায়ের ক্ষোভ। ননদ, জা ইত্যাদি মহিলা শাসিত সংসারের হাজার কূটনীতি – সব মিলিয়ে পরিবেশের কারণেই সম্পর্কে চিড় ধরে যায়। নইলে আলাদাভাবে দেখলে কেউই একেবারে 'বাসের অযোগ্য' নন নিশ্চয়ই।

আমেরিকাতে এরকম পারিবারিক পরিবেশের চাপ নেই বললেই চলে। আমেরিকান ছেলে তার বিয়ের আগে থেকেই স্বাবলম্বী এবং সচরাচর আলাদা অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। নয়তো বিয়ের দিন ঠিক করেই আলাদা বাড়ির ব্যবস্থা করে নেয়। সুতরাং বউ প্রথম থেকে স্বাধীনভাবে সংসার করে। ভোরবেলা বড় সংসারের হাজার দায়িত্বের চাপ নেই, স্বামী চাকরিতে বেরিয়ে যাবার পর শাশুড়ি, ননদদের মর্জিমত চলার বাধ্যবাধকতা নেই, নেই ছোটখাট অশান্তি আর কথা কাটাকাটির ভয়। টাকাপয়সার ক্ষেত্রেও তাই। স্বামীর রোজগারের সবটাই তার নিজের। এদেশে বৃদ্ধ বাবা, মা সরকার থেকে 'সোস্যাল সিকিউরিটি'র ভাতা পান (কর্মজীবনে এ জন্যে টাকা জমা দিয়ে যেতে হয় প্রত্যেকটি কর্মীকে)। এছাড়া নিজেদের যৌথ কর্মজীবনের পেনশন, অন্যান্য সঞ্চয়ও থাকে অল্প-বিস্তর। ফলে টাকাপয়সা সংক্রান্ত অশান্তি নেই। ছেলের কাছে প্রত্যাশা কম, অভিযোগও কম। কুটুম্বিতা বলে তো কোনো ব্যাপারই নেই। দু বাড়ির বেয়াই বেয়ানে মাঝে মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হল, তো হালকা গল্পগুজবের চেয়ে বেশি গভীরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই কোনো পক্ষেরই। অতএব 'জামাই ষষ্ঠীতে তোমার বাবা এই দেয়নি', 'পূজোর তত্ত্বে কিছুই দিল না সেরকম' বা 'তোমার ননদদের ও বাড়িতে নেমন্তন্ন করা হল না কেন' – এ ধরনের হুল-বেঁধানো কথার অবকাশই নেই। শাশুড়িরা কর্তৃত্বের অভাব নিয়ে কাকে দুঃখ জানাতে যাবেন? সামাজিক গঠনটাই তো একেবারে আলাদা। তাহলে? তাহলে তো এ দেশ বউদের স্বর্গরাজ্য হওয়া উচিত। শাশুড়ির স্নেহ ভালোবাসা? একান্নবর্তী পরিবারের অন্যান্য সুখ সুবিধে? ছেলেমেয়ে বড় করার সময় শাশুড়ির সাহায্য, যত্ন-পরিচর্যা, সংসারের নানা সমস্যায় মাথার ওপর ছাতার মতো তাঁর উপস্থিতির নিশ্চিন্ততা – এগুলো কি জীবনের সম্পদ নয়? না, এসব নিয়ে এরা একেবারেই মাথা ঘামায় না।



আমেরিকান পুত্রবধূ ফ্রান্সিস

প্রায়ই পরিচিত আমেরিকান মহিলাদের শাশুড়ি সম্পর্কে মনোভাবের আভাস পাই। গত বছর পাশের বাড়ির ফ্রান্সিস-এর কাছে ওর শাশুড়ি এলেন দশ বছর পরে, এক মাসের জন্যে। পায়ের জোর নেই বলে হুইল চেয়ারে বসে বসে সারাদিন রগরগে প্রেমের উপন্যাস পড়তেন। ভদ্রমহিলা সেই আমলে স্বামীকে ডিভোর্স করে দ্বিতীয়বার বিয়ে করাতে ছেলে রিচার্ড কোনোদিনই তাঁকে আমল দিত না। বারো মাস মেয়ের সংসারেই থাকতেন। এবার বউ নিয়ে এসে কিছুদিন দেখাশোনা করল। তারপর পাততাড়ি গুটিয়ে মেয়ের কাছে ফিরে গেলেন আবার। উনি চলে যাবার পর একদিন ওঁর ছেলে আমার স্বামীর সঙ্গে বাগানে বসে বসে অনেকক্ষণ গল্প করল। সন্ধেবেলা আমার মেয়ে বলল – 'মিশেলের ঠাকুমা (ঐ বৃদ্ধা) মারা গেছে লাস্ট উইকে। ওর বাবা ফিউনারালে ভার্জিনিয়া গিয়েছিল। কাল

PERFECT VISION LATEST FASHION



G K B OFFERS

- SCIENTIFIC DISPENSING OF SPECTACLES
- EYE TESTING AND CONTACT LENS CLINIC.
- WIDEST VARIETY OF HI-FASHION FRAMES AND SUNGLASSES
- EXPORT QUALITY LENSES

GKB Opticals

(Gopal Krishna & Bros.)

14/8A, GARIAHAT ROAD,
CALCUTTA-700 019.
Ph. : 42-5907, 42-5894

ORIENT/GKB/385

ফিরেছে।' আমার স্বামী আশ্চর্য হয়ে বললেন – 'আজ সারা বিকেল রিচার্ডের সঙ্গে গল্প করলাম। কই, একবারও তো বলল না ওর মা মারা গেছে!'

মহিলাদের এক আড্ডায় আমি একবার বলেছিলাম, 'তোমরা যে মাদার-ইন-ল'র নামে ভুরু কোঁচকাও, মুখ টিপে হাসো, কেন? তোমাদের তো কোনো স্বার্থের সংঘাতই হয় না। বাসই করো না একসঙ্গে। সেদিন যেন চায়ের পেয়ালায় তুফান উঠল। তেইশ বছরের বউ প্যাট বলল – 'শাশুড়ি মানেই টেনশন। আমি তো বিয়ের আগেই নার্ভাস! কী পোশাক পরে প্রথমবার ওদের সঙ্গে দেখা করতে যাব, ভেবে পাই না। সারা সন্ধে ওদের বাড়িতে চুপ করে বসে থাকলাম, পাছে কোনো বোকা-বোকা কথা বলে ফেলি, এই ভয়ে। মাইকের মা আমাকে টেরিয়ে টেরিয়ে লক্ষ্য করছিল। তারপর গায়ে পড়ে উপদেশ দিতে লাগল – বিয়েতে কী কী ব্যবস্থা থাকা দরকার ইত্যাদি। যেন আমি জানি না, বিয়ে কীভাবে হয়। বাড়ি এসে খুব কেঁদেছিলাম ওই মহিলাকে সারাজীবন সহ্য করতে হবে ভেবে।'

২৮ বছরের ন্যান্সী বলল, 'বিয়ের পর দেখি, প্রতিদিন আমার শাশুড়ি পাঁচ মাইল দূর থেকে এক খাবারের কৌটো হাতে সন্ধেবেলা এসে উপস্থিত হচ্ছেন। কী ব্যাপার, না ওঁর ছেলে ইটালিয়ান রান্না ভালবাসে। তাই মার নিত্য নতুন পদ করে আনা চাই। এদিকে আমার রান্না তবে খাবে কে? ছেলে রোজ মার খাবার খেয়ে পেট ভরিয়ে ফেলে। তাছাড়া আমাদের ডিনারের সময় শাশুড়ি এসে বসা মানে হাজার ঝামেলা। তাঁকে খাবারের কথা জিজ্ঞেস করো, না হলে কফি করে দাও। ছেলে মোটা হয়ে যাচ্ছে, তাকে জোর করে আরও খাওয়াবার চেষ্টা করছেন। কদিন বাদেই অসহ্য লাগতে শুরু করল। আমি স্বামীকে বললাম, এ সব বন্ধ করতে হবে। সে মাকে কি বোঝাল জানি না। তারপর তাঁর কৌটো হাতে আসা বন্ধ হল। এখন মাঝে মাঝে ছুটির দিনে সে মার কাছে ইটালিয়ান রান্না খেতে যায়।'

আইলীনের রাগ, তার শাশুড়ির বিনা নোটিশে যখন তখন উদয় হওয়া এবং গায়ে পড়ে তাঁর ছেলের সামনে বাড়ি পরিষ্কার শুরু করা নিয়ে। মহিলা কথা বলতে বলতে নাকি অনবরত নাতিদের ছত্রাকার করা খেলনাপত্র গুছিয়ে রাখেন, রেফ্রিজারেটরের গায়ের দাগ মুছে দেন, বাথরুমে উঁকি মেরে দেখেন বেসিন পরিষ্কার করা দরকার কিনা, জলের গেলাস আড়চোখে পরীক্ষা করে মাজতে বসে যান। আইলীনের ধারণা ইচ্ছে করেই তিনি অসময়ে এসব করতে আসেন। ছেলের সামনে বউকে অগোছালো এবং অপরিচ্ছন্ন প্রতিপন্ন করাই তাঁর আসল উদ্দেশ্য।

বাচ্চা মানুষ করা নিয়েও মতবিরোধ হয়। যদিও নাতিনাতনী তার ঠাকুমা এক বাড়ির বাসিন্দা নয়, তবু ছুটিছাটায় তো দেখাসাক্ষাৎ হয়। নাতির যেদিন সোয়েটার পরা উচিত ছিল, মা পরায়নি। নাতনীর মায়ের দুধ খেয়ে পেট ভরছে না, মা কেন বোতলের ব্যবস্থা করছে না? মার উচিত এখনই টয়লেট ট্রেনিং দেওয়া, অথচ অত বড় ছেলেকে ডায়াপার পরিয়ে যাচ্ছে। ঠাকুমার দেওয়া চকলেট মা গারবেজে ফেলে দিচ্ছে, অথচ সুবিধে নেবার বেলায় অসুস্থ বুড়ি ঠাকুমার ঘাড়ে দামাল দামাল বাচ্চা চাপিয়ে নিজেরা ঘণ্টার পর



শাশুড়ি মিসেস পেরেলি

ঘণ্টা বেড়াতে যাচ্ছে।

একজনের শাশুড়ি নাকি ক্রমাগত ছেলের কাছে দেখাতেন – বউ কি দামী দামী পোশাক কেনে। কোন্ দোকানে কি দামে ওই পোশাক, কবে দেখেছেন – সব তাঁর মুখস্থ। তখন ছেলে হেসে উড়িয়ে দিত কিন্তু অনেক পরে বিবাহবিচ্ছেদের সময় ওই টাকা পয়সার ঝগড়াই তাদের প্রধান কারণ হয়েছিল। বউয়ের ধারণা মার জন্যেই ছেলে তাকে খরচ নিয়ে কথা শোনাত।

সবচেয়ে দুঃখের সঙ্গে শাশুড়ির অবিচারের কথা বলেছিলেন এক ডিভোর্সি মহিলা। স্বামী মদ খেতেন বলে তাঁর অনেক অশান্তি হত। বহু কষ্টে সেই নেশাকে মাত্রার মধ্যে রাখার চেষ্টা করতেন উনি। কিন্তু শাশুড়ি ছেলেকে সমানে নেশার পয়সা যোগাতেন। মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে পেগের পর পেগ হুইস্কি খেয়ে ছেলে মাতাল হয়ে পড়ে থাকত। শেষ পর্যন্ত চাকরি গেল, নার্ভের অসুখ দেখা দিল। অসহ্য হয়ে বিবাহবিচ্ছেদ নিলেন মহিলা।

বউয়ের অভিযোগ অনেক রকমই শুনেছি। একদিন সিনিয়র সিটিজেন্স হোমে গিয়ে শাশুড়িদের কিছু প্রশ্ন করেছিলাম, এই একই বিষয় প্রসঙ্গে। তাঁরা বলেছেন – মেয়েরা বড় অসহিষ্ণু আজকাল। কী দোষ করেছে শাশুড়ি, যদি সে নিজের ছেলেকে কিছু রেঁধে খাওয়াতে চায়? বউয়েরা সব চাকরিগত প্রাণ। দিনের পর দিন রান্না করতে চায় না। কেনা ফ্রিজের খাবার গরম করে করে খায়। নয়তো দোকানে ডিনার সারে। ভাল ভাল ইটালিয়ান রান্না করার ক্ষমতা আছে ওদের? শান্ত চেহারার এক বৃদ্ধা বলেছিলেন – বউয়ের কাজে সাহায্য হবে ভেবেও তো কেউ তার সংসার গোছাতে যেতে পারে? ছোট বাচ্চা নিয়ে বাড়ি-ঘর পরিষ্কার করছে, চাকরি করছে, পারবে কী করে সবদিক সামলাতে? একটু হাতে হাতে পরিষ্কার করে দিলে তারই তো সুবিধে। উল্টে সে যে বিরক্ত হচ্ছে, একথা আমি তো অন্তত সহজে বুঝতেই পারতাম না। বাচ্চা মানুষ করা প্রসঙ্গেও তাঁরা অনেক কথা বলেছিলেন। অনভিজ্ঞতার দরুন মেয়েরা প্রথমবার মা হয়ে অনেক বিষয়েই ঠিক কাজ করে না। অযথা বাচ্চাদের কাঁদায়, পেট ভরছে না, তবু সময়মত খাওয়াবে না। নিজের বুকে যথেষ্ট দুধ হয়েছে, তা না দিয়ে বোতল ধরাবে। বেশিক্ষণ একটানা ডায়াপার পরে থাকলে শিশুদের নরম চামড়ার ক্ষতি হতে পারে, তা সত্ত্বেও নিজেরা রাতে উঠবে না বলে মোটা মোটা ডবল ডায়াপার পরাচ্ছে দু বছরের ছেলেকে। টয়লেট ট্রেনিং দেওয়া সময়মত দরকার বলেই তো তাঁরা উপদেশ দিতে চেষ্টা করেন। ছেলের সংসারে অতিরিক্ত বাজে খরচ হচ্ছে জেনেও তাঁরা সহজে মাথা ঘামাতে চান না, যদি না খরচের মাত্রা বেড়ে গিয়ে ছেলেকে ধার দেনা করতে হয়। এইসব নিয়ে বলতে গেলেই অপ্রিয় হওয়া।

আমেরিকায় শাশুড়ি-বউয়ের দ্বন্দ্বের চেহারা কিছু অন্যরকম হলেও দ্বন্দ্ব তো আছে ঠিকই। এর সমাধান নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন মনস্তত্ত্ববিদ আর সমাজকর্মীর দল। ড্যানিয়েল এল অ্যারোজ হলেন আমেরিকান বোর্ড অফ ফ্যামিলি সাইকোলজির প্রেসিডেন্ট। তাঁর মতে প্রথম থেকেই দু পক্ষের উচিত খোলাখুলি আলোচনা করা। শাশুড়ি কী আশা করে পাচ্ছেন না, আর বউ কী আশা করে হতাশ হচ্ছে – সামনাসামনি বসে বলা দরকার। তারপর দেখতে হবে, কে কতদূর অপরকে বুঝতে চান এবং প্রয়োজন বুঝে কিছুটা আপস করতে চান। সত্যি কথা বলাই ভাল। 'আপনি

রোজ রোজ আসবেন না' বউয়ের পক্ষে ওসব কথা বলার চেয়ে শাশুড়ির নিজেরই বোঝা দরকার তাদের সুবিধে অসুবিধে। বেশি কাছে বাড়ি নেওয়ার চেয়ে দূরে থাকা ভাল। যাতে খবর দিয়ে মাঝে মাঝে দেখাসাক্ষাৎ করা যায়। দুরন্ত নাতিনাতনীদের সব সময় ঠাকুরমার কাছে রেখে যাওয়ার মানে বৃদ্ধার ওপর অনেকখানি পরিশ্রম চাপিয়ে দেওয়া। তিনি না বললেও বউকে বুঝতে হবে, কতদিন রাখা ঠিক। নইলে ফ্যামিলি কাউন্সেলর-এর সামনে শাশুড়িকে বলতে হবে সত্যি সত্যি মাসের মধ্যে কবার তিনি রাখতে পারবেন। এই পশ্চিম মুলুকে আবেগ অনুভূতি চক্ষুলজ্জার চেয়ে যুক্তির দাবি বেশি। অধিকার বোধের চেয়ে বিবেচনা বোধ আগে। সুতরাং মানুষের নিজের সুবিধের কথা এরা চিন্তা করতে অভ্যস্ত। হয়তো তার কিছুটা প্রয়োজন আছে। নইলে বুড়ো মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অবিচার তো নেহাত কম হয় না। মনস্তত্ত্ববিদরা বলছেন – স্পষ্ট কথার মাত্রা থাকবে বইকি। 'আমার ছেলেকে আমার মতো করে মানুষ করতে দিন' – একথা যদি বা বলা যায়, কখনো বলা উচিত নয় – 'আপনার দেওয়া সোয়েটারটা নিয়ে যান। ওই রঙটা মেয়েকে পরাব না।' স্পষ্ট কথা আর অপমান করার মধ্যে অনেক তফাত।

'বস্টন ইনস্টিটিউট ফর সাইকো-থেরাপির ডিরেক্টর জেমস্ ডব্লিউ স্মিথ বলেছেন – শাশুড়ি-বউয়ের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব বেশি থাকলেও যে সব সময় সমস্যার সমাধান হয়, তা কিন্তু নয়। এ তবু কয়েক ঘণ্টার দেখাসাক্ষাৎ। কিন্তু দূরে থাকা মানে, যখন একে অন্যের বাড়িতে আসবে, তখন বেশ কদিন একসঙ্গে থাকার প্রয়োজন হয়। ফ্লোরিডার এক বৃদ্ধ দম্পতি বলেছেন – তাঁদের কাছে ছুটি কাটাতে গিয়ে ছেলে, বউ, নাতি, নাতনী এমন ব্যবহার করে যেন হোটেলে উঠেছে। ব্যবস্থার একটু ত্রুটি হলেই বিরক্তি প্রকাশ করবে। অথচ এঁরা ভয়ে ভয়ে চুপ করে থাকেন। প্রতিবাদ করলে যদি আর ওরা বেড়াতে না আসে। ছেলে বউয়ের আর কি? পয়সা আছে, বয়স আছে, তাদের বেড়াবার কত জায়গা আছে। কিন্তু এঁদের নিঃসঙ্গ জীবনে কীই বা আছে, বড়দিনের সময় দেখা হবার ওই প্রত্যাশাটুকু ছাড়া?

শাশুড়ি-বউয়ের মধ্যে কীভাবে সমঝোতা আনা যায় – এ নিয়ে সমাজ বিজ্ঞানীরা অনেক কথাই বলেছেন। দুই প্রজন্মের মানুষের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির তফাত, একটি পুরুষকে কেন্দ্র করে দুই অসমবয়সী মহিলার অধিকার বোধের সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব – একে তারা পারিবারিক সমস্যার বাইরে সামাজিক সমস্যা বলেই মনে করছেন। এদেশে স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য বেশি দূরে পৌঁছোলে সাহায্য করার জন্যে আছে ম্যারেজ কাউন্সেলিং নামে সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান। কমবয়সী ছেলেমেয়ের সঙ্গে বাবা, মায়ের অনবরত অশান্তি হলে এগিয়ে আসছে পেরেন্ট চাইল্ড রিলেশনশিপের কর্মীরা। শাশুড়ি-বউয়ের ভুল বোঝাবুঝি ভাঙাতেও নিরপেক্ষ এবং মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য তাঁরা জরুরী মনে করছেন।

আমাদের দেশে অনেক ভারতীয় পরিবারে এইসব সমস্যায় কখনো কখনো পরিবারের অন্য কেউ মধ্যস্থতার চেষ্টা করে থাকেন। স্বামী দুদিকের টানাপোড়েনে পরিস্থিতির প্রতি সঠিক বিচার করতে পারেন না। কোথাও ননদ আসেন শাশুড়ি বউয়ের দ্বন্দ্ব মেটাতে, অথচ তাঁর দুর্বলতা নিজের মায়ের প্রতি থাকা খুবই স্বাভাবিক। ফলে ভাইয়ের বউয়ের প্রতি তাঁর অবিচার অসম্ভব নয়। আবার ইদানীং বউয়ের মা, বাবা, দিদি, জামাইবাবুরাও রঙ্গমঞ্চে নেমে পড়েছেন মধ্যস্থতার ভূমিকা নিতে। কিন্তু তাঁরাও নিজেদের বাড়ির মেয়েটির দোষ সহজে দেখতে পান না। তাই সব আলোচনাই একপেশে হয়ে দাঁড়ায়।

এদেশে আপাতত শাশুড়ি সমস্যা নিয়ে বই লেখা হচ্ছে। মোটা মোটা বইয়ের চ্যাপ্টার খুলে শাশুড়ি অথবা বউরা পড়ছেন – সুখের চাবিকাঠি খুঁজে নাও। বহু যুগ ধরে দুর্বোধ্য এই সম্পর্ককে আর জটিল হতে দিও না। কখনো ভেবে নিও না – ও আমার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই এইসব ভাবে। আমি জানি, এটাই ওর ধারণা ইত্যাদি। মাঝে এক দেওয়াল আছে ঠিকই, কিন্তু এই না-জানার দেওয়ালকে অযথা দুর্ভেদ্য কোরো না। যদি পার ওই দেওয়ালে একটা দরজা করে নাও এবং সর্বদা তা খুলে রাখ। সেই দরজা যদি সজোরে বন্ধ না করে দাও, যদি মনের আসা যাওয়ার পথ খুলে রাখতে পার, হয়তো শাশুড়ি-বউ কথাটাকে ঘিরে আর বিদ্রূপ নয়; ভালবাসা জন্মাবার অবকাশ পাবে।

দেখা যাক শাশুড়ি দিবস কবে থেকে পালন করা হয়! পশ্চিমের হাওয়া পুবে পৌঁছোলে আগামী শতকে হয়তো ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়ে 'শাশুড়ি দিবস সেলে' টাঙ্গাইল, গরদ কিনতে যাবেন সেদিনের পুত্রবধূরা। □

ফটো : লেখিকা-সংগৃহীত

আপনি কি চান না আপনার বাড়ির ছেলেমেয়েরা একটা আধুনিক পত্রিকা পড়ুক? আপনার মত তারাও তো চায় বিজ্ঞানসম্মত সম্পাদনায় সত্যিই নতুন ধরনের পত্রিকা! একই পত্রিকায় এক ডজন পত্রিকার রস! অতিরঞ্জন নয় – এই সংখ্যাটি কিনেই দেখুন না! দাম মাত্র তিন টাকা।

কিশোর মন

১৬ এপ্রিল ১৯৮৫ সংখ্যা

প্রধান আকর্ষণ : সম্পূর্ণ উপন্যাস – হাসির

বেলমন্তে বনাম বাসুবাবু

গৌতম ভট্টাচার্য

বুল-ফাইটিঙস, পোদরশনী...... ইউরোপ পোত্যাগত পৃথীবি বিখ্যাত মাতাদোর মিঃ বেলমন্তে বনাম বাসুবাটীর বাসুবাবু......! হাসতে হাসতে হেঁচকি তোলার উদ্ভট উপন্যাস! প্রচ্ছদেই আভাস পাবেন!

গল্প

জুতো বদল ।। সুকুমার সেন

ভূতের সঙ্গে সাত ঘণ্টা ।। শিবতোষ ঘোষ

ভোজ ।। সুমিত্রা দেবী

অভিশাপ ।। অগাস্ট ডারলেথ

(ভাবানুবাদ ।। শ্রীধর সেনাপতি)

শেষ ম্যাজিক ।। অলক গুহ

জিভে জল ।। শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

নাটক

সব্জি বাজার ।। বাসব চট্টোপাধ্যায়

আকর্ষণীয় রচনা

স্বপ্নও বাস্তব হয় ।। অশোক চৌধুরী

কৈশোরের মজার ঘটনা ।। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

জুভেনাইল কোর্ট ।। জ্যোতির্ময় রায়

শকাব্দ, বঙ্গাব্দ এবং অন্যান্য বর্ষপঞ্জী

মঞ্জুলিকা গঙ্গোপাধ্যায়

গল্পের মত, কিন্তু সত্যি ।। শুক্লা ঘোষাল

শুভেচ্ছাপত্রে গানের সুর ।। অনুপ দত্ত

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন হোস্টেলে ছেলেমেয়েরা কেমন থাকে? ।। তথাগত চট্টোপাধ্যায়

খেলা

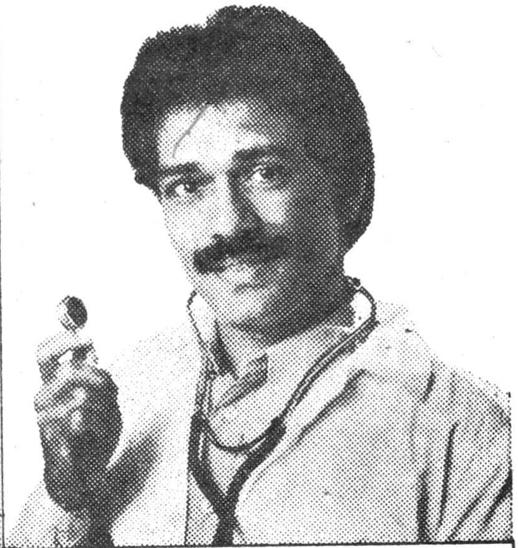
শ্যাম থাপা পনের বছরেও ফাউল করেননি কেন?

সন্দীপ দত্ত

নতুন বিভাগ ।। ভানুমতীর ক্লাস □ হাতে-কলমে ম্যাজিক শেখা

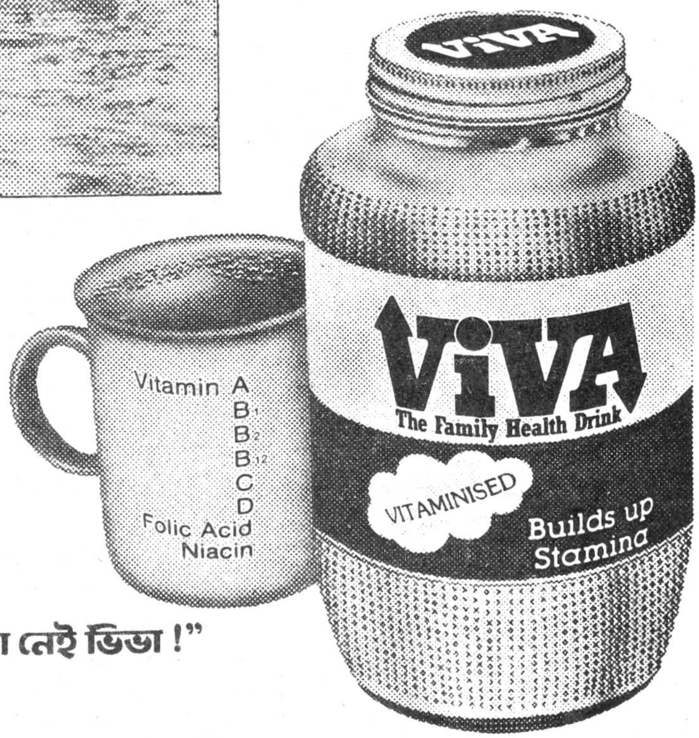
এছাড়া, সঞ্চিতা, চিঠি, ছড়া, শব্দ সম্পদ, ভাই-বোনেদের আসর, ঈশপের গল্প, অদ্রীশ বর্ধনের গল্প নিয়ে নতুন রঙিন কমিকস – আলমনগরের গুপ্তধন, অন্যান্য কমিকস, ফেলনা জিনিসের খেলনা, কিশোর মজলিস





ভিটামিন

আমাদের
সুস্থ ও সক্রিয় রাখতে
এদের প্রয়োজন
সবচেয়ে বেশি।



ভিভা ! আপনার শরীরের প্রয়োজনীয় সমস্ত ভিটামিনে ভরপুর। গম, বার্লির মল্ট ও ক্রীমযুক্ত দুধে তৈরী। ভিভা নিমেষে গুলে যায় এবং সহজে হজম হয়। আর এই সমস্তের যোগফল......

স্ট্যামিনা—যা আপনাকে তরতাজা রাখে।

তাইতো লক্ষ লক্ষ পরিবারের পরম প্রিয় ভিভা। শক্তি ও স্ট্যামিনা যোগায়···সবসময়।

"স্ট্যামিনা বজায় রাখো সদা তোমার তুলনা নেই ভিভা !"

JiL জগৎজিত ই[illegible]ীজ লিমিটেড

ASP/JIL-2/84 BEN A

গানের ভেলায় বেলা অবেলায়

বর্তমানে ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার অধ্যাপিকা রীতা কোঠারী। কলকাতার গাঙ্গুলি পরিবারের মেয়ে ছিলেন তিনি। সংগীত জগতের লোকবিশ্রুত নাম বেগম আখতারের প্রিয় শিষ্যা রীতা সংগীত সাধনাকে জীবনের ধ্রুবতারা করে এগিয়ে চলেছেন। অন্যদিকে সংগীতের প্রতি প্রেম-নিবেদিত রীতা সংসারজীবনেও পরিপূর্ণ সুখী। সেই সুখী জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র এই সাক্ষাৎকারটি।

কনট প্লেস দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছি। হঠাৎ একটা রেকর্ডের দোকানের সামনে দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াতেই হলো। ভিতর থেকে সুললিত কণ্ঠের গান ভেসে আসছে। গানের সুর আমাকে যেন পাগল করে দিল। কেউ আভোগী রাগে গজল গাইছেন, কিন্তু পঞ্চমে এসে দাঁড়াচ্ছেন। আভোগীতে পঞ্চম ব্যবহার হয় না, কিন্তু এখানে পঞ্চম ব্যবহার করেই যেন গানের অন্য এক সৌন্দর্য এনেছে।

কে এই গায়িকা?

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দোকানের ভিতর ঢুকে পড়লাম। দেখি একটা লং প্লেয়িং রেকর্ড বাজছে। ক্যায়ফী আজমীর লেখা বিখ্যাত গজল:

'সুনা করো মেরি জান ইনসে উনসে
আফসানে,
সব আজনবী হ্যায় যঁহা কৌন কিস্‌কো
পেহ্‌চানে।'

মুগ্ধ হয়ে রেকর্ডটা কিনেই ফেললাম।

জানেন কার গাওয়া রেকর্ড এটি?

ইনি বিখ্যাত গজল গায়িকা, স্বর্গীয়া বেগম আখতারের অতি প্রিয় শিষ্যা শ্রীমতী রীতা গাঙ্গুলি (কোঠারী)।

রীতা দেবীর বাবা ডঃ কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায় কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ডক্টরেট ছিলেন। দীর্ঘ ১৪ বৎসর জার্মানীর বার্লিন শহরে সপরিবারে বসবাস করছিলেন। গান্ধীজির ডাকে তিনি দেশে ফিরে এসে লখনৌ-এ জহরলাল নেহরু প্রতিষ্ঠিত স্বদেশী পত্রিকা "ন্যাশনাল হেরাল্ড"-এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেন। ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় জার্মান ভাষায় অতি সুদক্ষ ছিলেন। বিখ্যাত জার্মান কবি গোটের বিখ্যাত 'ফাউস্ট' কাব্যগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন তিনি। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাংলাদেশের কবি জসিমউদ্দিনের বহু কবিতা তিনি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন।

রীতা দেবীর মা শ্রীমতী মীনা দেবীও গান্ধীজির খুব প্রিয় ছিলেন। গান্ধীজির বিখ্যাত খাদি আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন তিনি। বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতী গীতা ঘটক রীতা দেবীর দিদি।

এমনি এক সংস্কৃতিবান পরিবারে রীতা দেবীর জন্ম। ইনি শান্তিনিকেতনের গ্র্যাজুয়েট। ওঁর রক্তেই আছে গান। সঙ্গীতের (মণিপুরী + কথাকলি নৃত্য ও রবীন্দ্র সঙ্গীত + শাস্ত্রীয় সঙ্গীত) প্রতিটি বিষয়েই উনি ৯০% নম্বর পেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে ওঁর রেকর্ড এখনো কেউ ভাঙতে পারেননি। তারপর বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞা শ্রীমতী সিদ্ধেশ্বরী দেবীর কাছে উনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, দাদরা ও ঠুংরীর তালিম নেন। ওঁর কাছেই রীতা দেবী 'গান্ডা' বেঁধেছিলেন। সিদ্ধেশ্বরী দেবীর খুব প্রিয় ছিলেন উনি। শম্ভু মহারাজের কাছ থেকে 'ঠুংরীর ভাও'-এর তালিমও নেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় গান গেয়ে বেশ নাম করে ফেলেছেন।

এই সময় ওঁর সঙ্গে পরিচয় হলো সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি'র শ্রীকেশব কোঠারী মহাশয়ের। অ্যাকাডেমির তরফ থেকে রীতা দেবীর বহু প্রোগ্রাম উনি অর্গানাইজ করেছেন।

ব্যস্‌ আর কি? অতঃপর পঞ্চশরাঘাত—তৎপরে বিবাহ। সিদ্ধেশ্বরী দেবী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের বিয়ে দিলেন। কিন্তু অভিমান হলো, সিদ্ধেশ্বরী দেবীর। গানের থেকে রীতা একজন মানুষকে বেশি ভালোবাসল, এটা যেন সহ্য করতে পারলেন না তিনি। খুব সহজেই দুজনের ভুল বোঝাবুঝি হলো। রাগ করে গান গাওয়াই ছেড়ে দিলেন রীতা দেবী।

কেবল রান্না-বান্না, ঘর সাজানো আর স্বামীর যত্ন-আত্তি করা। কখনো ভুলেও গুনগুন করেন না এমনিই অভিমান।



রীতা কোঠারী

এইভাবে কেটে গেল সাত-আট মাস।

এই সময় (১৯৬৭ সাল) 'প্রি-গালিব সেন্টিনারি ফেস্টিভ্যালের' আয়োজন করল 'সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি'। দিল্লির সপ্রু হাউসে প্রোগ্রাম হবে। নানা জায়গা থেকে সঙ্গীত জগতের বড় বড় জ্ঞানীগুণীরা আসবেন। ভীষণ উত্তেজনা চারিদিকে।

মিঃ কোঠারী গেলেন তদানীন্তন গজলের রানী বেগম আখতারকে নিমন্ত্রণ করতে ওই অনুষ্ঠানে গাইবার জন্যে, সঙ্গে সুন্দরী স্ত্রী রীতা দেবী।

রীতা দেবীকে ভালো লাগল বেগম সাহেবার। বললেন, এক শর্তে তিনি ওই অনুষ্ঠানে গান গাইতে পারেন। উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালেন মিঃ কোঠারী।

বেগম আখতার বললেন, 'রীতা যদি আমার কাছে গান শেখে তবেই।'

চমকে গেলেন রীতা দেবী। তা কী করে সম্ভব? উনি যে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর 'গান্ডা'-বাঁধা ছাত্রী, অন্য কারোর কাছে তো শিখতে পারবেন না।

জবাব শুনে রেগে গেলেন বেগম সাহেবা। তরতর করে নিচে নেমে সোজা পৌঁছে গেলেন সিদ্ধেশ্বরী দেবীর কাছে। ওঁর কাছ থেকে চেয়ে নিলেন রীতা দেবীকে।

বললেন, 'তোমার কাছে গান শেখা কতদিন হলো ছেড়ে দিয়েছে তবুও তোমাকে কী ভীষণ ভালোবাসে, তাহলে আমার কাছে যদি গান শেখে না জানি আমাকে কত ভালোবাসবে।'

মানুষ এমনিই স্নেহের কাঙাল হয়। এই স্নেহ-ভালোবাসার জন্য সে সব কিছু দিয়ে দিতে পারে, এমনকি জীবনও।

সেই থেকেই বেগম সাহেবার কাছে গজলের তালিম নিতে শুরু করলেন। তৈরি গলা ছিল। সেইজন্যে উপরে উঠতে আর দেরি হয়নি।

আমি দিল্লির কামানী অডিটোরিয়ামে একটা প্রোগ্রাম শুনতে গিয়েছিলাম। 'ফেস্টিভ্যাল অব উইমেন মিউজিক মেকার অব ইন্ডিয়া' রীতা দেবীই আয়োজন করেছিলেন।

পুরনো দিনের যত গুণী মহিলা সঙ্গীতশিল্পীরা (যাঁদের আমরা বাইজি বলি) তাঁরা গান পরিবেশন করলেন। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ স্তব্ধ বিস্ময়ে ওঁদের গান শুনতে লাগল। রীতিমতো রেওয়াজি গলা, সুললিত সুধাকণ্ঠের এই গান লোককে একেবারে মোহিত করে দিল।

সকলের সঙ্গে গিয়ে আমিও রীতা দেবীকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম এমন একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করার মতো সাহস ও মানসিকতার জন্য। এই ফাঁকে কয়েকটা প্রশ্নও করে ফেললাম।

প্রঃ—আপনি এমন একটা দুঃসাহসিক অনুষ্ঠান আয়োজন করার সাহস পেলেন কোথা থেকে?

উঃ—ফোর্ড ফাউন্ডেশন থেকে আমি ফেলোশিপ পেয়েছি। আমার বিষয়বস্তুই 'পুরনো গান ও গায়িকা'। তাছাড়া যাঁদের আপনারা বাইজি বলেন, আমি নিজে ব্রাহ্মপরিবারের মেয়ে হয়ে দিনের পর দিন ওঁদের কাছে গিয়ে গান শিখেছি, দেখেছি ওঁদের 'মরাল এথিক্‌স' অনেক বেশি স্ট্রং। মা সরস্বতীর এই বিভাগে যোগ দিলে কেন যে লোক অন্যচোখে দেখে বুঝি না। এটা কিন্তু খুব অন্যায়। (দেখলাম ক্ষোভে ওঁর মুখ অন্ধকার)।

প্রঃ—গান গাওয়া ছাড়া আপনার অন্য কোনো প্রফেশন আছে কি?

উঃ—হ্যাঁ, আমি 'ন্যাশনাল স্কুল অব্ ড্রামা'-র 'মুভমেন্ট অ্যান্ড মাইমের' প্রফেসর। অভিনয় শেখাই ছাত্র-ছাত্রীদের।

প্রঃ—এই যে 'শেখানো মুভমেন্ট'—নাটকে তার যথার্থ প্রয়োগ বিধি আছে কি?

উঃ—আছে বইকি। তবে দেখতে হবে অভিনয় নাটককে ছাড়িয়ে না যায়। নাটককে যথার্থরূপে রূপায়িত করতেই মুভমেন্ট এবং মাইমের প্রয়োজন। কিন্তু অতি অভিনয়ের চোটে যদি নাটকই মার খায় তবেই মুশকিল।

প্রঃ—গুরুশিষ্য পরম্পরা সম্পর্কে আপনার কী অভিমত?

উঃ—শুধু নাচগানের ক্ষেত্রে নয়, সর্বক্ষেত্রেই এই পরম্পরা বর্তমান। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাভাব না থাকলে কোনো ছাত্র-ছাত্রীই উপরে উঠতে পারে না।

প্রঃ—শিল্পীর কখন স্টেজে আসা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উঃ—তার কোনো সঠিক সময় নেই। তবে উপযুক্ত হওয়ার পরেই (একমাত্র গুরুই বলতে পারবেন কখন সে উপযুক্ত হয়েছে) দর্শকদের সামনে আসা উচিত। ভালোভাবে তালিম নেওয়ার আগেই যদি কোনো শিল্পী স্টেজে আসে তবে উঁচু লেবেলে কখনো উঠতে পারবে না, ওই মিডিওকার হয়েই জীবন কাটাতে হবে।

প্রঃ—আপনার স্বামী শ্রীকেশব কোঠারী মহাশয় তো 'সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমির' সেক্রেটারি। তাতে আপনার কিছু সুবিধা বা অসুবিধা হয় না?

উঃ—ঘোরতর অসুবিধা। আমি নিজের জোরেও যদি কোনো প্রোগ্রাম করি, অনেকেই তখন বলেন ওই মিঃ কোঠারীই করিয়ে দিয়েছেন। সেই দুঃখে দিল্লি শহরে প্রোগ্রাম করাই ছেড়ে দিয়েছি।

প্রঃ—এত কাজ একসঙ্গে করতে গিয়ে সংসার বা স্বামীর সঙ্গে সংঘাত হয় না?

উঃ—একেবারেই না। মানুষের যা এনার্জি সাধারণত আমরা তার এক চতুর্থাংশও খরচা করি না। সুতরাং দরকার হলে আমি আরও অনেক কাজ করতে পারি। সময় আমি একেবারেই নষ্ট করি না। আমি আগে সংসারের, তারপর আমার অন্য প্রফেশনের, সেইজন্যে সংঘাত হয় না। আমি স্বামী ছেলে-মেয়ে নিয়ে মনের দিক থেকে অত্যন্ত সুখী।

প্রঃ—আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উঃ—আমি একটা বড়ো গানের ইনস্টিটিউট করতে চাই। সেখানে নানা রকমের ডিপার্টমেন্ট থাকবে। নাচগান শেখানো ছাড়াও সঙ্গীতের উপর নানা ধরনের রিসার্চের কাজ হবে। আমার এই একটা স্বপ্ন আছে জীবনে। জানেন, গানের মধ্যে দিয়ে আপনি ভগবানের কাছে পৌঁছুতে পারেন।

খুব ভালো লাগল ওঁর কথাগুলো। তাই তো রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

'তোমার কাছে এ বর মাগি,

মরণ হতে যেন জাগি—গানের সুরে'।

সত্যি যাঁরা গান করেন তাঁদের আমার খুব ভালো লাগে, মনে হয় যেন সুরতাপসী গান্ধর্বী। ওঁকে ধন্যবাদ ও নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলাম। কিন্তু গানের সুর তখনো কানে ভাসতে লাগলো।

কৃষ্ণকলি

অপূর্ব সুযোগ! চটপট তৈরী হোন নেবার জন্য

'ফুজি'—জাপান মডেলের টু-ইন ওয়ান

(টেপ রেকর্ডার ও ট্রানজিস্টার একসংগে)



মাত্র ১৭৫ টাকার আপনি নিতে পারেন।

কোনো অগ্রিম টাকা দিতে হবে না।

প্রথম যে ৫০টি অর্ডার পাওয়া যাবে, তাদের বিনামূল্যে গোগি মিক্সার-কাম-গ্রাইণ্ডার দেওয়া হবে।

স্টক শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

নিয়ম অনুযায়ী আপনিও একটার জন্য লিখুন। সংগে ইংরেজীতে আপনার ঠিকানা জানিয়ে নীচের ঠিকানায় লিখুন:

MUSIC & VOICE (SK)

S. N. PURI Post Box No. 7060 DELHI-110065

কুশনের ব্যবহার

কুশন কথাটির সম্বন্ধে সকলেরই মোটামুটি ধারণা আছে। যে কোনোরকমের সুসজ্জিত বসার জায়গা কুশন বা তাকিয়া ছাড়া ভাবাই যায় না। এবারে দুই-চার কথায় কুশন সম্বন্ধে কিছু বলা যাক।

সাধারণত কুশন ব্যবহার করা হয় ঘরকে আরামদায়ক এবং উজ্জ্বল করে তুলতে।

কুশন সব রকমের কাপড়ের এমন কি চামড়া এবং সুচের সুন্দর আগাগোড়া নকশা তোলা কাপড় দিয়েও তৈরি হতে পারে। তবে, এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, চামড়া যেন মোলায়েম হয়, শক্ত না হয়। যে সব কুশনের ঢাকায় সূক্ষ্ম কুঁচি বা ভাঁজ নেই সে-সব কুশনের ঢাকা মোটা এবং উজ্জ্বল বা ছাপা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অপরদিকে, কুশনের ঢাকা সূক্ষ্ম কুঁচিযুক্ত করতে হলে প্রয়োজন হালকা রঙ বা হালকা ছাপের এবং অতি অবশ্যই নরম কাপড়ের। আর সুচ দিয়ে নকশা তোলা বা ফেব্রিক দিয়ে রঙ করতে হলে অতি অবশ্যই হালকা এবং নরম কাপড় হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে-সব কুশনের ঢাকায় কোনরকম. নকশা করা আছে সেখানে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, নকশাটি যেন কুশনের ঢাকার ওপর এলোমেলো বা আঁকাবাঁকাভাবে না পড়ে। একটি বড় নকশা থাকলে তা মাঝখানে, একটি ছোট নকশা থাকলে তা এক কোণে, চারটি ছোট ছোট নকশা থাকলে তা চারকোণে বা সরু বর্ডারের মতো নকশা থাকলে তা চারপাশে করা যায়। মোটা চওড়া একটিমাত্র বর্ডার থাকলে তা আড়াআড়িভাবে বা লম্বালম্বিভাবে ঠিক কুশনের মাঝখানে হতে পারে। তবে ডিভান, সোফা বা ফরাস যার ওপরেই কুশন থাকুক না কেন এসবের ওপরে পাতা ঢাকার সঙ্গে রঙ মিলিয়েই কুশনের ঢাকা করা উচিত। (এখানে রঙ মেলানো অর্থে Contrast-কেও বুঝতে হবে)।

কুশনের আকৃতি সাধারণত চৌকো বা গোল হয়। তবে ফরাস বা ডিভানে ছোট ছোট পাশবালিশের মতো তাকিয়াও রাখা যায় এবং এতে কিছুটা নতুনত্বও আসে। তাকিয়ার গায়ে, ওপরে, নিচে, দু মাথায় দুটি বর্ডার বা মাঝে আড়েরদিকে একটি চওড়া বর্ডারে নকশা তোলা যায়। আরো ভালো হয় যদি প্রথমে তাকিয়াগুলিকে বা একটি বড় তাকিয়াকে এক রঙের কাপড়ের ঢাকা পরিয়ে তার ওপরে আবার কুরুশের বেশ ফাঁকওলা নকশার ঢাকা বুনে পরানো যায় – এমনভাবে যাতে নকশার ফাঁক দিয়ে ভেতরের ঢাকার রঙটি বেশ ভালোভাবে বোঝা যায়। এতে কিছুটা নতুনত্বও আসবে। আবার ডিভান বা ফরাসের ওপরও তাকিয়ার মতোই প্রথমে একরঙের কাপড় পেতে তার ওপর একটি কুরুশের বোনা চাদর চাপা দেওয়া যায়। নতুবা শুধু সাদা চাদরের ওপরও কুরুশের চাদর পাতা যায়।

অনেকে আবার ডিভান বা ফরাসের ওপর পাতা চাদরের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে অনেকগুলি কুশন একসঙ্গে রাখতে ভালোবাসেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যদি বড় চাদরটির রঙ হালকা হলুদ বা ঘি রঙ হয় এবং একাধিক কুশন থাকে তাহলে সেগুলি লাল, কালো, সবুজ, নীল বা বেগুনী প্রভৃতি রঙের হতে পারে। এতে ঘরের ঔজ্জ্বল্য যথেষ্ট বেড়ে যায় এবং ঘরটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, ডিভানে যদি একটিমাত্র তাকিয়া রাখতে হয় তবে সেটি যে সবসময় পিঠের দিকেই রাখতে হবে তার কোনো মানে নেই। ইচ্ছা করলে সেটি ডিভানের দুই মাথার যে-কোনো একটি মাথায়ও রাখা যেতে পারে।

ডিভানের দু'পাশে দুটো তাকিয়াও রাখা যেতে পারে। আবার দু পাশে দুটি এবং পিঠের দিকে একটি, মোট তিনটি তাকিয়াও রাখা যায়। এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তাকিয়াগুলির মধ্যে গঠন, রঙ,নকশা সব বিষয়ে যেন সামঞ্জস্য থাকে। যেমন তিনটিই গুজরাটি কাজ করা তাকিয়া হলে দু' পাশের তাকিয়া দুটি কালো এবং মাঝখানের তাকিয়াটি লাল এই-ভাবেও সাজানো যেতে পারে। কুশনের ও তাকিয়ার খোলে গুজরাটি কাজ ও বাটিকের কাজও খুব ভালোই মানায়।

এত সব খাটুনি যদি না পোষায় কুশনগুলিতে মোটা, ছাপবিহীন একরঙা তিন-চার রকম কাপড় দিয়ে ঢাকা সেলাই করুন এবং রঙ মিলিয়ে মোটা করে পাইপিং দিয়ে দেখুন ঘরের আকর্ষণ ক্ষমতা বিন্দুমাত্র কমবে না। বিভিন্ন রঙের ডুরে দেওয়া ডিভান, সোফা বা ফরাসের ওপরকার কুশন ও তাকিয়াগুলিকে ওই চাদরের রঙগুলির সঙ্গে মানানসই হতে হবে।

এবার এভাবে চেষ্টা করে দেখুন কুশনের বা তাকিয়ার ঢাকা যাই হোক না কেন, তা যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

শর্মিলা ঘোষ





মণিদীপা মুখার্জি

পৃথিবীর প্রথম ইলেক্‌ট্রনিক্স যন্ত্রটির সংগে একজন বাঙালির নাম যুক্ত আছে। সে যন্ত্রটি হল রেডিও এবং সেই কৃতী বিজ্ঞানীর নাম আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। শুনেছি মার্কিন মুলুকে সবচেয়ে নামী ইলেক্‌ট্রনিক্স বিনোদন যন্ত্রের উৎপাদক হলেন একজন বাঙালি। আমাদের দেশের মাটিতে ইলেক্‌ট্রনিক্স বিনোদনের জগতে সোনোডাইন একটি বিখ্যাত নাম। ভাবতে অবাক লাগে এই নামের পিছনেও আছেন এক বাঙালি এবং আমাদের মতই একজন মহিলা – নাম শ্রীমতী মণিদীপা মুখার্জি।

এই 'মুমূর্ষু শহর' কলকাতাতেও মেধা, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার সমন্বয়ে একজন মেয়ে যে কতটা কৃতী হতে পারেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ শ্রীমতী মুখার্জি নিজে। মাত্র ৩৫ বছর বয়েসে পা দেবার আগেই সোনোডাইন ইন্টারন্যাশনাল-এর মত অত্যাধুনিক প্রচেষ্টার উনি কর্ণধার। এই প্রতিষ্ঠানটি হল নানাবিধ ইলেক্‌ট্রনিক্স পণ্যের রপ্তানীকারক। এছাড়া শ্রীমতী মুখার্জি ব্রাইটন কম্পিউটার সেন্টারের প্রতিষ্ঠাত্রী। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হল কম্পিউটারের অতি সূক্ষ্ম ও অত্যাধুনিক পণ্য তৈরি করা। কম্পিউটারের ভাষায় যাকে বলা হয় Soft Ware। এছাড়া এখানে কম্পিউটারের ট্রেনিং দেওয়া হয়।

নিউ আলিপুরের 'জি' ব্লকে মণিদীপা থাকেন। আমার আসার কথা আগেই জানানো ছিল। বসার ঘরে সোফার উপর বসে কথাবার্তা শুরু করলাম।

আমি প্রথমেই প্রশ্ন করলাম, 'ছোটবেলা থেকেই কি আপনার বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক ছিল?'

'একদম না' – উনি বেশ জোরের সংগে বললেন। 'ছোটবেলায় কখনও ভাবিনি আমি ইলেক্‌ট্রনিক্স জগতে আসব। অঙ্কটা ভাল পারতাম তাই গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলে বিজ্ঞানের ছাত্রী ছিলাম।'

'তবে কার অনুপ্রেরণায় আপনি এই প্রফেশনে এসেছেন?'

আমার প্রশ্নের উত্তরে উনি বললেন – 'বাবা। বাবাই আমার ফ্রেন্ড, ফিলসফার অ্যান্ড গাইড। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার পর বাবা আমাকে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে বলেন। এই পরীক্ষায় আমি আই আই টি ও শিবপুর দুটোতেই সুযোগ পাই। তবে শিবপুর আমাদের বাড়ি থেকে তুলনামূলক কাছে বলে শিবপুরেই ইলেক্‌ট্রনিক্স বিভাগে ভর্তি হই। পরে হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট বের হবার পর জানা গেল আমি মেয়েদের মধ্যে তৃতীয় হয়েছি এবং সেই সুবাদে ন্যাশনাল স্কলার।'

১৯৭১-এ শিবপুর থেকে বি ই করার প্রায় সংগে সংগেই মণিদীপা সোনোডাইন-এ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে কাজ পেয়ে যান। চাকরি পেয়ে উনি পড়াশোনা বন্ধ করেননি। চাকরি করার সংগে সংগেই উনি মেটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট-এ ডিপ্লোমা করে ফেলেন। এরপর ১৯৭৩-য়ে বাবার ইচ্ছানুসারে শ্রী অশোক মুখার্জিকে বিয়ে করেন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'লাভ ম্যারেজ?'

খানিকটা হেসে বললেন – 'আমি যখন সোনোডাইনে কাজ করছি তখন অশোক ওখানকার ডিরেক্টর। কাজেই আগে থেকে চেনাশোনা ছিল। তবে লাভ ম্যারেজ বলতে ঠিক যা বোঝায় তা আমাদের ক্ষেত্রে হয়নি। বাবা ওকে খুবই পছন্দ করতেন। এবং উনিই আমাদের বিয়ে ঠিক করেন।

'বিয়ের পর প্রথম পাঁচ বছর তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি আমার জীবনে, ১৯৮২-তে সোনোডাইন ইন্টারন্যাশনাল চালু হবার পর আমি ওখানকার ডিগ্রী নিই।

'এরপর যাদবপুর থেকে ১৯৮২-তে ডিরেক্টর নিযুক্ত হই। এছাড়া বর্তমানে আমি ব্রাইটন কম্পিউটার সেন্টার স্থাপন করেছি, এখানে আমি সাধারণ লোকেদের কম্পিউটার ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছি। এখন এসবই আমার ধ্যানজ্ঞান।' কথাটা শেষ করে উনি যেন একটু গর্বের হাসি হাসলেন, খানিকটা তৃপ্তিরও।

প্রশ্ন করলাম, 'আপনার কাজে স্বামীর সম্মতি আছে?'

উনি হেসে বললেন – 'সম্মতি কী বলছেন! স্বামীর সাহায্য না পেলে আমি এতটা সফল হতে পারতাম না।

'ব্যবসা করতে গিয়ে মেয়ে হিসাবে আপনি কোনো বিশেষ সুবিধা বা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন কি?'

আমার এই প্রশ্নের উত্তরে উনি বেশ জোরের সংগে বললেন 'না। ব্যবসা করতে গেলে কিছু অসুবিধা তো হতেই পারে। কিন্তু আমি মেয়ে বলেই যে অসুবিধায় পড়লাম, ছেলে হলে পড়তাম না সেটা আমি বিশ্বাস করি না।'

প্রশ্ন করলাম, 'ব্যবসা ও সংসার দুটো কিভাবে ম্যানেজ করেন?'

মণিদীপার চোখে একটু চিন্তার ছায়া দেখতে পেলাম। বললেন, 'বড় ছেলে অনিন্দ্য এখন বড় হয়ে গেছে। তাই ওর জন্যে চিন্তা খুব একটা হয় না। কিন্তু ছোটটি ভীষণ দুরন্ত। তাই যেটুকু সময় বাড়ির বাইরে থাকি ওর জন্য সত্যিই খুব চিন্তা করি। তবে আমি তো দশটা পাঁচটা অফিসে কাজ করি না। তাই বাচ্চাদের দেখাশোনা নিজেই করতে পারি। যেমন ধরুন, ছোট ছেলে আর্ধেষ দেড়টার সময় স্কুল থেকে ফেরে। সেই সময় আমি বাড়িতেই থাকি। ওর খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে বিকেল ৩.০০ থেকে ৬.৩০ পর্যন্ত আমি বাইরে কাজে যাই। আবার সন্ধেবেলা ফিরে এসে ছেলেদের পড়াশোনা ব্যাপারটা দেখাশোনা করি। আমি মোটামুটি বাড়িতে বসেই ব্যবসার কাজ করতে পারি। তাই খুব একটা অসুবিধা হয় না।'

মায়েদের পুরোপুরি কাজ করাটা উনি একেবারেই সমর্থন করেন না। উনি স্পষ্টই বললেন – 'আর্থিক দিক থেকে প্রয়োজন না থাকলে মায়েদের সারাদিন কাজকে আমি একেবারেই সমর্থন করি না। তবে পয়সার জন্য না হলেও মানসিক তৃপ্তির জন্য অবশ্যই পার্ট টাইম কাজ করবেন। যেমন আপনি, আমি করছি।'

আমাদের কথার মাঝখানেই ওঁর একটি ফোন এল এয়ার ইন্ডিয়া থেকে। এপ্রিল-শেষে ওঁরা পৃথিবী ভ্রমণে বেরোবেন – অবশ্যই কাজের তাগিদে – তার তালিকা প্রস্তুত হয়েছে কিনা জানতে। ফোনে কাজের কথা সেরে উনি আবার ফিরে আসার পর জিজ্ঞেস করলাম, 'সংসার ও ব্যবসা ছাড়া অন্যান্য সময় আপনি কিভাবে কাটান?'

উনি বললেন – 'ইনটিরিয়র ডেকরেশন আমার হবি। আমি এবিষয়ে কোনো পড়াশোনা করিনি, তবে ঘর সাজাতে আমি বেশ কিছুটা সময় ব্যয় করি। এছাড়া ছবি দেখতে এবং ভাল ছবি কিনতে আমি ভালবাসি। আমার স্বামীও এটা ভালবাসেন। অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে কোনো ভাল প্রদর্শনী থাকলেই ওঁরা আমাকে জানিয়ে দেন। আমি ও আমার স্বামী দুজনেই সুবিধামত চলে যাই।'

সত্যিই ওঁর বসার ঘরটা দেখবার মত করেই সাজানো। ঘরে একদিকে যেমন আছে অত্যাধুনিক ইলেক্‌ট্রনিক্স যন্ত্রপাতি তেমনি দেয়াল জুড়ে টাঙানো আছে মকবুল ফিদা হুসেন ও আরও অনেকের অরিজিনাল ছবি। যা বহন করছে একটি পরিশীলিত মনের পরিচয়। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করা সুন্দর সব জিনিসও সাজানো আছে ঘরে। শ্রীমতী মুখার্জি গান শুনতে ভালবাসেন। তবে ওয়েস্টার্ন মিউজিক নয়। গজল, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গান ওঁর ভাল লাগে।

প্রশ্ন করলাম, 'অন্য মেয়েদেরও কি এই প্রফেশনে আসতে উৎসাহিত করবেন?'

'নিশ্চয়ই করব। এটা ইলেক্‌ট্রনিক্সের যুগ। এখানে উন্নতির বহু সুযোগ আছে। তবে নিজেকে এর উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট পড়াশোনার। আর ব্যবসা করতে টাকা তো লাগবেই। এখানে টাকা একটু বেশিই লাগে। কেননা ইলেক্‌ট্রনিক্স জিনিসের দাম প্রচন্ড। আর কম্পিউটারের তো কথাই নেই। কাজেই যোগ্যতা ও টাকা এই দুটো থাকলে এই প্রফেশনে উন্নতি করা খুবই সহজ।'

ঝুনু লাহিড়ী

ফটো : পাহাড়ী রায় চৌধুরী



শ্রাবন্তীর কলম

সম্প্রতি গজল নিয়ে গজালি শুরু হয়েছে ট্রামে-বাসে, রেস্টুরেণ্টে তো নিশ্চয়ই, গ্রামে-গঞ্জেও। ৫০ টাকা পর্যন্ত টিকিট দিয়ে গজলের অনুষ্ঠানে 'রাম' নাম শুনছে লোকে – ঘরে ঘরে গজল আর ভজনের এল পি ক্যাসেটের ছড়াছড়ি।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত ডিসকো ছিল ঝোলে ঝালে অম্বলে। নতুন কিছু ডিসকো ক্যাসেট/এল পি সম্প্রতি বেরিয়েছে ঠিকই তবে এখনো পর্যন্ত রাস্তাঘাটে তা শোনা যাচ্ছে না। ডিসকোর চাহিদা কি তাহলে কমল! পৃথিবীর কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু ডিসকোর জনপ্রিয়তা বেড়েইছে, কমেনি; যেমন চায়না। চায়নায় এখন ছেলেমেয়েরা ডিসকো নাচছে ভীষণভাবে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে।

ব্যক্তিগতভাবে অন্যান্য গানের মত আমি ডিসকো গান গাইতে এবং শুনতে ভালবাসি। আমার মতে সঠিকভাবে গাইতে পারলে সব গানই শুনতে ভাল লাগে এবং সব গানেরই শ্রোতা আছে। অবশ্য কথা ও সুর ভাল হওয়া চাই।

সম্প্রতি কোনো একটি পত্রিকায় যেন পড়লাম গজলেও নাকি ভেজাল ঢুকেছে। আমরা গজল বলে যা শুনছি, অনেক ক্ষেত্রেই তা নাকি 'স্রিফ কাওয়ালি'। কেউ বলছে কাওয়ালিও নয়, গীত। যাইহোক 'রাম্বা'-র হাম্বা ছেড়ে আমরা যে এত অল্প সময়ের মধ্যেই রামনামে এসে পৌঁছেছি এটা অত্যন্ত সুখের খবর। এর থেকেই বোঝা যায়, আমরা হুজুগে হলেও ধান থেকে চালটুকু বেছে নিয়ে খোসাটা ঝেড়ে ফেলে দেবার মত বুদ্ধি এবং মানসিকতা এখনো অক্ষুণ্ণ রেখেছি।

গজল, গীত, কাওয়ালি বা ভজন যাইহোক না কেন, সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে গাইতে গিয়ে যে-গান আমি শুনেছিলাম তা শুনতে ভাল লেগেছিল। যেহেতু একই সন্ধ্যায় গজল এবং ভজন একই সময়ে গাওয়া হয়েছিল। গজল গান সম্বন্ধে লোকের মনে একটু সংশয় হতেই পারে। আসলে গজল হল – উর্দু প্রেমের কবিতা, যা একটি বিশেষ চালে বা ঢঙে গাওয়া হত। এখন সে রূপটা অবশ্য একটু একটু বদলাচ্ছে। বেশ কিছু হিন্দি কথা ব্যবহার করা হচ্ছে, যাতে মানে বুঝতে অসুবিধে না হয়। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের ফলে এখন গজল একটু অন্য রকম শোনায়, কখনো কখনো মনে হয় যেন গীত। সবচেয়ে ভাবতে ভাল লাগছে যে, হিন্দি গান বলতেই এতদিন আমরা বুঝতাম ফিল্ম-এর গান। এখন কিন্তু আর তা নেই। হিন্দি বেসিক রেকর্ডও বেরোচ্ছে – যা সত্যি সুন্দর।

সেদিন ঘুম থেকে উঠে কালো চা খাচ্ছিলাম। আমায় কে যেন জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি এত কালো চা খাও কেন?' বললাম – 'শুনেছিলাম কালো চা খেলে নাকি রং ফর্সা হয়। গায়ের রংটা তো দেখছো –' কথাটা অবশ্যই সম্পূর্ণ ভুল তা না হলে আমার গায়ের রং এতদিনে মেমসাহেবদের মত ফর্সা হয়ে যেত, কারণ লিটার লিটার কালো চা আমি রোজ খাই।

যাইহোক চা খেতে খেতে ভাবছিলাম, এবার পুজোয় কী গান করা যায় – ডিসকো, গজল, রাগ প্রধান না ফোক! আমার শ্রোতারা আমার কাছে কী চায়? এমন সময় পাশের বাড়ির মাসিমা এলেন। খুব গম্ভীর মুখ। অন্যদিন আমার সঙ্গে নানারকম আলোচনা করে মা-র ঘরে যান। আজ কোনো কথা না বলেই মাসিমা পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। ডাকলাম, 'ও মাসিমা, আমরা তো আবার পাকিস্তানকে হারালাম – শারজাতে।' মাসিমা ফিরে দাঁড়ালেন। কিছু বললেন না, ফলে আমিই আবার বললাম, 'কী চুপ করে রইলেন যে?'

'রবিটা এক বলেই আউট!' বললেন মাসিমা।

'ছিঃ!' বললাম আমি, 'গাড়িটা ওর আজারউদ্দিনকে দিয়ে দেওয়া উচিত।'

'কেন?'

উত্তর দিলাম, 'যে এক বলেই আউট হয় সে আবার চ্যাম্পিয়ান কি!'

'শুনেছি ব্র্যাডম্যান বা সুনীলও তো অনেকবার জিরো করেছে' – বললেন মাসিমা।

'তারা তো আর গাড়ি পায়নি।'

মাসিমা কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'বে-থা তো আর করলি না – মায়ের মনে যে কী হয় তা বুঝবি কী করে?' বলে মাসিমা গটগট করে মায়ের ঘরে চলে গেলেন।

আসলে মাসিমা মানুষটা ভীষণ ভালো ও সাধাসিধে। মাসিমার ছোট ছেলের বয়সও রবি শাস্ত্রীর মতই।

আবার কালো চায়ে চুমুক দিলাম। পত্রিকা অফিস থেকে আমার নামে যে চিঠিগুলি এসেছে সেগুলি উল্টেপাল্টে দেখতে শুরু করলাম, যদি কেউ আমার গানের ব্যাপারে কিছু লিখে থাকে – তখনই হাতে পড়ল মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জ থেকে লেখা রমেন ভট্টের চিঠিটি।...... দেখুন আপনি যে ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন, তার সহজ উত্তর দেওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। এর কারণটা অবশ্য খুবই সহজ। নির্ভরযোগ্য এমন কোনো শিক্ষাকেন্দ্রের কথা মনে করতে পারছি না যেখানে আপনাকে বলতে পারি গিয়ে ভর্তি হয়ে যান। অভিনয় শেখানো হয় বলে অবশ্য কয়েকটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়েছে। সেখানে যোগ দিলে আপনার উপকার কতখানি হবে তা এখনি আমার পক্ষে বলা মুশকিল।

ভাল কোনো গ্রুপ থিয়েটার-এ যোগ দিয়ে দেখতে পারেন। সেটাও অবশ্য আপনাকেই বেছে নিতে হবে।

নিজে নিজে কিছুটা অনুশীলন আপনি করতে পারেন। যেমন ধরুন জোরে জোরে পড়া – এমন কারো সামনে, যার উচ্চারণ ভাল এবং যে আপনার উচ্চারণ ভুল হলে বলে দিতে পারবে। নিয়মিত অভ্যাস করলে কিছুটা নিশ্চয়ই এগোতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

কোথায় যেন পড়েছিলাম – স্যার লরেন্স অলিভিয়ার এবং চার্লস লটন অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। তখন একজন বললেন, 'দেখ যদি তোমার অভিনয় এবং থ্রো ইমপ্রুভ করতে চাও পাহাড়ের ওপরে গিয়ে নির্জনে গলা ছেড়ে শেকসপিয়র পড়।'

আমাদের দেশে পাহাড় মানেই তো হিমালয়। আর সবই তো নদী-খানা-ডোবা। তবু টিউবওয়েল বসাতে গেলে নাকি এখন থেকে ট্যাক্স দিতে হবে! শেষকালে আমাদের খাবার জলও কিনতে হবে?

শ্রাবন্তী মজুমদার

সব সময়ে, সব ঋতুতেই

গ্রীষ্মে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য একেজি স্কোয়াশ ও একেজি সিরাপ সবারই পছন্দ, কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। টাট্‌কা ফলের সহজাত পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ একেজি স্কোয়াশ, একেজি জ্যাম, একেজি জেলি, একেজি সস্ অথবা বিশুদ্ধ মশলার অপূর্ব সংমিশ্রণে একেজি আচার ও একেজি চাট্‌নি, এবং ঠাণ্ডা অথবা গরম দুধে একেজি সিরাপ সমান উপাদেয়, শক্তিদায়ক ও সবার প্রিয়। শৈশব বা বয়ঃসন্ধির বাড়ন্তকালে, পরিশ্রান্ত যৌবনে ও ভারাক্রান্ত বার্দ্ধক্যে-শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা— সব সময়ে, সব ঋতুতেই, সবার জন্য —একেজি।

একেজি মানেই স্বাস্থ্য ও পরিতৃপ্তি



AKG

– স্বাস্থ্যদায়ক ও লোভনীয়



‘নখের উপরের উজ্জ্বলতা দিল মোরে রূপ ঝলমল,
অন্তর মম খুশি-উচ্ছল সদ্যফোটা শতদল!’

রৌপ্য সংগ্রহ





ল্যাকমে নেল এনামেল

এ হল সবচেয়ে বেশী বিক্রীর নেল এনামেল —
যার সম্ভারে আছে সবচেয়ে বেশী রকমের রঙ !
পার্ল আর মেটালিক ফিনিশের সবচেয়ে
কেতাদুরস্ত হালফ্যাশানের রঙ এনেছে — সবার
আগে ! ল্যাক্‌মে-তে যদি আপনার মনের মত রঙ
না পান, জানবেন, আর কোথাও পাবেন না !

রূপ ঝলমল, অন্তর খুশি-উচ্ছল করতে ল্যাক্‌মে ! Lakmé

Rediffusion/L/2813/3a BN

প্রশ্ন : (আশালতা ঘোষ, বেলেঘাটা) —সয়াবিনের দুধ ও ছানা থেকে খাবার তৈরি করে তার বিশেষ গন্ধের জন্য আরাম করে খেতে ও খাওয়াতে পারছি না তার প্রতিকার কী করে করি, বলুন তো ? গন্ধটি দূরীভূত করার পদ্ধতি জানালে বড়ই উপকৃত হব ।

উত্তর : আপনার মতো অসুবিধেয় আমরা অনেকেই অল্পবিস্তর পড়েছি । আপনি যদি মিষ্টি খাবারই তৈরি করতে চান সয়াবিনের দুধ থেকে, তাহলে ভালো দোকান থেকে রোজ ও ভ্যানিলা নির্যাস দু শিশি কিনে রাখুন । খাবার তৈরির সময় ২/৩ ফোঁটা (যে কোন একটি) মিশিয়ে দেবেন । বেশি দেবেন না, তেতো লাগবে । এলাচ, জয়ত্রী, কেশর ব্যবহার করেছেন কি ? নিউট্রি নাগেট অবশ্যই মাংসের মতো মসলা দিয়ে রাঁধলে, গন্ধ অনেকটা কমে যায়, তবে পুরোটা যায় না । সয়াবিন স্বাস্থ্যের পক্ষে সত্যিই ভালো । মিষ্টি খাবারের জন্যে ভ্যানিলা আপনাকে অনেকটা সাহায্য করবে ।

প্রশ্ন : (বেবী রায়, চুঁচুড়া)

উত্তর : দুঃখিত বেবী, তোমার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার আগে চিঠির উত্তর দেওয়া গেল না । এই চিঠি যখন ছাপা হবে, তখন অবশ্য তোমার পরীক্ষা শেষ তাই সুকন্যা পড়তে অসুবিধা হবে না ।

চুল ওঠার সমস্যা নিয়ে অনেক প্রশ্নোত্তর হয়েছে, পড়েছ কি ? কী কারণে চুল ওঠে, তা চিঠি পড়ে যদি না বোঝা যায়, তাহলে উত্তর দিলেও কোনো কাজ হয় না । ভিটামিন বি-কমপ্লেকস্ ঠিক আছে । তুমি আপাতত তোমার সব পদ্ধতি বন্ধ রাখ । রোজ তেল না মেখে দুদিন অন্তর অলিভ অয়েল হালকা করে লাগাও । শ্যাম্পু করার দিনে ভালো করে ওই তেল মেখে দু'ঘন্টা পরে কোনো হার্বাল লিকুইড শ্যাম্পু কর । চুল শুকিয়ে গেলে সাবধানে মোটা চিরুনি চালিয়ে জট ছাড়াও—পরিষ্কার চিরুনি চাই । কোনো কারণে তোমার চুলের গোড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে যদি মনে হয়, চুলকে অকারণ ব্যতিব্যস্ত কোরো না । এছাড়া, পেটের গোলমাল আছে কিনা—পরীক্ষা করিয়ে নাও ।

প্রশ্ন : (সুজাতা দে, আদ্রা, পুরুলিয়া)—যে চিরুনির সাহায্যে কপালের সামনের চুল কোঁচকানো যায়, সে পদ্ধতিটা জানিয়ে দিন । মাঝারি চওড়া কপালে মানাবে এমন চুলবাঁধার পদ্ধতি জানিয়ে দিন ।

উত্তর : আপনি শহরের কোনো বিউটি পার্লারে একদিন গিয়ে চুল কোঁচকাবার পদ্ধতি দেখে আসুন । সেখানেই জিজ্ঞেস করুন, তাদের কাছে ওই ছোট ছোট রোলার কিনতে পাবেন কিনা ।



না পেলে কলকাতায় এসে সংগ্রহ করে নিন । সামনের চুল কয়েকটি ভাগে ভাগ করে ওই রোলার দিয়ে মুড়ে রেখে দিতে হয় । অবশ্য বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতেও চুল কুঁকড়ে নেওয়া যায় । আপনি কপালের দিকে চুল পেতে দিয়ে চুল বাঁধবেন । 'কয়েকরকম চুলবাঁধার পদ্ধতি' জানাবার জায়গা নেই ভাই । সমস্যার সমাধানের সাহায্য করতে পারি শুধু ।

প্রশ্ন : (বৈকালিক মুখার্জি, কলকাতা-৯)

উত্তর : ঠিক আছে, প্রশ্ন দিলাম না । আপনার বাচ্চা যাতে পুষ্টি পায়, এখন সেদিকেই খেয়াল রাখুন । আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হল—না । কাজেই, বাচ্চা কতদিন পর্যন্ত মায়ের দুধ খাবে—তা ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিন । আপনার চিন্তা অমূলক । দ্বিতীয় কথা—আপনার স্বাভাবিক প্রসব হয়ে থাকলে, আগেকার দিনের মতো শাড়ির চওড়া পাড় বা মসৃণ লম্বা কাপড় দিয়ে পেট বেঁধে রাখতে পারেন—খাবার পর এবং শোবার সময় ছাড়া । পেটের মেদ কমাবার উপায় আগেকার সংখ্যাগুলিতে বলেছি । নিম্নাঙ্গের মেদ কমাবার জন্য একাধিক আসন আছে—উত্থিতপদাসন, অর্ধচক্রাসন, পশ্চিমোত্থানাসন করতে পারেন । খালি হাতেরও নানা ব্যায়াম আছে—আপনি করেছেন যখন, নিশ্চয় জানেন । সন্তানজন্মের কারণে কোনো অসুবিধে থাকলে একবার ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন অবশ্যই । কখনও বেশি পেট ভরে খাবেন না, ভাতের বদলে অন্তত একবেলা রুটি, চিনি ও ফ্যাট কম খাবেন ।

প্রশ্ন : (পায়েল ব্যানার্জি, মেদিনীপুর) —আমার বয়স ১৯ বছর । আমার গাল ভীষণ বসে গেছে আর চোখের কোল বসে গেছে । কোন্ উপায়ে আমার সমস্যার সমাধান হবে ?

উত্তর : পরীক্ষার কথা লিখেছ । রাত জেগে পড়াশোনা করছ নিশ্চয় ? যাই হোক, তুমি খাওয়ার পরিমাণ বাড়াও । প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট একটু করে বাড়াতে হবে । রূপচর্চা ও ভালো পড়াশোনা একসঙ্গে বজায় রাখা খুব শক্ত । নাম বলছি না, কিন্তু দোকানে গিয়ে নিজেকে পরীক্ষার্থী বলে একটা শক্তি বর্ধক টনিক জিজ্ঞেস করে কিনে নাও ও খেতে শুরু কর । তোমার শরীরে জমার থেকে খরচ বেশি হয়ে যাচ্ছে বলেই আমার বিশ্বাস । কিছুদিন, অন্তত দুই মাস—এটুকু কর । তারপর জানিয়ো ।

প্রশ্ন : (পরমা মুখার্জি, হুগলী)—আমার সমস্যা, বৈশাখ মাসে দিদির বিবাহ-সন্ধ্যায় কেমনভাবে সাজবো । অন্তরঙ্গের মাধ্যমে জানাবেন ।

উত্তর : এটা কি সমস্যা হল ? এ তো চমৎকার ব্যাপার । তোমার বয়সের মেয়েকে একটু পরিচ্ছন্ন ও হালকা সাজেই সুন্দর দেখাবে—বিশেষত গরমকালে । তোমার বিবরণ অনুযায়ী আমার পরামর্শ জানাচ্ছি । সামান্য ব্যাককোম্ করে লম্বা বিনুনি, জুঁই ফুলের মালা জড়ানো । শাড়ির রঙ খুব গাঢ় না হয়, শাড়ির সঙ্গে মানানসই গহনা । মনে রেখো, লাল, কালো ও উজ্জ্বল হলুদ বা সবুজ ছাড়া অন্য রঙে সোনার গহনা মানায় না । অন্যান্য হালকা রঙে অল্প কিছু কস্টিউম জুয়েলারি পরলে ভালো দেখায় । ছোট ধরনের গহনা হাত, পা, আঙুল, গলা ও কানে পরতে পার । বড় ধরনের কিছু পরলে অন্য গহনা না পরাই ভালো । মুখের মেক্আপে সাবধান, গরমে ও ঘামে ফাউণ্ডেশন খুব প্রতারণা করে । হালকা ভাবে লাগাবে । চোখ, ভ্রূ এবং ঠোঁটের দিকে নজর দেবে—এই তিনের প্রসাধন জরুরি কিন্তু প্রচ্ছন্ন রাখতে পারলে চমৎকার লাগে । আমি তোমাকে ইঙ্গিত-টুকু দিলাম, সবকিছু নির্দিষ্ট করে দিলাম না । এর উপরে নির্ভর করে তোমার কল্পনা খাটাও, ভালো লাগবে ।

প্রশ্ন : (দীপান্বিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীঘাট) —আমার প্রশ্ন তিনটি ।

উত্তর : দয়া করে একটিই প্রশ্ন করবেন । (১) মাথার ত্বকের কোনো অসুখ বা অ্যালার্জি থাকলে চুল পড়বেই । ত্বক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন । বিশেষ মলম বা তেল বা শ্যাম্পুতে কাজ হয় । (২) বিউটি পার্লারে গিয়ে তার মালিক বা ট্রেনারের কাছে এ প্রশ্নের উত্তর জানতে পারবেন । (৩) সমাজ বা নারীকল্যাণমূলক সংস্থার একাধিক ঠিকানা এ পত্রিকার অন্যান্য সংখ্যায় দেওয়া হয়েছে, দেখে নেবেন । আপাতত আপনার বাড়ির কাজের লোকটিকে বা তার মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে শুরু করুন, বইখাতা শ্লেট কিনে দিন । কাজ করার ইচ্ছেটাই বড় কথা, কাজের সুযোগের কি অভাব আছে ?

রুচি রায়

সংস্কৃতি সংবাদ ও আলোচনা

উত্তরায়ণীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

উত্তরায়ণীর তৃতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে হল। তাঁদের সেদিনের অনুষ্ঠিত নৃত্যনাট্য 'কালিদাস ও মালিনী'র তিন রূপকার সমীর চক্রবর্তী, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও সাধন গুহকে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করে। তারপর দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় আসরে এলেন চার দশকের আধুনিক বাংলা গানের অনুষ্ঠান শোনাতে।

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের কন্ঠে চার দশকের বাংলা গান শোনা তাই আমাদের কাছে এক অভিজ্ঞতা। এ যেন এক অবগাহন, সেই সময়ে, যখন বাংলা গান স্বমর্যাদায় সসম্মানে বাঙালির হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। দ্বিজেনবাবু দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে আমাদের গান শোনাচ্ছেন। বয়স তাঁর স্বর্ণকন্ঠকে এতটুকু ম্লান করেনি। সেদিন তিনি শোনালেন পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের তাঁর সেই সব গান, যা একইরকম ভাবে আজও আমাদের দোলা দেয় ও নস্টালজিয়ায় ভারাক্রান্ত হই। একেবারে হাল আমলের কিছু গানও গাইলেন তিনি। কন্ঠ সেদিন সতেজ ছিল, মেজাজও ছিল ভাল। তাই অনুষ্ঠান জমে উঠল, আমাদের প্রাপ্তিও ভরে উঠল। বিশেষ ভাল লাগল, আমি কবি এই বিশ্বজনের (ভোলানাথ গুপ্ত/নচিকেতা ঘোষ); জীবননদীর দুই তীরে (অমিয় বাগচী/সুধীরলাল), ক্লান্তি নামে গো (সলিল চৌধুরী), ওগো কৃষ্ণচূড়া, (অনল চট্টোপাধ্যায়/শ্যামল মিত্র), এই ছায়া ঘেরা কালো রাতে (সুধীন দাশগুপ্ত), হাজার মনের ভীড়ে (পরাশর রায়/অভিজিৎ), তেপান্তরের মাঠ আমার (কামাক্ষ্যা ঘোষ/দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়)।

দ্বিতীয়ার্ধের অনুষ্ঠান নৃত্যনাট্য 'কালিদাস ও মালিনী'। কালিদাসের জীবন অবলম্বনে কিছুটা ইতিহাস ও অনেকটা কিংবদন্তী নিয়ে রচিত এই নৃত্যনাট্য। রচনা সমীর চক্রবর্তীর। সুরসৃষ্টি দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। নৃত্য পরিকল্পক সাধন গুহ। গানে কণ্ঠদান করেছেন আরতি মুখোপাধ্যায়, হৈমন্তী শুক্লা, ললিতা ধরচৌধুরী, সবিতাব্রত দত্ত ও দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় স্বয়ং। কিছু কিছু গান শুনতে ভাল লাগলেও সামগ্রিকভাবে তা সংবেদনশীল হতে পারে নি যা এই কাহিনীতে একান্ত প্রয়োজন ছিল। নৃত্যে মালিনী বেশী পলি গুহ আদ্যন্ত চমৎকার। কালিদাসের ভূমিকায় সাধন গুহকেও ভাল লাগে। অন্যান্যরা সাধারণ মানের।

পার্থ সেনগুপ্ত


দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়

আউট্রাম ক্লাবের 'হোলি ও বসন্তোৎসব'

আকাশে গোল চাঁদ। প্রাঙ্গণের এক কোণে সব পাতা ঝরিয়ে দিয়ে ডালপালার জাফরি নিয়ে দীর্ঘ এক গাছ সেই চাঁদের দিকে তার অসংখ্য হাত মেলে দাঁড়িয়ে আছে। আর উল্টোদিকে পাশাপাশি গায়ে-গা-দিয়ে দুটি দেবদারু পাতায়-পাতায় ধ্বনি তুলছে বাতাসের ওঠাপড়ায়। এরই মাঝখানে, দর্শকদের প্রায় সমতলে আউট্রাম ক্লাব সাজিয়েছে তার মঞ্চ। প্রসেনিয়ম মঞ্চের আপাতদূরত্ব অনেকটা সরিয়ে দর্শকদের ঘনতায় গড়ে উঠেছে আসরের আবহ। মাথার উপর খোলা আকাশ আর পূর্ণচাঁদের মায়া আপন স্বরূপেই এনে দিয়েছে অনুষ্ঠানের অন্য একটা মাত্রা।

অন্য সেই মাত্রাটা আরো পূর্ণতা পেল প্রধান অতিথি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গলায়। ভাষণকে ছুটি দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানের দুটি কলিতে তিনি খুলে দিলেন আসরের মেজাজ। 'যদি তারে নাই চিনি গো, সে কি আমায় নেবে চিনে/এই নব ফাল্গুনের দিনে জানিনে, জানিনে ॥'

আসরের মূল অনুষ্ঠান ছিল 'হোলি ও বসন্তোৎসব' গীতিনৃত্য। শ্রীশক্তিপদ বেদজ্ঞ রচিত ও পরিচালিত গীতিনৃত্যটিকে বলা হয়েছে জাতীয় সংহতির প্রতীক। বেদগান থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের গান, ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার লোকগীতি, আধুনিক বাংলা গান—হোলি ও বসন্তোৎসবকে কেন্দ্র করে সংকলিত গানের মালা গেঁথে একটি সর্বভারতীয়তা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। স্বভাবতই বৈচিত্র্য এবং বর্ণসমুজ্জ্বলতার দিকে বেশি নজর। সংগীত পরিচালক অনাথবন্ধু দাসের সঠিক মূল্যায়ন করার পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে শব্দ সম্প্রসারণ বিভাগের যথেচ্ছ আচরণে। ধাতব শব্দের সবিরত আক্রমণ কোনো বড় বিপর্যয় না ঘটালেও, মাইকের অমায়িক ব্যবহার না পেয়ে মাঝে-মাঝে ক্ষণকাল বিব্রত হয়েছেন কথা ও সুরের শিল্পীরা। ভাষ্যে শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায় এদিক থেকে অনেকখানি সামাল দিয়েছেন গ্রন্থনা অংশকে শ্রুতিমোহন করে। শান্তনুর সঙ্গে গ্রন্থনায় সহযোগিতা করেছেন শ্রীমতী কল্পনা বেদজ্ঞ।

রঙিন আলো ফেলার নির্বোধ ছেলেমানুষি সত্ত্বেও এ অনুষ্ঠানের নাচের শিল্পীরা ছিলেন আগাগোড়া প্রাণবন্ত। নৃত্য পরিকল্পক শুভাশিস ভট্টাচার্যের বিষয়মুখী কোরিওগ্রাফ শুধু নয়নাভিরামই হয়নি, হয়েছে হৃদয়গ্রাহী। কথাকলি, মণিপুরি, কথক থেকে শুরু করে লোকনৃত্যের সক্ষম মিশ্রণ প্রযোজনাটিকে যথার্থই যৌবনধন্য করেছে। শুধু উড়িষ্যার লোকনৃত্যের অংশে পুরুষটির ভাঁড়ামির প্রশ্রয় দিয়ে শুভাশিস কেন রুচিবোধকে ঝরিয়ে দিলেন, এমনকি গৌতম গুহকে গ্রন্থনার সঙ্গে বেমানান করে তুললেন, বোঝা গেল না।

সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাচে ইদানীং সজীবতার সঙ্গে লাবণ্য যুক্ত হয়েছে, দোল-দোল-দোল গানটিতে তা বেশ উজ্জ্বল। অন্যান্যদের মধ্যে শুচিস্মিতা শূর, নিবেদিতা সেনগুপ্ত, পুষ্পিতা ভট্টাচার্য ও সাধনা ঘোষের নাচে পাওয়া যায় আন্তরিকতা ও প্রতিশ্রুতি। অসমীয়া গানের সঙ্গে মধুমিতা ভট্টাচার্যের নৃত্যের স্বতঃস্ফূর্তি ও প্রকাশ নিপুণতা ভালো লাগে। একক অংশে আরতি রায়ও উল্লেখযোগ্য। ঋজু কোরিওগ্রাফিকে চমৎকার অনুসরণ করেছেন রাজু মুখোপাধ্যায়, জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, অরিন্দম গুহ এবং বিমল দাস। কেরলের বাইচ নৃত্য ছাড়াও ভাস্কর চৌধুরীর আবৃত্তির সঙ্গে মুদ্রাব্যঞ্জনায় ছিলেন প্রতীক দত্ত। সোমা দত্তর প্রকাশ ব্যঞ্জনাও বেশ আন্তরিক ছিল।

দোলের আগের সন্ধ্যায় (৬ মার্চ) ক্লাব প্রাঙ্গণে এ জাতীয় একটি অনুষ্ঠান পরিবেশন করে উদ্যোক্তারা দর্শকদের অনুভবকে যে রঞ্জিত করতে পেরেছেন—এতেই প্রযোজনাটির সার্থকতা।

সুনীল দাশ

ফটো : সুনীল চট্টোপাধ্যায়



দলবদলের নেপথ্যে (২)

এ বছরের চমক বিশ্বজিৎ ?

সেদিন ভোরের আলো ঠিকমত ফোটেনি। রাস্তায় মানুষজনও তেমন নেই। কেবল লরিগুলি মাঝে-মধ্যে শোঁ শোঁ করে ছুটে চলেছে। তখনও হেডলাইট জ্বলছে। এই ভোররাতে একটি প্রাইভেট কার বি টি রোড ধরে ছুটে চলেছে উত্তরমুখো। ভেতরে দুজন বসে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে চলেছেন। উত্তরমুখো থেকে আর একটি প্রাইভেট কারের মুখোমুখি হতেই আঁতকে উঠে গাড়িটাকে জোরে ব্রেক কষেন। না, কোনো দুর্ঘটনা এড়াতে নয়। অপর গাড়িটির মধ্যে যাত্রাদলের এক মালিককে দেখেই ব্রেককষা গাড়িতে বসা মালিকটি ভূত দেখার মত চমকে উঠে গাড়িটি থামিয়ে দেন। এই সাতসকালে উত্তরমুখো থেকে গাড়িটিকে আসতে দেখে থেমে-থাকা গাড়িটির মালিকের উদ্বেগ আরো বেড়ে যায়। যে উদ্দেশ্যে ওদের উত্তরমুখো যাওয়া, সেই কাজটি সমাধা করে ওই যাত্রাদলের মালিকটি চলে এল না তো! এত সতর্কতা সত্ত্বেও তীরে এসে তরী ডুবে যাবে! কভি নেহি। গাড়িটিকে হাওয়ার মত ছুটিয়ে নিয়ে চললেন গন্তব্যস্থলের দিকে। ফিরেও এলেন কিন্তু কিছুটা নিরাশ হয়েই।

যাঁকে ঘিরে মালিকদের সাতসকালে দৌড়ের প্রতিযোগিতা লেগে যায়, যাঁকে দলে পাবার জন্য অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, সেই শিল্পীটিকে যখন সুকন্যার তরফ থেকে এই প্রতিবেদক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন – আগামী মরশুমে কোন দলে যাচ্ছেন? উত্তরে তিনি মৃদু হেসে বললেন – ওয়েট অ্যান্ড সী। চলতি বছরে যে যাত্রাদলের নায়িকার ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করে এই শিল্পীটি আরো মূল্যবান হয়েছেন, সেই জনতা অপেরার মালিক শ্যামল চক্রবর্তীর মধ্যে এই শিল্পীকে নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা নেই। বরঞ্চ নিশ্চিন্ত, এই শিল্পীর দলে থাকার ব্যাপারে। শ্যামলবাবু বললেন, ওঁকে ছেড়ে লক্ষ্মীছাড়া হব নাকি! দলের লক্ষ্মীকে রাখতেই তো আগামী মরশুমের জন্য পালা নির্বাচন করেছি 'লক্ষ্মীর পদচিহ্ন'।

সত্যিই, বেলা সরকার এখন যাত্রা জগতের শিরোনাম। বছর কয়েক আগে যাত্রা জগতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্থানটি পাকা করে নেন। নটুতে প্রথম বছরেই দারুণ সাফল্য, সেই সঙ্গে ওঁর নিজের গলার গানগুলোর জনপ্রিয়তা যাত্রায় প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। বেলা তো এখন খ্যাতির তুঙ্গে অবস্থান করছেন। আর এই স্থানে উনি খুব অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছে গেছেন। এই অসাধারণ গুণান্বিত শিল্পীকে দলে পেতে যাত্রা মালিকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়া স্বাভাবিক। তাই আগামী মরশুমের জন্য বেলাই এখন টপ টার্গেট।

শেষ সংবাদ, বেলা সরকার এবারও জনতাতেই থাকছেন। বেলা ছাড়া যেমন দেবগোপালকে ভাবা যায় না, তেমনি দেবগোপাল ছাড়া বেলাকে কল্পনা করা মুশকিল। তাই এবারের শ্রেষ্ঠ পালার শ্রেষ্ঠ জুটি বেলা-দেবগোপাল জনতাতেই থাকছেন আগামী মরশুমের জন্য।

বিশ্বজিৎ কি যাত্রায় অভিনয় করবেন? যাত্রা জগতে এখন এই গুঞ্জনই বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। পার্ক স্ট্রিটে যাত্রাপাড়ার একটি গাড়িকে কয়েকদিন ধরে ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। সেদিন এই গাড়িটি আচমকা এই প্রতিবেদকের সামনে পড়ে যায়। যে বাড়িটির সামনে গাড়িটি এসে দাঁড়াল সেখানে বিখ্যাত নায়ক এবং গায়ক বিশ্বজিৎ কলকাতায় এসে গত বছরও উঠেছিলেন। চিৎপুরের বাতাসে যা রটেছে সেটা কি তবে সত্যি? বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ির মালিক এবং সঙ্গীরা গাড়িটির সামনে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অসন্তুষ্ট হলেও মুখে যথাসম্ভব হাসি ফুটিয়ে বললেন, কোনো কিছুই গোপন করতে দেবেন না দেখছি! আগামী মরশুমের যাত্রা জগতকে চমকে দেব ভেবেছিলাম, সে সুযোগও 'সুকন্যা' দিল না। ঠিক গোয়েন্দা ফিট করে দিয়েছে। যখন জেনেছেন তখন ব্যাপারটা একটু গোপন রাখবেন। মনে হয় বম্বে থেকে ফিরে কনফার্ম নিউজ দিতে পারবো।

চলতি মরশুমে যাত্রায় এসে যিনি সাড়া জাগিয়েছেন গ্রামে-গঞ্জে, সেই প্রথিতযশা অভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবী দল পালটাচ্ছেন না। বরং আগামী মরশুমে সেরা অভিনয়, সেরা পালা উপহার দেবার চ্যালেঞ্জ নিয়ে অপ্সরা অপেরাকে আরো সুসংবদ্ধ করে গড়তে বেশ কিছু সম্ভাবনাময় শিল্পীকে দলে টানছেন। বিশ্বজয়ী অপেরার রুমা দাশগুপ্ত আগামী মরশুমে অপ্সরা অপেরাতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

চলতি মরশুম তরুণ-রুমা জুটির কাছে খুবই দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে কেটেছে। এ মরশুমে দীর্ঘদিন বসে থাকার পর তরুণকুমার নট্ট কোম্পানিতে ফিরে যাওয়ায় মনঃস্থির করেছেন।

চলতি মরশুমে দলবদলের সময় যাত্রাপাড়ার রামকৃষ্ণ, নট্ট কোম্পানির কর্ণধার মাখনবাবুকে দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটাতে হলেও এবার কিন্তু উনি নিশ্চিন্ত। দলবদলের হাওয়ায় নিজের দলের কোনো শিল্পীরই অন্য দলে যাবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তাই নিশ্চিন্ত মাখনবাবু আগামী বছরে দলের সুনামকে বজায় রাখতে পালাকে কী করে আরো আকর্ষণীয় করা যায় সেই নিয়েই এখন ব্যস্ত।

রোমান্টিক নায়ক ইন্দ্র লাহিড়ী কি এবার দল পালটাচ্ছেন? দলবদলের সময় আসলেই এই শিল্পীটিকে নিয়ে বারবারই টানাটানি পড়ে যায়। এবার কি তার ব্যতিক্রম ঘটতে পারে? শেষ খবর ইন্দ্রর জনপ্রিয়তাই এবারে দল পরিবর্তন করতে বাধ্য করেছে। ইতিমধ্যে ইন্দ্র ভারতীর হাতছাড়া হয়ে তারা মা অপেরার দখলে চলে গেছেন।



রুমা দাশগুপ্ত

ইন্দ্র-ছন্দা জুটি গতবারই ভেঙে যায়। ছন্দা এবার গন্ধর্ব অপেরাতেই থাকা মনঃস্থির করেছেন।

ইন্দ্র তারা মা অপেরাতে আসায় চলচ্চিত্র এবং নাট্য জগতের বলিষ্ঠ অভিনেতা উজ্জ্বল সেনগুপ্ত ঘর পালটে আগামী মরশুমে মোহন অপেরাতে যোগ দিচ্ছেন।

স্বিজু ভাওয়ালের কাছ থেকে পাকা কথা পাবার পর সত্যনারায়ণ অপেরার দল-মালিক দলকে ঢেলে সাজাতে শুরু করে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে উনি একাজে অনেকটা এগিয়েও গিয়েছেন। অতএব স্বিজুর আগামী বছর মোহনে থাকার প্রশ্নই আসে না।

যাত্রার দুই দক্ষ অভিনেতা বিমলেন্দু ভট্টাচার্য এবং অনাদি চক্রবর্তীকে আগামী বছর নতুন দলে অভিনয় করতে দেখা যাবে। বিমলেন্দু ভাণ্ডারী ছেড়ে যাচ্ছেন কোহিনূর অপেরা, অনাদি যাত্রালোক থেকে ভারতী অপেরায়।

দলে অন্যতম অভিনেত্রী হিসাবে প্রবেশ এবং অল্প সময়ের মধ্যে নায়িকার স্থান দখল করার গোপন চাবিকাঠি যাঁদের অভিনয় দক্ষতা, সেই লতা দেশাই এবং মহুয়া চ্যাটার্জিকে পেতে এবারও দল মালিকদের আগ্রহের খামতি ছিল না। শেষ পর্যন্ত লতাকে গণবাণী থেকে ভাণ্ডারী অপেরা এবং মহুয়াকে নবরঞ্জন থেকে গণবাণী নিজেদের দখলে নিয়ে নিয়েছেন।

অঞ্জনা ব্যানার্জি (মৃন্ময়ী অপেরা), জয়শ্রী মুখার্জি (নাগ কোং থেকে সত্যনারায়ণ), মিনতি দাস (ভাণ্ডারী থেকে লোকরঞ্জন) এবং কাবেরী বিশ্বাস (লোকনাট্য থেকে ভোলানাথে) দল পরিবর্তন করলেও যাত্রার-বিস্ময় জ্যোৎস্না দত্ত এবং বীণা দাশগুপ্ত এবারো পুরনো দলেই থেকে যাচ্ছেন। এঁদের পেতে কয়েকটি দল যে চেষ্টা চালিয়েছিলেন, এঁদের সিদ্ধান্ত মাঝপথেই তা ভণ্ডুল করে দেয়। অতএব দীর্ঘদিনের অবিচ্ছিন্ন জুটির অন্যতম গুরুদাস ধাড়াও এবার চন্দ্রলোকেই থেকে যাচ্ছেন।



বেলা সরকার

শ্যামল সেনের মত দলে প্রমোশন পেতে চলেছেন তপন গাঙ্গুলী (যাত্রালোক), গোপাল হালদার (ভাণ্ডারী) এবং কুমার ইন্দ্রনীল (রানার)।

গোরাবাবু আর্যর নায়িকার ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকলেও এই প্রতিবেদন লেখার সময় পাক্কা খবর, লক্ষ্মী হালদারই আগামী মরশুমে এই দলের নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

ভোলানাথ অপেরার প্রাণপুরুষটি চলে যাবার পর শক্ত হাতে হাল ধরে যিনি দলটিকে টিকিয়েই রাখেননি, দলের সুনাম আরো বাড়িয়েছেন – সেই প্রাণবন্ত যুবক তথা নায়ক অশোক সিংহ এবারও দলের ঐতিহ্য বজায় রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। স্টারহীন দল করে টিম ওয়ার্কের উপর জোর দিয়ে হৃদয়কাড়া পালা নিয়ে আসর মাত করতে প্রস্তুতি চালিয়েছেন উনি।

শেষ খবর, আর্য অপেরায় আগামী মরশুমে নটসম্রাট স্বপনকুমারের জায়গায় মঞ্চ ও চলচ্চিত্র জগতের প্রখ্যাত অভিনেতা এবং নির্দেশক দিলীপ রায়কে অভিনয় করতে দেখা যাবে। নাছোড়বান্দা গোরাবাবুকে দিলীপবাবু পাকা কথা দিয়েছেন।

দীপক মজুমদার

ফটো : রবি দাস

খ্যাতির আড়ালে জ্যোৎস্না দত্ত

জ্যোৎস্না দত্ত যাত্রাপালায় অভিনয় করছেন তাঁর শৈশব থেকে। আধুনিক যাত্রা জগতে তাঁকেই প্রথম মহিলা নায়িকা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আজ পরিণত বয়সে পৌঁছেও তিনি অভিনয়ে ক্লান্তিহীন। সম্মান পেয়েছেন 'যাত্রা সম্রাজ্ঞী'। এই সাক্ষাৎকারে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা ও উত্তরণের কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে।



"তোমারি নামেতে বাঁধিয়াছি সুর আমার বীণার তারে/ .... কি দিয়ে বাঁধিব তোমারে–/ ..../ এ যে শাঁখের করাত, আসিতে যাইতে কাটে বারে বারে।"

গান শেষ হল। চতুর্দিকে যেন হাজার হাজার পায়রা উড়তে শুরু করল। হাততালি .... হাততালি শেষ আর হয় না। বজবজের কোনো একটি বিশিষ্ট বাড়িতে গানের আসর। লক্ষ্মীপুজোয় এঁরা গান বসান। এবারের পালা 'সোনাই দীঘি'। আসরে এবার অভিনেতা প্রবেশ করছেন – কিন্তু সকলে চাইছে আরও কিছুক্ষণ গান চলুক। অনুচ্চারিত এনকোর। কে এই গায়িকা? আমাদের পাঠিকা যারা যাত্রা দেখেন তারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে পালার নামেই চিনে ফেলেছেন; আর যারা দেখেন না তাদের সঙ্গে পরিচয় করাই – ইনি জ্যোৎস্না – যাত্রাসম্রাজ্ঞী জ্যোৎস্না দত্ত।

কথা হচ্ছিল এক সকালে, জ্যোৎস্না দেবীর বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে বসে। পরিচ্ছন্ন দুটি কামরা বিশিষ্ট ফ্ল্যাট।

মাটিতে কার্পেটের ওপর বসেছিলাম আমরা। জ্যোৎস্না দেবীর পরনে ছিল সাদা জমিতে হালকা নীল ফুলছাপা শাড়ি, চুল আলগা করে খোঁপা জড়ানো, ডান হাতে একটি সোনার বালা। আগের রাতে যাত্রা থেকে ফিরেছেন একটু রাত করে, চোখ সামান্য ফোলা। তিনি বললেন, "তখন একটা সোনাই-সোনাই হাওয়া উঠেছিল জানো – বই হিট্ তো অনেকই করে, তবে এমন সোনাই শাড়ি, সোনাই ব্লাউজ, সোনাই সাইকেল রিকশা, সোনাই নামে গাঁয়ে মনোহারি দোকান, মাঝির ছেলে নদীতে জাল ফেলছে সোনাই বলে – সে এক্কেবারে হই-হই কান্ড!"

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তাঁকে জানালামঃ আমি ছোটবেলায় কোনো এক বিদেশী ফার্মে রিক্রিয়েশন ক্লাবে এই যাত্রাটি দেখতে যাই। সেখানে অভিনয় করছিলেন কোনো এক খ্যাতনাম্নী 'অ্যামেচার কুইন'। আপনার ওই গানটি তিনিও বেশ ভালভাবেই গেয়েছিলেন। দর্শকের সঙ্গে আমিও খুব উচ্ছ্বসিত, কিন্তু পাশের চেয়ারের এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক উক্তি করেছিলেন, 'এ আর কি – জ্যোৎস্না দত্তকে তো দেখনি, সে জিনিস আলাদা।'

হেসে উঠলেন জ্যোৎস্না দেবী। পরিপাটি দাঁতের সারি, ঠোঁটে পানের ছোপে ঈষৎ কালচে দাগ। বললেন, "সেরকম অনেক টুকটাক আছে, বলতে গেলে তো মহাভারত হয়ে যাবে গো – বরং তুমি যা জান বল, আমি শুনি।"

এইবার আমি গুছিয়ে বসলাম।

"বলুন তো দিদি, ঠিক কিভাবে আপনি যাত্রায় এলেন, আর কেনই বা এলেন?"

"আর কেন? তখন তো দু'দেশে খুব গোলমাল – লক্ষ লক্ষ পরিবারের মত আমরাও সেই গন্ডগোলের শিকার হলাম। আমার বাবা সুরেন্দ্রচন্দ্র দত্তের পেশা ছিল ওকালতি। ভালই ছিল সংসারের অবস্থা। অথচ সব ছেড়েছুড়ে আমরা এসে পড়লাম কলকাতায়। ওদেশে থাকতে আমাদের একটা লাইব্রেরির ফাংশন হত। সেখানে ছোট্ট মেয়ে হিসেবে আমাকে নাচগান করতে নিয়ে যাওয়া হত। আমার নাচ নাকি সকলের খুব ভাল লাগত। সেটাই শুরু। ওখানে গান শেখাতেন যোগেশচন্দ্র নট্ট, উনি ভাল হারমোনিয়াম বাজাতেন, আবার বিবেকও সাজতেন। ওঁর শ্যালক রামকৃষ্ণবাবু ক্ল্যারিওনেট বাজাতেন। ওনাদের হাতেই আমার এই পেশায় হাতেখড়ি। কলকাতায় যখন এসে পড়লাম তখন পরিবারে আমরা পাঁচজন, বাবা এসেছিলেন আরও পরে। সঙ্গে তো কিছু আনিনি যে তা ভেঙে খাব – চিন্তা কর, আমার গায়ে একটি ফ্রক, মার পরনে একটি শাড়ি। দিন চালানো খুব কঠিন হয়ে উঠল। তখন ওই যোগেশবাবু আর রামকৃষ্ণবাবু মাকে বললেন, 'আমরা অ্যামেচারে বাজাব, ওকে আমাদের সঙ্গে দিন।' তখন তো রোজ শো হত না – যেদিন যেমন পেতাম, পাঁচ টাকা-ছ' টাকা রোজ, তাতেই চলত – তবে তখন আমি নাচিয়ে ছিলাম – অভিনেত্রী হইনি।"

"তার মানে সংসারের মুখ চেয়েই আপনি যাত্রায় আসেন। তা, নাচিয়ে থেকে অভিনেত্রী হলেন কেমন করে?"

সেও আরেক ইতিহাস। তখন আমরা যাদবপুরে উঠে গেছি। বরিশালের প্রফুল্ল দাস বলে একজনের হাফ-অ্যামেচার দল ছিল। সেখানে কিছুদিন কাজ করার পর রামবাবু আমাকে নিয়ে গেলেন বিপিনবিহারী জ্যোতিঃশাস্ত্রীর কাছে। মেজাজী মানুষ। এঁর নবগ্রহের মন্দির ছিল, আর ছিল যাত্রার নেশা। দলের নাম 'ভুটুয়াচন্ডী অপেরা'। দলে ইনি কখনো একসঙ্গে সবাইকে ছুটি দিতেন না। অর্ধেক লোককে ছুটি দিতেন – অর্ধেক সম্প্রদায় রোজ রিহার্সাল বসাত। আবার ওঁরা যখন বাড়ি থেকে ফিরতেন, তখন অন্যদের ছুটি মিলত। এছাড়া আরও একটা ব্যাপার ছিল। যে সিন 'ক্ল্যাপ' পেত বা যে গানে 'এনকোর' হত, সেই সিনটি ওনার সামনে গানের শেষে করে দেখাতে হত। সে সব এখন কোথায়! এই দলেই আমার তিন বছর কেটেছে।"

"সত্যিই বড় সুন্দর এইসব স্মৃতি – আরও সুন্দর আপনার এই স্বচ্ছন্দ বলার চালটি।"

উনি হাসলেন চোখে বুদ্ধির ঝিলিক দিয়ে –

"দাঁড়াও বাপু, এখনও তো অভিনেত্রী হওয়াটা শুনলে না! তখন গানে (অর্থাৎ যাত্রায়) পৌষের একটা ছুটি হত, যারা পার্ট করত সকলেরই তো দেশে চাষবাস ছিল, তারা ধান-টান তুলে আবার 'গানে জয়েন' করত সরস্বতী পুজোয়। আমরা কচি-কাঁচারা সব এসে পড়েছি। আমি অবশ্য তখন আর ব্যালে ট্রুপে নেই – 'একানে'র (ছোট বাচ্চা) রোলেও নামছি। 'ভোলানাথ অপেরা'য় এক বছর কাজ করে আমি এসেছি 'সত্যম্বর অপেরা'য়। ব্যালে ট্রুপে আমরা ছিলুম আঠার-উনিশ জন। জলপানি পেতুম দু আনা-তিন আনা করে। সকলেই ছেলে, আমি একাই কেবল মেয়ে। মেয়ের পার্টে তখন তো ছেলেরাই সাজত, তাই দলে আমার কোনো আলাদা ব্যবস্থাও ছিল না – উল্টে বড়রা সকলে আমায় 'বাবা' বলে কথা বলত। তা ছোটরা সকলে মিলে জলপানির পয়সায় সরস্বতী পুজো করব ঠিক হল। কতই বা চাঁদা উঠবে, তাই ঠিক ছিল ঘটে পুজো করব। পুকুরে গেছি কাদামাটি আনতে – তখন আমাকে দলপতি ডেকে পাঠালেন। কাছে যেতেই বললেন, 'নন্দবাবু তো এখনও এসে পৌঁছয়নি – তা বাবা জোচ্ছোনা, কালকে ওনার পার্টটা পড়ে তুমি সেজে দাও। তোমাদের পুজোয় যা লাগে আমি চাঁদা দেব, ভাল করে পুজো কোরো।' আমার তো খুব বুক ধুকধুক করছে আনন্দে, আবার একটু অভিমানও হচ্ছে যে আমাকে এতদিনে কেন পার্ট দেওয়া হয়নি। আমার একটু অভ্যেসও ছিল, যে পার্ট মনের মত লাগত – সেটাই বিড়বিড় করে মুখস্থ করতুম। মানে যাত্রাটা আমি রোজই দেখতুম – সেটা উনি হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন। যা হোক আমি তড়িঘড়ি অন্য ছেলেদের গিয়ে বললুম, 'তোরা পুজোর বন্দোবস্ত কর, আমাকে কাল 'পার্ট সাজতে' হবে।' সকলে খুব খুশি হয়ে বলল, 'ঠিক আছে আজ তুই সারাদিন পার্ট মুখস্থ কর – আমরাই সব করছি।' ছেলেদের মধ্যে যে আবার একটু বড়, তার ছিল হিরোইনের ভাইয়ের রোল। সে বলল, 'ভাবিস না, আমি তোর পাশে-পাশেই থাকব, সামলে নেব।' আমার তো দারুণ টেনশান। একে শিয়ারশোল রাজবাড়িতে আসর – তায় ফিমেল রোলে ছিলেন জাঁদরেল অভিনেতা নন্দদুলাল অধিকারী।"

"কি বই ছিল?"

"বই 'বন্দীর ছেলে' – পার্ট সাজলুম 'শেফালী' – কাঁপা কাঁপা বুকে গুরুর চরণ স্মরণ করে নেমে পড়লুম আসরে, যা থাকে কপালে! আর সেইদিনই মেডেল পেলুম। আমার বয়স তখন তেরো-চোদ্দ।"

"আপনার গুরু বলতে তখন ঠিক কে কে?"

"আগে তো নাচতুম। নাচের গুরু হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়। গান শিখেছি মহেন্দ্র দত্ত মশাইয়ের কাছ থেকে। তখন তো দলে বাঁধা মাস্টার থাকত। এখনকার মত একটা পালার জন্য পালাকার, ডিরেক্টর নিয়ে আসা হত না। তাঁরাই হতেন আমাদের সর্বপ্রকারের শিক্ষক। আমরা দলেই থাকতুম, তাই ওঠাবসা চলাফেরা সবটাই হত তাঁদের চোখের সামনে। আমাদের অভিনীত চরিত্রগুলোকে সঠিক রূপ দেবার জন্য তাঁরা নাইতে-খেতে আমাদের শিক্ষা দিতেন, একটু একটু করে গড়ে তুলতেন। তাই আমাদের যাত্রার



'শচীমাতা গো' পালার নামভূমিকায় জ্যোৎস্না দত্ত

সেইসব দিনের সংসারে আমাদের শিরার রক্তগুলো কবে যে নাচ গান আর অভিনয় হয়ে যেত, বুঝতেই পারতুম না।"

কথার ফাঁকে একটু পান মুখে দিলেন জ্যোৎস্না দেবী। ইত্যবসরে ঘরে ঢুকে পড়লেন অন্য কোনো দলের এক অল্পবয়সী অভিনেত্রী। জ্যোৎস্না দেবীকে প্রণাম করে তিনি তাঁর দলের কিছু অসুবিধা এবং গোলযোগের কথা জানালেন। জ্যোৎস্না দেবী মন দিয়ে তার অভিযোগগুলি শুনলেন। বোঝা গেল এরকম ছোটবড় অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীরই যাতায়াত আছে এই দিদির কাছে; কারণ বহুদিনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ জ্যোৎস্না দেবী এখন একটি চলন্ত ইনস্টিটিউশন।

মেয়েটির কথার শেষে জ্যোৎস্না দেবী বেশ রেগে উঠলেন। বললেন, "ওই তো তোমাদের দোষ – তোমরা আজকাল সবাই ছুটছ হিরোইন হবার জন্যে, কেন-না মাইনে দু-পয়সা বেশি পাবে। কিন্তু অভিনয়ের মানটা যে তোমাদের কত নিচু তা দেখ না। কিছু বোকা লোক ব্যাঙের ছাতার মত দল করছে – অক্ষম আর্টিস্টদের বেশি পয়সার লোভ দেখিয়ে দল ভেঙে আনছে – এদিকে ব্যবসা কমে যাচ্ছে, পালার বদনাম হচ্ছে। আরে বাবা, বেশি মাইনে দু'মাস পাবার চেয়ে মোটামুটি সঠিক মাইনে সাত মাস পাওয়া ভাল নয় কি?" এবার আমার দিকে তাকালেন। আমি সন্তর্পণে একজন খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রীর একান্ত ব্যক্তিগত রাগী অভিব্যক্তিগুলো যখন চুরি করে দেখে নিচ্ছিলাম, সেই সময় ঘরে প্রবেশ করলেন এক ভদ্রলোক। শোনা গেল জ্যোৎস্না দেবীর গাড়িটি নিয়ে কোনো এক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন জ্যোৎস্না দেবী, তারপর বললেন, "দেখ, কথা যখন দিয়েছি তখন যত অসুবিধেই হোক কথা রাখবই। তুমি অমুককে ডাকো আর বলো......." বলে চট্ করে এমন এক সহজ সমাধান করে দিলেন, আমি তো হতবাক। বুঝলাম শুধু বড় অভিনেত্রীই নন, যাত্রাপাড়ায় ওনার বুদ্ধি সম্পর্কে যে শব্দটি চালু আছে (লেডি ঔরঙ্গজেব) তা একবর্ণও অতিরঞ্জিত নয়।

এর পরের প্রশ্নটি এবার রাখলাম, "আচ্ছা আপনি তো টপ পজিশনের আর্টিস্ট। সেইহেতু বেশ কিছু সুবিধা ভোগ করেন – যেমন আলাদা গাড়ি পান বা সঙ্গে থাকে সবসময়ের জন্য একটি কাজের লোক। কিন্তু যে কোনো সুবিধা ভোগের আড়ালেই থাকে দারুণ কর্তব্যের বোঝা। আপনার সেই কর্তব্যের চেহারাটা কেমন?"

"উঃ দায়িত্ব, দায়িত্ব – সে যে কী ভীষণ! এই যে এখনই ওকে বকলাম না? ভাব, শুধু নিজের অভিনয়টুকু করলেই তো চলবে না – আমার পাশাপাশি কো-আর্টিস্টদের অভিনয় যদি ঠিক না থাকে, পালা যদি টানটান না হয়, গানের সুর যদি লাগতাই না হয়, তবে তো দল চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশটা পরিবারের ভাত বন্ধ আর টপেরও দুর্নাম। তাই তবলচি থেকে শুরু করে পোশাক মেকআপ সব কিছুর দিকে আমাকে চোখ রাখতে হয়। আসরে বই নামার আগে কয়েক রাত ঘুম প্রায় হয় না। আগে অল্পস্বল্প দেখিয়ে দিতুম, তবে নাম দিতে দিইনি। 'বৈজু বাওরা' থেকে আমি পুরোপুরি নির্দেশিকা হয়েছি।"

"আপনাকে যে বেশ খাটতে হয় তা বুঝতে পারছি। একটানা সবচেয়ে বেশি কতক্ষণ কাজ করেছেন?"

"এই তো গত সপ্তাহে ষোলো ঘন্টা জার্নি করে যাত্রা করলাম। তারপর আবার জার্নি। আটচল্লিশ ঘন্টাও জেগেছি কখনো কখনো। 'কলাগাছিয়া' (মেদিনীপুর) থেকে গেছি 'আম্বা' (সাঁওতাল পরগনা)। রাস্তাটার দুরত্বটা ভাবো!"

"অভিনয় করতে তো খুবই ভালবাসেন, এটা এখন আপনার নেশার মতই। ভালবাসার কাজকে পেশা হিসেবে পেয়েছেন বলে বোধ করি আপনার ক্লান্তি সহজে আসে না – তাই না?"

"কেমন হয় জান, যখন একটা পার্টে টাটকা গন্ধ থাকে, তখন কিছুদিন বেশ লাগে। তারপরেই ক্রমশ একঘেয়েমিতে পেয়ে বসে। আমি তো অনেকদিন ধরেই যাত্রা করছি, মাঝে মাঝে এমন ঘটনা ঘটে মনে হয় আর পারছি না – ঠিক সেদিনই হয়ত এমন আসরে গেলুম যেখানে দর্শক এত ভাল যে, হুড়হুড় করে ভেতর থেকে অভিনয় বেরিয়ে এল। আবার খুব মুড নিয়ে গিয়ে

দেখলাম জল ঢালা আসর – ব্যস্ মেজাজ মাটি!"

"আপনি মোট কতগুলো পালায় সেজেছেন?"

"তা ধরো একশ পঁচিশ-ছাব্বিশ। আগে তো একেকটা দলে এক-এক বছরে অনেকগুলো করে বই থাকত। যে বছর প্রথম হিরোইন সাজলুম – সে বছরই তো তিনটে বই। 'পাষাণের মেয়ে'-তে গৌরী, 'মহম্মদ তুঘলক'-এ সিরিণা, আর 'বন্দী'র ছেলে। আমার যশ হবার জন্য নন্দদুলালবাবু আর হিরোইন করেননি – 'মাদার'এর রোলে চলে গিয়েছিলেন।"

"আচ্ছা পরের বছরের বইতে আপনাকে কি ধরনের পার্ট দেওয়া হয়?"

"পরের সিজন-এ আমার জন্যই মূলত 'ছিন্নশির'-এ কাঁকনবাঈ লেখানো হয়েছিল।"

শুরুতেই যে গানের কথা আপনাদের বলেছিলাম, এতক্ষণে সেই প্রসঙ্গে এলাম। "যাত্রায় আপনার গান তো প্রায় কিংবদন্তীর পর্যায়ে পড়ে। আপনি আছেন অথচ গান নেই – এমনটা বোধ হয় কখনও ঘটেনি। আপনার গাওয়া 'এ মাটি আমার মাটি' পালায় 'ছমছম ছমছম, তোর কাচের চুড়ির ছটায়' গানটি এমন অনায়াস দক্ষতায় ধরতেন, আমার জ্ঞানে এর সঙ্গে তুলনা চলে একমাত্র জুলি এনড্রুজের গাওয়া 'মেরী পপিন্সের' সেই 'মেরিসিন গো ডাউন' গানটির। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী?"

"এই তো গত বছরেই ধর না, 'জাহানারা'-তে গান আসে না – তবুও দর্শকের কথা ভেবেই জোর করে গান রাখতে হল। এ বছরে 'শচীমাতা'-তেও তাই। শুধু আমার অভিনয় হলেই তো হবে না – মালিকরা দর্শকের কথাও ভাবেন, আর ব্যবসায়িক দিক তো আছেই।"

"'জাহানারা'-র গানটি আমার স্মরণে আছে। 'সজনী সজনী কাটে না রজনী' – ওই একটি গানেই আপনি পালাটির চেহারা বদলে দিয়েছিলেন। গান এবং অভিনয় প্রসঙ্গে একটি স্মরণীয় ঘটনা বলুন না –"

"এই তো 'শচীমাতা' করতে গেছি দমদমে। বই শেষ হতে এক মহিলা দেখা করতে এলেন। বিনয়ে জানালেন, তাঁর স্বামী বাইরে অপেক্ষা করছেন, আমি যদি বাইরে আসি! তা এলাম বাইরে। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক হুমড়ি খেয়ে পায়ে পড়লেন। উনি নাকি আমার মধ্যে 'শচীমাতা'কে প্রত্যক্ষ করেছেন। আমি প্রথমে একটু থতমত খেয়ে গেছি, তবে এজাতীয় ঘটনা ইতিপূর্বে এত ঘটেছে যে, এখন গা-সওয়া হয়ে গেছে। আমার গাওয়া 'সোনাই দীঘি'-তে 'জনম গেল কাঁদিতে' গানটা লোকের মুখে মুখে এত ফিরত যে, আমি আসরে গান ধরার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়ে যেত।"

"আপনি তো অনেকের সঙ্গেই কাজ করেছেন, একসঙ্গে কাজ করতে করতে ইমোশনাল অ্যাটাচ্‌মেন্ট কারো সঙ্গে হয়েছে কি?"

"আগে তো দল এক জায়গায় অনেকদিন করে থাকত। সেখানে দলের পাঁচ-সাতটা বই করে আবার অন্য গাঁয়ে যেতাম। তখন স্বভাবতই হৃদ্যতা গড়ে উঠত অনেক বেশি। এক-একটা বিছানা ধরতে পারো এক-একটা বাড়ি। তখন রান্না করে এ-ঘর ও-ঘরকে নেমতন্ন করছে – এ ওকে মুড়ি খাওয়াচ্ছে এ সব ছিল। এখন তো সব ভোঁ করে গাড়ি চেপে স্পট থেকে যে যার বাড়ি ফিরে আসছে। তবুও বলব – একসঙ্গে কাজ করে যাঁরা আজও আমার বন্ধুপ্রতিম, তার মধ্যে আছেন পান্না চক্রবর্তী, স্বপনকুমার। যাত্রা-জুটি ব্যাপারটার শুরু হয় সেই থেকেই। স্বপনকুমার – জ্যোৎস্না দত্ত বা 'সোনাই দীঘি'-তে তপনবাবু মানে তপনকুমার, আর ইদানীংকালে গুরুদাসবাবুর সঙ্গে জুটি হিসেবেই কাজ করছি প্রায় বিশ বছর হতে চলল।"

"শহুরে শিক্ষিতা অনেকে আছেন যাঁরা যাত্রাকে 'ময়না দ্বীপে'র আখ্যা দেন অথচ তাঁরাই দুপুরে স্টার বা রঙমহলে 'হাউসফুল' করেন – এঁদের সম্পর্কে আপনার মনোভাব?"

"দেখ ভাই, বিশ্বাস কর আমার কোনো রাগ নেই। আমাদের জীবনের কঠোর পরিশ্রমের ধারণা তো তাদের দিই না – ধানকাটা মাঠে মাঘ মাসের ঠান্ডায় আমরা যখন রে-রে করে চিৎকার করছি, তখন তো তিনি লেপের তলায়। সেই সময়ে হঠাৎ যদি শুনি, সাজঘরে ওই ছেলেটি পেটের ব্যথায় ছটফট করছে বা অমুকবাবুর হঠাৎ বুকের যন্ত্রণা শুরু হয়েছে, তখন ছুটে না গিয়ে করব কি! আমরা যে মানুষ গো, জানোয়ার তো নই। তাঁর মা যত পুণ্যবতীই হোন বা তাঁর স্ত্রীর সিঁদুরের যত জোরই থাকুক – সেখানে তো কেউই আসতে পারবেন না – আর আমরাও তখন নিরুপায়! পালাটা সেদিনের মত গাইতে হলে তাঁকে সেবা করে সারিয়ে তুলতেই হবে। দলের চাকর-বাকর থাকলেও এটা যে মেয়েদেরই কাজ। হ্যাঁ, এই থেকেই হয়ত আমাদের 'ময়না দ্বীপে'র ছোটখাট 'প্রেম' হয়ে ওঠে। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে আপত্তিকর কিছু দেখি না। যদি অবিবাহিতদের মধ্যে এরকম হয়, আর বিবাহিতদের দায়িত্ব সবটাই তাদের নিজেদের – সেটা অবশ্যই অন্যায়। দেখ, স্কুল-কলেজে বা অফিসে লোকেরা প্রেমে পড়ছে সেটা কিছু না – যত দোষ যাত্রাদলের!"

কথার মাঝেই লক্ষ্য করলাম একটি স্টিলের প্লেটে পেঁড়া এসে গেছে – উনি খেয়ে নিতে ইশারা করলেন। আমি পেঁড়া মুখে দিয়ে প্রশ্ন রাখলাম – "আচ্ছা যাত্রাদলের রুটিনটাই তো অনিয়মে বাঁধা, এর মাঝে সবদিক থেকে – অর্থাৎ শিক্ষা, অভিনয়, সাংসারিক দিক থেকে নিজেকে কিভাবে গুছিয়েছেন?"

"শোনো, মায়ের কাছে তো থাকবার সুযোগ বিশেষ পাইনি, কিন্তু চারপাশে সব সময়েই কিছু ভাল লোক পেয়েছি। যার যেটা ভাল, সেটাই প্রায় কপি করার মত করে তুলে নিয়েছি। সেসব ব্যাপারে আমি কিন্তু তোমাদের চেয়ে বেশি শিক্ষিত। জানো, আমি মেঝেয় লিখতে শিখেছি, আর পার্টের খাতা দেখে অক্ষর চিনে চিনে পড়তে শিখেছি। গিন্নিপনা তো মেয়েদের জন্মগত ব্যাপার, আর ঘর গোছানো, সেলাই এটা-ওটা রান্না করা – এ আর এমন কি! অভিনয়ের ব্যাপারে তোমার হয়ত শুনলে হাসি পাবে, সেই 'ফিমেল হিরো' নন্দবাবুই আমার আদর্শ। পরের দিকে ছোট ফণিবাবু, বড় ফণিবাবু, পঞ্চু সেন – এঁদেরই আমি মডেল করেছি, কোনো মহিলা অভিনেত্রীকে দেখে করিনি। যাত্রায় তো আমিই প্রথম মেয়ে, তাই দেখব কাকে? থিয়েটারের অভিনেত্রীদের দেখবার সুযোগই যে হয়ে ওঠেনি। তাই আমার অভিনয়ে সে সময়কার দিকপাল যাত্রার অভিনেতাদের প্রভাবই বেশি।"

"শরীর এবং গলা ঠিক রাখতে কিছু করেন কি?"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই। কলকাতায় থাকলে আমি প্রত্যেকদিন মনোতোষ রায়ের এক ছাত্রীর কাছে কিছু ব্যায়াম করি ও ম্যাসাজ করাই। আর গলার জন্য ব্রাহ্মীশাক ঘিয়ে ভেজে খাই। খুব ভাল টোটকা।"

"অবসর সময়ে কি করতে ভালবাসেন?"

"বাচ্চাদের সঙ্গে হুল্লোড় করতে, আর পয়সা থাকলে নজর-কাড়া শাড়ি কিনতে।"

"যাত্রাকে আপনি অনেক দিয়েছেন – পরিবর্তে যাত্রা আপনাকে কি কি সম্মান বা পুরস্কারে ভূষিত করেছে?"

"জ্যোৎস্না দেবী তুম-তাম করে ঘরের চারিদিকে ইতস্তত তাকালেন। দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি ঘরের চারটি দেওয়াল মানপত্রে মানপত্রে ছয়লাপ। এছাড়া তাকে,

টেবিলে, জানলায় সর্বত্র মেডেল, শীল্ড, পুরস্কার যে কত রাখা আছে তা গুনতে যাওয়া বাতুলতা। পাশের ঘরে আঙুল দিয়ে দেখালেন আরও কিছু আছে। উঁকি দিয়ে দেখি সে ঘরও বোঝাই।

"মেডেল নিয়ে যাত্রায় পথচলা শুরু করলেন, 'সোনাই দীঘি'-তে এলেন মধ্যগগনে, তারপর থেকে আজকের 'শচীমাতা' অবধি আপনার খ্যাতি তুঙ্গে। যে কটি বিরল ব্যক্তিত্ব মঞ্চে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই গুঞ্জনের শুরু হয়, আপনি তাঁদের অগ্রগণ্যা — ভবিষ্যতে যাত্রা থেকে আর কি আশা করেন?"

"দেখো, যাত্রাকে এখন ইন্ডাস্ট্রি বলেন অনেকে, কিন্তু এর ভালর জন্য কোথাও তেমন কোনো কাজ হচ্ছে না। এত বড় আর পপুলার একটা লোকশিল্পের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। একটা বড় কোম্পানিতে কাজ করলে শুনেছি প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, মেডিকেল এসব আরো কত কি থাকে, শেষ বয়সের সুবিধাও থাকে। আমরা এখন দুপায়ে দাঁড়িয়ে রোজগার করব, তাই আমাদের সারাজীবনের পাথেয়। ধর, আমার না হয় জমানো টাকা রইল, কিন্তু 'যাত্রা গাইবার' ক্ষমতা আর রইল না — তখন আমি কি করব? তাছাড়া সবাই তো বড় আর্টিস্ট নন — সাধারণ অভিনেতা বা বাজিয়েরা কি খাবেন? জানো, আমার ভারী সাধ হয় যে, একটা ছোট্ট স্কুল খুলব যেখানে শুধু যাত্রায় আসা নতুন ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেয়া যাবে। এটা যে একটা আলাদা মাধ্যম, এর অভিনয়-ঢঙটা যে সিনেমা-থিয়েটার থেকে একটু আলাদা, এগুলো বোঝাবার দরকার আছে। যাত্রায় খোলা মাঠে চারদিক ঘুরে ঘুরে যে অভিনয়, সেগুলো শেখানোর জন্য যদি একটা ছোট্ট গোল স্টেজ করা যায়, আর আমরা যারা রিটায়ার্ড লোক — বুড়ো বয়সে আমাদের বিভিন্ন আসরের অভিজ্ঞতা দিয়ে তাদের হাতে ধরে শেখাই, তাহলে কেমন হয়? সিনেমা-থিয়েটার থেকে এখন কত ভাল ছেলেমেয়ে আসছেন যাত্রায়। কেউ পারছেন, আবার কেউ একেবারেই পারছেন না। এর কারণ তাঁরা যে পদ্ধতিতে কাজ করেন তার সঙ্গে আমাদের যাত্রার যে অনেক তফাত তা তাঁরা বুঝতে চান না। বিজ্ঞাপন আর টাকার মোহে ছুটে এসে বিফল হয়ে ফিরে যান। তখন বদনাম হয় আমাদের ইন্ডাস্ট্রির। দল করার কথাও যে ভাবি না তা নয়, তবে ওই যে শুনি পুণাতে যেমন ইনস্টিটিউট আছে সিনেমার জন্যে, তেমনি যাত্রার জন্য একটা স্কুল গড়ার স্বপ্ন দেখি আমি।"

"আপনার কথা শুনে সত্যিই চোখে জল আসছে — এমন সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার চিন্তা বোধ করি কোনো মা তাঁর একমাত্র ছেলের জন্য করতে পারেন।"

"যাত্রার সঙ্গে যে গাঁটছড়া বেঁধেছি ভাই, সেই কোন্‌কালে, সাত বছর বয়সে এসে ঢুকেছিলাম এই সংসারে — আজ ভাল করে মনে পড়ে না। তখন থেকেই জানি, যাত্রা আমার — আমি যাত্রার — আমার ভাইবোন, ছেলেমেয়েদের কথা আমি ভাবব না তো কে ভাববে?"

"আজকের সকালটা আমার জীবনের এক অসামান্য অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হল — চলে যাবার আগে আপনার একটা গান যদি শোনান" — বললাম তাঁকে।

নিভাঁজ চিবুকটা একটু টান করলেন জ্যোৎস্না দেবী — নিচের ঠোঁট একটু চেপে চোখ বুজে এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন — তারপর বিশুদ্ধ উচ্চারণে দাদ্‌রা মধ্যলয়ে ধরলেন,

"আমি আর কিছু নাহি চাই —
জনমে জনমে ওগো সুন্দর
তোমায় যেন গো পাই —"

ভদ্রা বসু

ফটো: রবি দাস

ফেনা আর ফেনা টাট্‌কা তাজা...
স্বাস্থ্যে ভরপুর!



স্বস্তিক নিম সা
নিম আর কর্পূরে মিলিয়ে তৈয়ার, তাইতো স্নানের মজা, ফূর্তি

shilpi dm 5A/83 ben



জ্যাকি শ্রফ

রোমান্টিকতার থেকেও আবেগপ্রবণতা বেশি

হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের সম্ভাবনাময় নায়ক জ্যাকি শ্রফ। আবেগপ্রবণ রোমান্টিক নায়ক স্বভাবে প্রাণবন্ত, হাসিখুশি, আত্মবিশ্বাসী ও বন্ধুবৎসল। একটিমাত্র ছবি 'হিরো' মুক্তি পাবার পর দর্শক মহলে সাড়া জাগিয়েছেন জ্যাকি। পরিশ্রমের বিনিময়ে জীবনে সাফল্য অর্জন করতে চান, তাই তিনি একেবারেই নিয়তিবাদী নন বরং জীবনবাদী। জীবন সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা ও মহিলা বন্ধুদের সম্বন্ধে মতামত, এই নিয়ে এক কৌতূহলোদ্দীপক অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার।

বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। বম্বের হিউজেস রোডের 'কোব' রেস্তোরাঁয় জ্যাকির সঙ্গে প্রায় প্রত্যেকদিনই মিলিত হতাম কফি খাবার জন্যে। ও তখন একটি ট্র্যাভেলিং এজেন্সিতে চাকরি করত, আর বিভিন্ন বিখ্যাত কোম্পানির বিজ্ঞাপনে মডেল হত। ওর বান্ধবী আয়েষা দত্ত-ও ওর সঙ্গে মডেলের কাজ করত।

জ্যাকি খুব প্রাণবন্ত, হাসিখুশি, আত্মবিশ্বাসী ছেলে – যেমন এখনকার তরুণেরা হয় আর কি! তার প্রচন্ড উচ্চাশা ছিল। কিন্তু সে কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি তার একটিমাত্র ফিল্ম 'হিরো' রিলিজ করার সঙ্গে সঙ্গেই রাতারাতি বক্স-অফিস হিট করবে।

আমি সত্যিই বুঝতে পারি না ওর আকর্ষণী শক্তি কোথায় লুকিয়ে আছে! আসলে ওর ভালমন্দ বেছে নেবার দক্ষতা অসীম। ওর প্রত্যেকটি বান্ধবীর কাছেই ও একজন প্রেমের মূর্ত প্রতীক! মডেলিং করার সময়ে জীবনের প্রত্যেকটি জীবিকার লোকজনের কাছে ও সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। তারপরে ও আশা চন্দ্রের অভিনয় শিক্ষার স্কুলে ভর্তি হলো, মনে মনে বিরাট অভিনেতা হবার বাসনাকে লালন করতে লাগল। আমি যখন তাকে ইন্টারভিউ করতে গেলাম, দেখলাম ও সেই পুরনো কফি হাউসের দিনগুলোর মতই ভদ্র, সহজ, সরল এবং আন্তরিক রয়েছে। যার ফলে খুবই উষ্ণ এবং হৃদ্য পরিবেশে আমাদের কথাবার্তা বলা সম্ভব হয়েছিল।

আমাদের প্রশ্নোত্তর হয়েছিল এরকম :

প্রশ্ন : তোমার বিশেষ সম্পদ কী?

উত্তর : আমি দুটি সম্পদ নিয়ে অভিনয় জীবন শুরু করি। এক হচ্ছে কণ্ঠস্বর, অন্যটি হচ্ছে প্রবল ইচ্ছাশক্তি, যার ফলে আমি এত টাকা রোজগার করতে সমর্থ হয়েছি।

প্রশ্ন : তুমি তোমার প্রথম ফিল্ম 'হিরো'তে নামার আগে ছবির সাফল্য সম্পর্কে আশাবাদী ছিলে কি?

উত্তর : একেবারেই না। তবুও 'হিরো' দারুণভাবে হিট করল। এরপরে লাইন দিয়ে প্রযোজকরা আমার দরজায় এসে ভিড় করতে শুরু করলেন। 'হিরো'তে নামার আগে আমি ভেবেছিলাম, এই ছবিটি হয়তো আমার প্রথম অথবা সর্বশ্রেষ্ঠ, কিংবা আমার সবশেষ

পরিণতি হতে পারে। কিন্তু আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তাই এখন পর্যন্ত আমার মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির বিচারে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন : কিন্তু তুমি তো এই ফিল্মে ভিলেনের রোলে অভিনয় করেছিলে? রোলটি অভিনয় করার আগে তুমি কি একটুও ইতস্তত বোধ করনি?

উত্তর : যখন আমি স্ক্রিপটা দেখেছিলাম, একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তখন এটি পাল্টাতে গেলে আমাকে সবাই খুঁত-খুঁতে, অসন্তুষ্ট বলত। তাই বক্স-অফিসের দিকে তাকিয়ে আমি আর কিছু বলিনি। প্রত্যেকটি অভিনেতারই তার যোগ্যতা ও উচ্চাশা সম্পর্কে বাস্তবজ্ঞান থাকা উচিত এবং জনপ্রিয় থাকার জন্য নিজেকে ঠিকমতো তৈরি করে নেওয়া কর্তব্য।

প্রশ্ন : এখন তো তোমার হাতে প্রচুর ফিল্ম আছে; তুমি কি এই ভাবে তোমার স্ট্যাটাস বজায় রাখতে পারবে?

উত্তর : একজন জনপ্রিয় স্টার হওয়া এবং বহু বছর ধরে স্ট্যাটাস বজায় রাখা – দুটোই আলাদা জিনিস। কোনো ব্যক্তির আগে নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করা উচিত, তারপরে তার নিজস্ব গুণানুসারে যে রোল তাকে মানায় তা গ্রহণ করা প্রয়োজন – একথা আমি মনে করি। তাকে নিয়মানুবর্তী, অমায়িক, পছন্দযোগ্য, মর্যাদাপূর্ণ এবং নিজেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা শিখতে হবে।

প্রশ্ন : তুমি কি তোমার সহশিল্পীদের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছিলে?

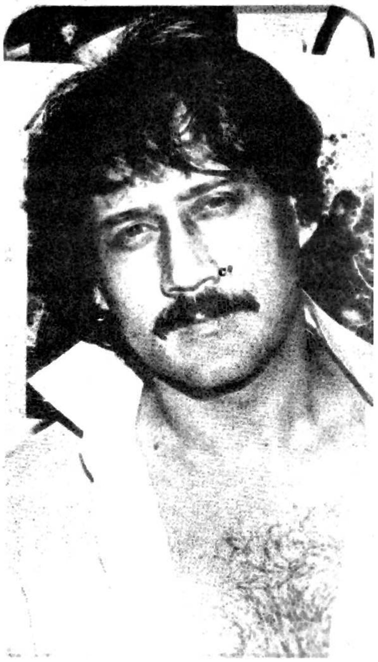
উত্তর : সাধারণভাবে বলতে গেলে, হ্যাঁ। কিন্তু সমস্ত প্রফেশনেই যেমন রেষারেষি আছে, তেমনি ফিল্ম জগতেও আছে। আমার অসাক্ষাতে অনেকেই বলে, 'ও একেবারেই অভিনয় করতে জানে না'।

প্রশ্ন : ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে একটা কথা চালু আছে, তুমি তোমার প্রত্যেকটি নায়িকার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলেছ। এই গুজবটা কি সত্যি?

উত্তর : এর উত্তরে আপনাকে একটি কথাই বলতে পারি, আমি মোটেই কামুক নই অথবা সনাতনপন্থী রক্ষণশীল যুবকও নই। আমি অন্যান্য মেল শভিনিস্টদের মতো মহিলাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করি না। যারা অহংকারী তারা স্ত্রী-পুরুষদের মধ্যে ভেদাভেদ করে। আমার একটি নিজস্ব জীবনদর্শন আছে। আমি আমার পরিচিত মহিলা বা সংস্থা বা প্রিয়বন্ধুদের কাছে যদি কোনো প্রতিশ্রুতি দিই তা পালন করতে সর্বদাই সচেষ্ট হই এবং এটি অত্যন্ত গোপন ব্যাপার।

প্রশ্ন : তার মানে তুমি কি আবেগপ্রবণ নও?

উত্তর : নিশ্চয়ই। আমি এত বেশি আবেগপ্রবণ যে, আমার গলার স্বর এবং চোখ এত বাঙ্ময়। কোনো মহিলা যদি আমার



'আমি অন্যান্য মেল শভিনিস্টদের মতো মহিলাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করি না। যারা অহংকারী তারা স্ত্রী-পুরুষদের মধ্যে ভেদাভেদ করে।'

পৌরুষদৃপ্ত চেহারার প্রশংসা করে তাহলে খুবই আনন্দ হয়। আমি আবেগপ্রবণ রোলে অভিনয় করতে সব সময় পছন্দ করি। এছাড়া জীবনমুখী ভূমিকায় অভিনয় করতেও ভালবাসি। আমি সর্বদা মহিলাদের সঙ্গে নম্র ও আন্তরিক ব্যবহার করি। যদি আমি মনে করি, একা একা পৃথিবীতে জীবনযাপন করবো, তাহলে তো লোকে আমাকে নার্সিসাস বলবে। আমি মনে করি মহিলারা শুধুমাত্র প্রেমিকাই হয় না, তারা ভাল বন্ধুও হয়।

প্রশ্ন : এত বিপুল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও সেই

'আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভালভাবে বেঁচে থাকা। এবং কেরিয়ার হচ্ছে বেঁচে থাকার অন্যতম উপায়।'

'সাফল্য আমার মাথা ঘুরিয়ে দেয়নি ... ... আমার পুরনো বন্ধুরা আমার সেই এক-ঘরের ফ্ল্যাটেই আসে, গল্প করে, আড্ডা মারে।'

ওয়াকেশ্বর রোডের ফোনহীন এক-ঘরের ফ্ল্যাটেই থাকছ কেন?

উত্তর : সাফল্য আমার মাথা ঘুরিয়ে দেয়নি। আমি আমার পুরনো ফিয়াট গাড়িটিকেই সারিয়ে নতুনের মত করে নিয়ে কাজ চালাচ্ছি। আর একটা টু-সিটার স্পোর্টস কারেরও খোঁজ করছি। আশা করছি এই বছরের মাঝামাঝি সময়ে নতুন বাড়িতে চলে যেতে পারবো। আমার পুরনো বন্ধুরা আমার সেই এক-ঘরের ফ্ল্যাটেই আসে, গল্প করে, আড্ডা মারে। কারণ আমি আড্ডা দিতে প্রচণ্ড ভালবাসি।

প্রশ্ন : দু বছর আগে সেই পুরনো জ্যাকি আর আজকের জ্যাকির মধ্যে কোনো তফাত খুঁজে পাচ্ছ কি?

উত্তর : এত বিপুলসংখ্যক লোকের হঠাৎ ভালবাসা পেয়ে আমি অভিভূত। আমি চাই লোকে আমার 'আমি'কে ভালবাসুক – আমার জনপ্রিয়তাকে নয়।

প্রশ্ন : তুমি কি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে কর? যে ভাগ্যের প্রভাব জীবনের সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়!

উত্তর : জীবন একটি রহস্যের আবরণে ঢাকা। মানুষ জানে না আগামীকাল তার ভাগ্যে কি আছে! আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে হয়তো আপনার জীবনধারা সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে, অথচ আজ সকালে আপনি তা চিন্তাও করতে পারছেন না।

প্রশ্ন : তার মানে তুমি ভাগ্যবাদী?

উত্তর : মোটেই তা নয়। আমি কঠোর পরিশ্রমে বিশ্বাসী। যদি আপনি জীবনের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠতে চান, তাহলে আপনাকে পরিশ্রম করতেই হবে।

প্রশ্ন : তুমি কি তোমার সাফল্যময় কেরিয়ার সম্পর্কে নিশ্চিত?

উত্তর : আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভালভাবে বেঁচে থাকা। এবং কেরিয়ার হচ্ছে বেঁচে থাকার অন্যতম উপায়। যদি জীবিকা জীবনকেও অতিক্রম করে যায়, তাহলে বেঁচে থাকার কোনো মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। জীবনকে ছাপিয়ে কখনই জীবিকাকে বড় করে দেখা উচিত নয়।

প্রশ্ন : আমার শেষ প্রশ্ন। সবাই তোমাকে রোমান্টিক নায়করূপে জানে, তুমি কি নিজেকে তাই মনে কর?

উত্তর : নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি যত না রোমান্টিক, তার থেকেও বেশি আবেগপ্রবণ। আমি আমার আবেগকে কিছুতেই সংযত করে রাখতে পারি না। যদি কোনো দুঃখজনক ঘটনা দেখি, তাহলে কেঁদে ফেলি। এছাড়া আমি সবাইকে গভীরভাবে ভালবাসতেও পারি। কোনো দুঃখের সিনেমা দেখে কেঁদে ফেলি। এমন যদি হয়, দুঃখের সিনেমাটি খারাপ পর্যায়ের, তাহলেও তা আমার মনে দুঃখ জাগায়, আর আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদি।

এস এন খোসলা

অভিমানী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

বাংলা চলচ্চিত্রের যে কজন সফল অভিনেত্রীর নাম একনিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর অভিনীত ছবির সংখ্যা তিনশোরও বেশি। এর মধ্যে সাড়া জাগানো ছবিও কম নেই। তবুও আরও দিতে না পারার বেদনাবোধ তাঁর শিল্পীজীবনকে বিষাদ ও ক্ষোভে আক্রান্ত করেছে। এই অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারে যার পরিচয় পাওয়া যাবে।

বাংলা চলচ্চিত্রের তিনজন প্রথম সারির অভিনেত্রীর আত্মপ্রকাশ উনিশশো বাহান্ন সালে। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া দেবী, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়। এবং তিপ্পান্ন সালের গোড়ায় সুচিত্রা সেন। আজও এই চার নায়িকার প্রতি আমাদের মুগ্ধতা! চারজনেরই তুমুল উপস্থিতিকে অস্বীকার করা, এড়িয়ে যাওয়া মুশকিল। কিন্তু অন্য তিনজনকে পিছনে ফেলে সুধীর মুখোপাধ্যায়ের 'পাশের বাড়ি' ছবির সেই সুঠাম, অনাড়ষ্ট, চটপটে, একরত্তি মেয়েটা টালিগঞ্জের রুপোলি সংসারে একনাগাড়ে দাপটের সঙ্গে কাটিয়ে দিলেন চৌত্রিশটা সোনালি বছর। তাঁর সৌন্দর্যে শরীরী উগ্রতা ছিল না। তথাকথিত গ্ল্যামারাস নায়িকাও ছিলেন না তিনি। অভিনয়ের জোরেই উৎকর্ষের এমন বিন্দুতে পৌঁছলেন, মুহূর্তে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে এল সাফল্যের আলাদা এক চত্বরে। তাঁর বিশুদ্ধ অভিনয় প্রতিভা পুষ্টি পেয়েছিল রঙ্গমঞ্চে। দীর্ঘ পরিশ্রম, অনুশীলনে আয়ত্ত করলেন চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সেরা উপাদানগুলিও। ফরমুলা-পীড়িত ছবিতেও দেখতে পেলাম তাঁর স্বাভাবিক, সাবলীল, স্বতঃস্ফূর্ত, জীবনভিত্তিক অভিনয়।

'ঢাকা বিক্রমপুরের কনকসার গ্রামের এক উচ্চমধ্যবিত্ত বর্ধিষ্ণু পরিবারে আমার জন্ম। রক্ষণশীল পরিবার। মা ইচ্ছাময়ী দেবী ছিলেন সরল, সাদাসিধে, নির্বিরোধ। বাবা শশধর চট্টোপাধ্যায় গুরু-গম্ভীর, রাশভারী। কড়া শাসনে রাখতেন মেয়েদের। দশ বোনের মধ্যে সবার ছোট বলেই আমি ছিলাম দুষ্টুমিতে সেরা। জন্মেছিলাম কুমিল্লায়। বাবা ওখানে রেলওয়েতে চাকরি করতেন। স্টেশন মাস্টার। কিন্তু শিল্প-সাহিত্যচর্চায় বেজায় উৎসাহী। দিদিরা সকলেই হয় গল্প বা নাটক লেখা, নয়তো নাচ-গান, বাজনা, অভিনয়ে বেশ পাকা ছিল। আমার ওসবে মন ছিল না। খালি হৈ-হল্লা, আড্ডা, ঘুরে বেড়ানো, দুষ্টুমি। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমিই অভিনয়কে পেশা করলাম। বাবা-মায়ের সায় ছিল না মোটেই। অর্থনৈতিক সমস্যার চাপে মেনে নিলেন।'

নিউ আলিপুরে তাঁর বাড়ির চারতলার ছিমছাম বৈঠকখানায় বসে গল্প হচ্ছিল। ঘরের দেয়ালে তিন টুকরো সোনালি অতীত, ফ্রেমে বাঁধানো। একপাশে বাংলা-ইংরিজি বইয়ের এলোমেলো ভিড়। তাঁর পরনে সাদাসিধে, মাড়-ছুট সুতির শাড়ি। ম্যাচ না-করা ব্লাউজ। লালচে শিথিল চুল। মুখে শ্রান্তির রেখাগুলোকে বিলুপ্ত করে পাউডারের ক্ষীণ প্রলেপটুকুও নেই। সুন্দরী না হলেও সাবিত্রীর চেহারায় এমন কিছু একটা আছে, দেখলেই মনে টান ধরে।

'সুখে ছিলাম। বাস্তুহারা হয়ে গেলাম ভাগ্যের পরিহাসে। সব কিছু সামলে কলকাতায় চলে আসতে ক-দিন দেরি হবে। তর সইতে না পেরে এমন চেঁচামেচি শুরু করলাম, কয়েকজন পাড়া-পড়শির সঙ্গে আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন বাবা। সেই সোনালি শৈশব, দেশের মাটি, নিজেদের চকমেলানো বাড়ি, প্রিয় মানুষদের ছেড়ে, রেলগাড়িতে চেপে হাজির হলাম শেয়ালদা স্টেশনে। দুই দিদির শ্বশুরবাড়িতে কয়েক মাস কাটালাম। বাবা-মা বরাবরের জন্য কলকাতায় চলে এলেন যখন, ভবানীপুরের স্কুল রো-তে ছোট্ট একটা ঘর ভাড়া নিলেন। আট দিদিরই বিয়ে হয়ে গেছে। আমরা ছোট দুই বোন বাবা-মায়ের নতুন সংসারে বড় হতে থাকলাম। বাবার মতো দৃঢ়চেতা, তেজী, একরোখা পুরুষ আর দেখিনি। বিপদের দিনেও কারো কাছে মাথা নোয়ালেন না। সংসার চালাবার জন্য 'পূর্ণ' সিনেমার সামনে পান-সিগারেটের দোকান করলেন। জীবনে লড়াই করার সাহস পেয়েছিলাম বাবার কাছ থেকেই। যেদিন সে লড়াইয়ে খানিকটা অন্তত জিতলাম…অভিনেত্রী হিসেবে কিছুটা খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, সম্মান, অর্থ পেলাম, দেখলাম বাবার চোখে জল!'

'ফিল্মে যোগাযোগ হলো কেমন করে?'

'রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ে ভিক্টোরিয়া গার্লস স্কুল-এর ক্লাস নাইন-এর ছাত্রী তখন। সহপাঠিনীদের সঙ্গে স্কুল থেকে ফেরার পথে ক-দিন ধরে লক্ষ্য করছিলাম, 'অমৃতায়ন' রেস্তোরাঁর সামনে থেকে একজন রোগামতো লোক প্যাট প্যাট করে আমাকে দেখছেন। শেষে একদিন তিনি পথ আগলে কাঁচুমাচুভাবে বললেন, 'নাটক করবা আমাগো লগে? বাঙাল কথা কইতে পারে অ্যামন মাইয়া খুইজ্যা ব্যাড়াইতাসি।' কোনো মতে মুচ্ছো সামলিয়ে গম্ভীর গলায় বললাম, 'বাবার পারমিশান নিতে হবে।' পরের দিন সকালেই বাড়িতে হাজির হয়ে বাবার অনুমতি আদায় করলেন ভদ্রলোক। কথায় কথায় জানা গেল, আমার মেজদি তাঁর মামিমা। পোশাকি নাম সাম্যময়। ডাকনামেই নামডাক হলো পরে। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। ভানুদা আমাকে নিয়ে গেল 'উত্তর সারথী' নাট্য-সংস্থার চাঁদের হাটে। একদল প্রতিভাবান মানুষের মধ্যে। সুশীল মজুমদার, সলিল সেন, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, নেপাল নাগ, শ্যাম লাহা, রসরাজ চক্রবর্তী, গৌতম মুখোপাধ্যায়, বানী গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল দাশগুপ্ত, বলীন বসু, কমলা দাশগুপ্তা…আর কত নাম করব! সবার সামনে আমার পরীক্ষা নিলেন পরিচালক কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। উতরে গেলাম। বাংলা নবনাট্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে দেশত্যাগী, ছিন্নমূল মানুষদের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি নিয়ে সলিল সেনের লেখা নাটক 'নতুন ইহুদী' গোটা দেশ জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করল। নায়িকা, রিফিউজি মেয়ে পরীর চরিত্রে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারলাম সহজেই। এই নাটক দেখেই পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায়ের সহকারী বিনু বর্ধন আমাকে নিয়ে গেলেন সুধীরবাবুর কাছে। সাত—আটদিন ধরে নানারকম পরীক্ষার পর 'পাশের বাড়ি' ছবির নায়িকা, বড়লোকের মেয়ে লিলির চরিত্রে আমাকে সিলেক্ট করলেন তিনি। নায়ক ক্যাবলাদার ভূমিকায় সত্যদা। সব নতুন ছেলে-মেয়ে নিয়ে তোলা ছবি কমার্শিয়ালি সুপার হিট করল। সাড়া পড়ে গেল চারদিকে।'

'অরুণ চৌধুরীর গল্প থেকে 'পাশের বাড়ি' ছবির কমেডি রোল-এর সাফল্যের পরই সিরিয়াস চরিত্রে বাজিমাত করলেন শরৎচন্দ্রের উপন্যাস অবলম্বনে নীরেন লাহিড়ীর 'শুভদা' ছবিতে ললনার ভূমিকায়। এবং এই চৌত্রিশ বছর ধরে কমেডি এবং সিরিয়াস চরিত্রে দাপটের সঙ্গে অভিনয় করে চলেছেন। কখনো-বা সিরিও-কমিক চরিত্রেও। কোন ধরনের ভূমিকা আপনাকে বেশি টানে?'

'তিনশোর ওপর ছবি করেছি। সব চরিত্রেই সাধ্যমতো ভালো অভিনয়ের চেষ্টা করলাম। স্বাভাবিক অভিনয়। সিনেমার মাপ মতো। যাকে বলে আন্ডার অ্যাক্টিং। থিয়েটারে সাধারণত কম-বেশি ওভার করতেই হয়। ফিল্মেও কোনো চরিত্র একটু ওভার দাবি করে বসে। কিন্তু কমেডি বা সিরিয়াস বা সিরিও-কমিক, কোনো বিশেষ ধরনের



রাজকুমার নাটকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে

পক্ষপাতিত্ব নেই আমার। তবে যেসব চরিত্রে বিভিন্ন পরিবর্তন আছে, বা যেসব চরিত্র নিয়ে প্রচন্ড খাটতে হয়, যেসব চরিত্র আমাকে পেয়ে বসে, কাজ করে আনন্দ পাই।'

'কাজ করে আনন্দ পেয়েছেন, এমন ছবির নামগুলো শুনি। প্রথমে কমেডি বা সিরিও-কমিক রোল।'

'ছ-টা ছবির কথা মনে পড়ছে। 'পাশের বাড়ি' ছাড়াও জ্যোতির্ময় রায়ের 'কাঁচা-মিঠে', ভবেন দাশের 'কানামাছি', মানু সেনের 'ভ্রান্তিবিলাস' এবং অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'ধন্যি মেয়ে' ও 'মৌচাক'। 'কাঁচা-মিঠে' ছবিতে অনুপকুমার আর আমি ছিলাম ভাই-বোন। অনুপদার প্রেমিকা তপতী ঘোষ, আমার প্রেমিক রবীন মজুমদার। এই দুই জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকার দারুণ মজাদার, দমফাটা কান্ডকারখানা! অমন কমেডি রোল আর কখনো পাইনি। অনেকগুলো স্তর ছিল চরিত্রটার। দুর্দান্ত সংলাপ। স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় করেছিলাম। জ্যোর্তিময়বাবুরই গল্প, চিত্রনাট্য।'

'সিরিয়াস চরিত্রে?'

'নীরেন লাহিড়ীর 'শুভদা', সুশীল মজুমদারের 'ভাঙ্গা-গড়া' ও 'শেষ পরিচয়', বিকাশ রায়ের 'মরুতীর্থ হিংলাজ', মৃণাল সেনের 'প্রতিনিধি', সলিল দত্তর 'মোমের আলো', শচীন মুখোপাধ্যায়ের 'কাল তুমি আলেয়া', অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বালুচরী', অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'নিশিপদ্ম', অগ্রদূত-এর 'মঞ্জরী অপেরা', অজয় করের 'মাল্যদান'। চৌত্রিশ বছরের কেরিয়ারে আমার সবচেয়ে প্রিয় ছবি 'মরুতীর্থ হিংলাজ'। কাজ করে এত সুখ পেয়েছিলাম! অবধূত-এর অমন অসাধারণ কাহিনী, ওই বিরাট স্প্যান-এর ছবি, কলকাতার স্টুডিও ছাড়াও বিকানীর, ঘাটশিলা, দীঘায় অত ঘোরাঘুরি করে শুটিং, খাটাখাটনি···ক-টা দিন যেন মিশে গেছিলাম রাজস্থানী মেয়ে কুন্তীর চরিত্রে! আটান্ন সালে এই ছবি তৈরির দিনগুলোর কথা মনে পড়লে রোমাঞ্চ লাগে!'

'নির্মল দে-র 'বসু পরিবার' থেকে সুখেন দাসের 'প্রতিশোধ'—তিরিশটা ছবিতে উত্তমকুমারের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। তিনটে দশকে বারে বারে ঘুরে-ফিরে দেখা উত্তমবাবুকে এখন কীভাবে মনে পড়ে?'

'উত্তমকুমারের সিনসিয়ারিটির তুলনা হয় না। সব কিছুতেই। অভিনয়ে তো বটেই, ব্যবহারিক জীবনেও। সব বিষয়ে, খারাপ বা ভালো সব ছবিতে, তিনি ছিলেন সমান সিনসিয়ার। যখন যা করতেন, সেই মুহূর্তে অন্য কিছু মনে রাখতেন না। আগের এবং পরের ব্যাপারটা অনায়াসে ভুলে থাকতে পারতেন। তাই যখনই যা কিছু করলেন রিমার্কেবল হয়ে দাঁড়াল। আমাকে সাবু বলে ডাকতেন। অমন চমৎকার বন্ধু, দাদা, সহকর্মী আর হয় না! দিনে দিনে যতই নামডাক হোক, কোনোরকম অহমিকা প্রকাশ পেতো না তাঁর কাজে-কর্মে, মেলামেশায়, ব্যবহারে। একসঙ্গে অভিনয় করতাম যখন, নানাভাবে সাহায্য করতেন। ভুল হলে শুধরে দিতেন। উত্তমদার সঙ্গে আড্ডা মারতে বসলেও কত কিছু শেখা যেত। অভিনয়ের বাইরেও কত কী জানতেন! আর ওই ভুবন ভোলানো হাসি?···প্রেমে না পড়ে উপায় কী!'

'সিনেমায় যাঁদের সঙ্গে অভিনয় করেছেন, তাঁদের মধ্যে কোন কোন অভিনেতাকে দুর্ধর্ষ মনে হয়েছে?'

'চুয়ান্ন বছরের বাংলা সবাক ছবির ইতিহাসে সেরা অভিনেতা ছবি বিশ্বাস। ওরকম ব্যক্তিত্ব, দাপট, হাঁটা-চলা, কথা বলার ঢঙ, কণ্ঠস্বর, অভিনয়ের রেঞ্জ···একেকটা চরিত্র যেন আপনিই বেরিয়ে আসত। ছবিদার যে-কোনো দশটা ছবি দেখে অভিনেতা হবার পাঠ নেওয়া যায়। উত্তমদা গোড়ার দিকে মিডিওকার অ্যাক্টর ছিলেন। নিজের চেষ্টায়, পরিশ্রমে, অধ্যবসায়, জেদে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠলেন। যে-কোন তৃতীয় শ্রেণীর চরিত্রকেও চমৎকার দাঁড় করিয়ে দিতে পারতেন। ওই স্ক্রিন প্রেজেন্স, ভাবা যায়!'

'এই মুহূর্তের বাংলা ছবি সম্পর্কে আপনার ইমপ্রেশন কেমন? নতুনদের ভেতর ট্যালেন্টেড অভিনেতা-অভিনেত্রী কে কে? বা পরিচালকদের মধ্যে?'

আমার কথায়, কেন জানি মনে হলো, একটু খোঁচা লাগল: 'বাংলা ছবির সঙ্গে এখন আমার সম্পর্ক কোথায়? কালে-ভদ্রে দুটো-একটা ছবি করছি। পছন্দসই চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পাচ্ছি না। এমন কিছু অফার আসছে, যাকে বলে রাবিশ। আজে-বাজে রোল করার চেয়ে, না করা ভালো। খাওয়া-পরার অভাব তো নেই আর। নতুন পরিচালক বা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে কাজ না করলে, তাঁদের মধ্যে কে কে ট্যালেন্টেড, বলব কেমন করে? সিনেমা হলে গিয়ে বাংলা ছবি দেখাও ছেড়ে দিয়েছি। প্রোফেশন্যাল স্টেজে অভিনয় করার ফলে শনিবার সন্ধেবেলা টেলিভিশনে ছবি দেখারও সুযোগ নেই। ফিল্মি পার্টিতে যাই না। অথবা পুরস্কার বিতরণের সভায়। অনেক আগে পাওয়া পুরস্কার বা মানপত্র-টত্র বিদেয় করে দিয়েছি এই বসার ঘর থেকে। সাংবাদিকদের এড়িয়ে চলি। ইন্টারভিউ দেওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আপনি এমন নাছোড়বান্দা···! আর কী হবে এসবে? অনেক কিছু পেয়েছি জীবনে!'

সাবিত্রীর কথা শেষ হতেই না বলে পারলাম, না, 'শুধু আপনার কথায় নয়, কথা বলার ঢঙেও টের পাচ্ছি, অনেক খেদ, অভিমান, না-পাওয়া বহু কিছুর জন্য মন-কেমনের উদ্‌ভ্রান্ত হাওয়ায় আপনি বিক্ষিপ্ত!'

কপালে ভাঁজ পড়ল। কফির পেয়ালায় চামচ নাড়তে নাড়তে কী যেন ভাবলেন খানিক। তারপর ম্লান হেসে বললেন, 'সেসব কাঁদুনি গেয়ে কোনো লাভ নেই। যেমন, কাগজের লোকেরা আমার চেয়ে লেস ক্যালিবার-এর শিল্পীদের নিয়ে নাচানাচি করেছেন, আমাকে পাত্তা দেননি। অনেক পরিচালকেরই কোনো ছবিতে হয়তো মন দিয়ে ভালো অভিনয় করলাম, ও মা, তাঁর পরের সব ছবি থেকেই বাদ! একটা বয়সে নানান পুরস্কার, ভালো কাজের স্বীকৃতি, শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করে। ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ছেড়েই দিলাম, অন্য কোনো প্রথম শ্রেণীর পুরস্কার ক-বার পেয়েছি? তোষামোদ করিনি বলে, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও, অনেক ভালো চরিত্রে সুযোগ পাইনি। আমার যা পোটেনশিয়ালিটি, এক্সপ্লয়েট করা হলো না। ঋত্বিক ঘটক আমাকে নিয়ে ছবি করার কথা ভেবেছিলেন। আলোচনাও হয়েছিল। আমার দুর্ভাগ্য, তিনি তিলে তিলে নষ্ট করলেন নিজের প্রতিভা, আত্মহনন করলেন। কিন্তু সত্যজিৎ রায়? তিরিশ বছরে একবারও আমাকে মনে পড়ল না তাঁর? তেষট্টি সালে মৃণাল সেনের যখন প্রচণ্ড দুঃসময়, ছবি কমার্শিয়ালি চলবে না জেনেও, ওঁর 'প্রতিনিধি' ছবিটা প্রযোজনা করেছিলাম। গুণীর কদর করার জন্য। ছবির বিষয়টাও টেনেছিল। পুরুষশাসিত সমাজে মহিলাদের অবস্থা, যে-অবস্থা মেয়েরা কোথায় যেন মেনে নিয়েছেন! কিন্তু যদি মেয়েরা সমাজের সমস্ত ভয়-ভীতি, পাহাড়প্রমাণ প্রেজুডিস থেকে বেরিয়ে আসতে পারতেন! চমৎকার ছবি। অভিনয় করেও ভীষণ খুশি হয়েছিলাম। ওই ছবি তৈরির পর কুড়ি বছর পেরিয়ে গেল, মৃণালবাবু ক্রমে পৃথিবী-জোড়া নাম করলেন, কিন্তু আর কোনো ছবিতে অভিনয়ের জন্য আমাকে ডাকলেন না। তাহলে কি ধরে নেব, ভালো অভিনেত্রী হিসেবে নয়, ছবি করার টাকা দিয়েছিলাম বলেই 'প্রতিনিধি' ছবির নায়িকা হতে পেরেছিলাম? রোজ এরকম হাজারটা প্রশ্ন আমাকে জ্বালাতন করছে। করুক গে। নিজের ভাগ্যকে মেনে নিতে হয়। নিয়েছি। জীবনে যদি দশটা ভালো ছবিও করে থাকি, আমার মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরেও লোকে আমাকে মনে রাখবেন। নাহলে আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। সকলের স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাব!'

শুধু অভিমান নয়, অনেক ব্যথা, অবিশ্বাস, স্বপ্নভঙ্গ, ব্যর্থতা, বিষাদ এবং ক্ষোভ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে।□

সুজয় সোম

খাদিমের
বাটেক্স

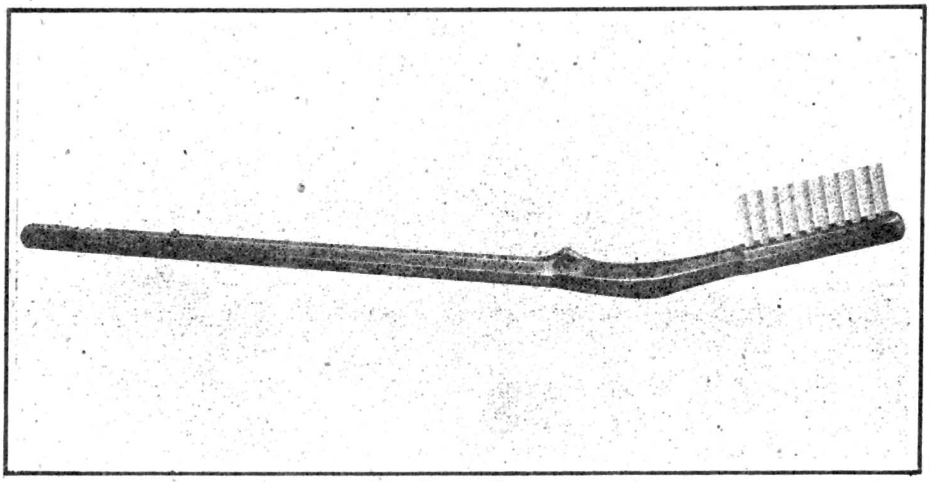


রোজী ও ডঙ্কা
হাওয়াই
ব্যবহার
করুন

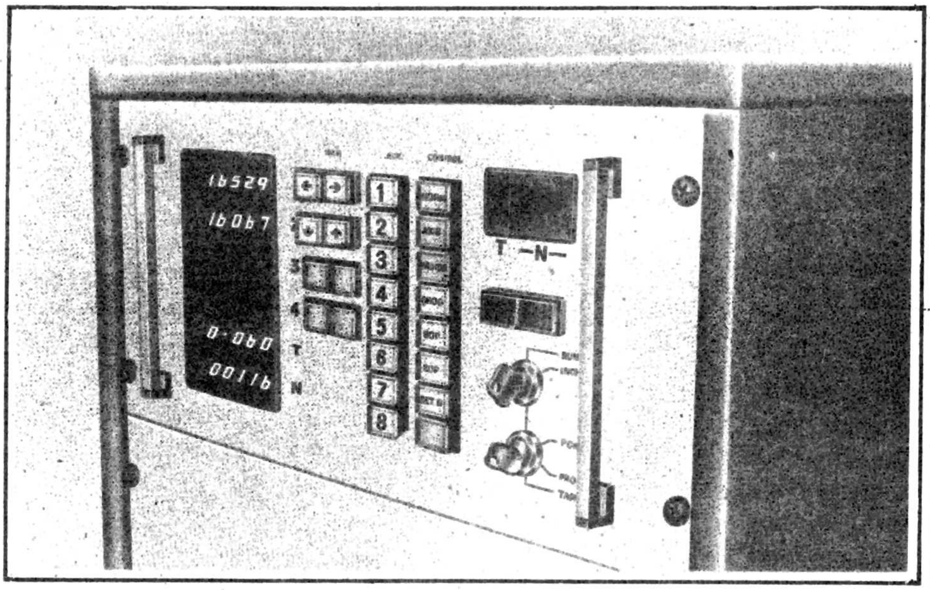
KHADIMS' BUTEX

কে, এম, খাদিম এণ্ড কোং
কলিকাতা-৭৩

বালসারার উদ্ভাবন – কমপ্যুটারাইজড টুথব্রাশ



নিউ প্রমিস-১৫ টুথব্রাশ



কমপ্যুটারাইজড ব্রাশ তৈরির মেশিন

ভারত আজ কমপ্যুটার যুগের মধ্যে প্রবেশ করেছে। কমপ্যুটার সবক্ষেত্রেই বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সংসারের খুঁটিনাটি থেকে অফিসের কাজকর্মে কমপ্যুটারের অবদান আজ অনস্বীকার্য। এমনকি কমপ্যুটা-রাইজড টুথব্রাশও তৈরি হয়েছে। ভারতে সর্বপ্রথম এই ধরনের টুথব্রাশ তৈরি করেছে বালসারা।

ইতিপূর্বে বালসারা তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং প্রগতির জন্য যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। এবার তাঁরা তৈরি করেছেন এক অভিনব টুথব্রাশ। 'প্রমিস -১৫' – ভারতে যা সর্বপ্রথম। অন্য যে-কোনো টুথব্রাশের চাইতে এর মান উন্নত।

যে কমপ্যুটার ইংল্যান্ড থেকে আনা হয়েছে তাতে এমনভাবে প্রোগ্রাম করা আছে যাতে ব্রাশের প্রতিটি দাঁড়া কাটা, গোল করে ছাঁটা এবং গুচ্ছ করে বাঁধার কাজও হতে পারে। প্রতি মিনিট 600 × 2 গুচ্ছ করার ক্ষমতা মেশিনের আছে। এছাড়া গুণ এবং সংখ্যার দিক দিয়েও বেশি ব্রাশ উৎপন্ন করে মেশিনটি।

প্রমিস-১৫ অনেক দিক থেকেই অভিনব। ১৫° কোণ করে থাকার ফলে দাঁতের পেছনের দিকেও পৌঁছতে পারে, যেখানে ক্ষয় তাড়াতাড়ি হয়। সারা পৃথিবীর দাঁতের ডাক্তাররা ১৫° কোণযুক্ত ব্রাশ ব্যবহারের সুপারিশ করেন কারণ এটি মুখের ভেতরদিকও পরিষ্কার করতে পারে।

প্রমিস-১৫-এর হাতলটিও লম্বা, ধরার সুবিধার জন্য। এর দামও কম, যাতে সকলেই এটা কিনতে পারেন। এটি ব্যবহারের ফলে সাধারণভাবে দাঁতের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এইজন্যই বোধহয় ব্যবহারকারীরা বলেন, 'আগে কেন কেউ এটার কথা ভাবেনি।'

কয়েক বছর আগে প্রমিস টুথপেস্ট সকলের মন জয় করেছে। এবার বালসারা টুথব্রাশের ক্ষেত্রেও নতুন নজির সৃষ্টি করতে চান। প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী স্মল স্কেল সেক্টারের ওপর যে নির্ভরতা প্রকাশ করেছেন, তাকে প্রতিষ্ঠিত করবে এই প্রয়াস।



শিমুলতলায়

'ভালবাসা ভালবাসা'-র আউটডোরে

রানা দাস

[গত সংখ্যার পর]

মিনিট কয়েকের মধ্যেই শ্মশান থেকে ফিরে ক্যাম্পে পৌঁছে দেখি সেখানকার আড্ডার আসর বেশ জমজমাট। কী একটা ব্যাপার নিয়ে অনুপকুমার আর সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে মন্দ-মধুর ঠোকাঠুকি চলছে। আসরে যোগ দিতে বোঝা গেল, নেহাতই ইয়ার-দোস্তের গুলতানি সেটা। ওঁরা দুজনেই দুজনের বন্ধু। অনেককালের। তুই-তুকারি সম্পর্ক। দীর্ঘ অভিনয় জীবনে কে কোথায় কীভাবে ডুবিয়েছে, স্মৃতি খুঁড়ে তা একজন আরেকজনকে জানিয়ে দিচ্ছেন। এবং মজা পাচ্ছেন। যার শুরু এইরকম – তুই আর বলিস না, সেবার ......। কথাটা মন দিয়ে শুনেই একজনের কথায় আরেকজন হো হো করে হেসে উঠছেন। দুজন পরিণত অভিনেতার সোজা-সরল এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপভোগ করছেন এখানে উপস্থিত সকলেই।

এই আড্ডার পরিবেশে খানিকটা অন্য হাওয়া এসে লাগল সন্তু মুখার্জির আবির্ভাবে। কথাটা এভাবে লিখলাম, জানি, সন্তুর চোখে পড়লে খানিকটা লজ্জা পাবেন। কারণ অভিনয় জগতে নিজেকে সম্মানের সংগে প্রতিষ্ঠিত করলেও সন্তু বেশ সাদামাটা চরিত্রের মানুষ। সাদামাটা অর্থে বিনয়ী, ভদ্র, আন্তরিক এবং অহমিকাহীন। সর্বোপরি অত্যন্ত বন্ধুবৎসল। এই গুণগুলো সম্পর্কে সন্তু নিজে কতটা সচেতন আমি জানি না, তবে এসবের জন্যে ওঁকে সকলেই যে খুব পছন্দ করে সে ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। সন্তু আসতেই রুমাদি বললেন, আজ সন্তুর গান শুনব। তরুণবাবু বললেন, খুব ভাল প্রস্তাব। তবে বারান্দায় এভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে থাকলে সেটা খুব জমবে না, তার চেয়ে সকলে চলুন – আমরা ঘরে গিয়ে গুছিয়ে বসি।

গুছিয়ে বসা বলতে মাধব ভিলার প্রশস্ত হলঘরটিতে আমরা সকলে গোল হয়ে বসলাম। ভাবুন একই আসরে অগ্রজ-অনুজ উৎপল দত্ত, রুমা গুহঠাকুরতা, তরুণ মজুমদার, অনুপকুমার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তু মুখার্জি, তাপস পাল, দেবশ্রী রায়, কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও ববিতা চক্রবর্তী। এইসংগে অন্যান্য সকলে তো রয়েছেনই। উপস্থিত ফটোগ্রাফারদের কারো সংগেই ফ্ল্যাশ ছিল না, নইলে এই আড্ডার ছবি আমি ক্যামেরায় ধরে রাখতে বলতাম।

যাই হোক, সাধারণত যা হয়, গান শোনার জন্যে এখানে এসে বসলেও, বসামাত্রই সেটা শুরু হল না। বারান্দা থেকে এখানে উঠে আসার জন্যেই কিনা জানি না, কিছুটা গোল বাধল 'বারান্দা' শব্দটি নিয়ে। এঁদের মধ্যে একজন 'বারান্দা' না বলে বলেছেন 'বারাণ্ডা'। এই অশুদ্ধ উচ্চারণ নিয়ে নানা প্রসংগ এসে পড়ল। একেতেই বাংলা বানান, তায় আবার উচ্চারণ নিয়ে তর্কাতর্কি। এই মুহূর্তে এই পরিবেশে কিছুটা বিরক্তিকর তো বটেই। সম্ভবত সে কারণেই তাপস, কৌশিক উদ্‌গ্রীব হয়ে বললেন, নাও সন্তুদা, এবার তুমি গান ধর তো! সন্তু বললেন, আরে বলছিস যখন আমি তো গেয়ে দিতেই পারি। কিন্তু ভেবে দেখ তো, যে আসরে রুমাদি বসে, ওঁকে আমরা এমনিই ছেড়ে দেব! সবাই মিলে চেপে ধর, আজ রুমাদিকে গান শোনাতেই হবে। দু হাতের কাঁটায় উল বুনতে বুনতে সন্তুর এই উসকানি রুমাদি লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন, সন্তু মুখ ঘুরিয়ে যেই বললেন কী গো রুমাদি গাও না একটা গান, অমনিই রুমাদি চোখ পাকিয়ে বললেন, এই সন্তু একদম ইয়ার্কি কোরো না – বলে দিচ্ছি, আমার পেছনে লাগলে আমি কিন্তু এখান থেকে পালাবো।

আচ্ছা, এতে পালাবার কী আছে? তোমার গান আমরা ভালবাসি, তাই শুনতে চাইছি। সন্তুর এই কথায় সকলেই যখন সায় দিল এবং সরব হল – রুমাদি তখন অনিবার্য অজুহাতটি শোনালেন, আমার গলা ভাল নেই, আর তাছাড়া কয়ারে সকলের সংগে গাইলেও আমি একা গান গাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছি, বিশেষ করে একেবারে খালি গলায়। না না আমি গাইতে পারবো না। রুমাদির এই অজুহাত সরাসরি খণ্ডন করলাম আমি, বললাম, আপনার এইসব কথা বিশ্বাস করছি না রুমাদি, এই কিছুদিন আগেই আমি আপনার গান শুনেছি হেমন্ত মুখার্জির সংবর্ধনায়, রবীন্দ্রসদনে। পলাতক ছবি থেকে আপনি আপনার নিজের দুটো গান গেয়েছিলেন সেদিন।

রুমাদি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। ওমা সেখানে তুমি ছিলে নাকি? তাহলে তো তোমার জানা উচিত, সেদিন আমি গানের কথা কীরকম ভুল করে ফেলছিলাম।

বললাম, তাতে কী হল, অনেক প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীকেও আমরা দেখি গান দেখে গান গাইতে। নিয়মিত গেয়ে রবীন্দ্রসংগীতই যদি তাঁদের মনে না থাকে, আপনি তো আপনার পুরনো দিনের গান গাইছিলেন, ভুল হতেই পারে। স্মরণের সেই অভিমানে এখন আমরা আপনার গান শোনা থেকে বঞ্চিত হব – এটা কিন্তু কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। সকলেই বললেন, তাই তো! এরপর রুমাদি আর কী বলবেন! হার মানলেন। তবে নিজেকে প্রকাশ করলেন খানিকটা অন্যভাবে। কিছুটা যেন নিরুপায় হয়েই মাথা নিচু করে বললেন, ঠিক আছে তোমরা যখন এমন করে বলছো, সন্তু আগে একটা গান ধরুক, আমার জানা থাকলে আমি ওর সংগে গাইব।

সন্তু বললেন, ঠিক আছে, তোমার জানা একটি গানই আমি গাইছি, ধরতে হবে কিন্তু। সন্তু শুরু করলেন একটি উপযুক্ত রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে – পুরানো সেই দিনের কথা \ ভুলবি কি রে হায়/ও সেই চোখে দেখা প্রাণের কথা, সে কি ভোলা যায়। রুমাদি প্রথমে গুনগুন করে পরে গলা ছেড়েই গাইলেন সন্তুর সংগে গলা মিলিয়ে। একসময় সন্তু থেমে পড়লেন। কিন্তু রুমাদি তখনো চোখ বুজে দরাজ মেজাজে আছেন। মুহূর্তের মধ্যেই সকলের মধ্যে একটা মনস্ক-নীরবতা নেমে এল।

গানটি শেষ হতে, অনিবার্যভাবে একটি কথা মনে হল আমার, রুমাদি এককভাবে খুবই কম গান গেয়েছেন, আরো গান তিনি গাইতে পারতেন, কিন্তু নিজের প্রতিভা প্রায় সবটাই তিনি উজাড় করে দিয়েছেন তাঁর কয়ারে। অথচ তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর পরিবেশনা দুইয়েতেই ভিন্ন এক আবেদন রয়েছে, যা রীতিমত দুর্লভ এবং সে কারণেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই মুহূর্তে এই উপলব্ধি শুধু আমার নয়, হয়তো এখানে উপস্থিত সকলেরই। তাই গান শেষ হতে সকলেই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে তারিফ জানালেন রুমাদিকে। আশ্চর্য, হাসিতে বা কথায় এই সমবেত প্রশংসায় রুমাদি কিন্তু কোনো সরব প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলেন না। করপল্লবে চিবুক রেখে খানিকটা সময় নতমুখ হয়ে রইলেন। কেন? আমি জানি না। শুধু এইটুকু বুঝি রুচিশীল, স্পর্শকাতর যে কোনো মানুষকেই, হোন না তিনি শিল্পী কিংবা সাধারণ, নারী কিংবা পুরুষ, প্রকৃত ভালবাসা

শুধু আনন্দই দেয় না, তাকে অব্যক্ত গভীর এক বেদনাবোধেও বিদ্ধ করে। সাধারণভাবে আত্মসচেতন মানুষ হয়তো তখনই ভাবতে বসে, আমি কি সত্যিই এর যোগ্য! জয় করেও এই ভয়ের মধ্যে মানুষ আসলে নিজেকেই যথার্থভাবে আবিষ্কার করার অনুপ্রেরণা খুঁজে পায়। তাই প্রকৃত ভালবাসার আরেক নাম 'সুখী বেদনা'।

যাইহোক, এরপর অনুপকুমারের অনুরোধে সন্তু গেয়ে শোনালেন চমৎকার একটি লোকসংগীত। ভারী সুন্দর তার কথা। ভাবার্থ, আপাত কাঠখোট্টা অথচ ভেতরে ভেতরে রোমান্টিক এক পুরুষ একটি মেয়ের রূপচাতুর্যে মুগ্ধ। এই মুগ্ধতার কথা সে মেয়েটিকে বলতে পারছে না, অথচ ভেতরে ভেতরে সে হয়ে পড়ছে অশান্ত। সে তখন তার ভালবাসার পাত্রীর প্রতি তার প্রেম প্রকাশ করছে এইভাবে – এখন ঠিক মনে পড়ছে না আমার, একবার শুনেছি তবে কথাগুলি এইরকম : তু লাল পাহাড়ীর দেশে যা/রাঙামাটির দেশে যা/হিথাকে তুকে মানাইছে না গো।

সন্তু এই গানটি শেষ করতেই সকলে হাততালি দিয়ে উঠলেন। ওঁর মুখে আমি এর আগে রবীন্দ্রসংগীত, অতুলপ্রসাদ, কখনো কখনো আধুনিক গানও শুনেছি ; কিন্তু লোকসংগীত এই প্রথম শুনলাম। বেশ ভাল লাগল। অনুপকুমারের অনুরোধে সন্তু এই গানটি ধরেছিলেন। গান শেষ করেই সন্তু এবার অনুপবাবুকে চেপে ধরলেন, একটা গান হোক না। অনুপবাবু কিছু বলার আগেই আচমকা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় কাপড়ের কোঁচা ঝেড়ে উঠে পড়লেন। তরুণবাবু জিজ্ঞেস করলেন – কী ব্যাপার, উঠে যাচ্ছেন? সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় স্বগতোক্তির মত করে বললেন – না, মানে অনুপ গান ধরলে তো আপনাদের সকলকেই উঠে পড়তে হবে, আমি নয় আগেই উঠে পড়লাম! সকলেই দমকা হেসে উঠে রসিকতাটা উপভোগ করলেন। বলাই বাহুল্য অনুপকুমারের মত ব্যক্তি দমবার পাত্র নন। তিনি পালটা সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা বুঝতে পারছেন না ওঁর অস্বস্তিটা কোথায়? এ ওকে গান করতে বলছেন, আবৃত্তি করতে বলছেন, ওঁকে তো কেউ কিছু বলছেন না! কেউ বলুন না আবৃত্তি করতে, বললেই করে দেবে – তাও আবার অন্য কারো কবিতা নয়, স্বরচিত কবিতা। উত্তরে সত্যবাবু বললেন, তুই ভাবছিস, এইভাবে বললে আমি রেগে যাবো, কবিতা পড়ব না। তবে শুনুন আপনারা।- বলেই সত্যবাবু আবার বসে পড়লেন। এবং সত্যিসত্যিই চমৎকার দুটি স্বরচিত কবিতা মন থেকে আবৃত্তি করে শোনালেন। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, সম্ভবত তাঁর একটি কবিতার নাম ছিল 'ডাস্টবিন'। বেশ ভাল কবিতা। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিই, অনেকেই জানেন সেটা,



রুমা গুহঠাকুরতা

কিছুকাল আগে ময়দানে ফুটবল খেলা দেখতে গিয়ে ভিড়ের চাপে একসঙ্গে ষোলটি তরুণ প্রাণ দিয়েছিলেন। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ঘটনায় রিঅ্যাক্ট করে স্মরণীয় একটি কবিতা লিখেছিলেন। মান্না দে তাঁর কণ্ঠে সেটি রেকর্ডও করেছিলেন এইচ এম ভি থেকে। গানটি ছিল 'খেলা ফুটবল খেলা'।

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবৃত্তি শেষ হতে অনুপকুমার মন্তব্য করলেন, তোর কাব্য প্রতিভা প্রকাশের কেমন একটা চান্স করে দিলাম, বল? তবে আমি তোর মত কবিতা লিখতে না পারলেও আবৃত্তি একেবারে খারাপ করি না, আমাকে একটা চান্স দিয়ে দেখ না! কবিতার ব্যাপারে সত্যবাবু দেখলাম বেশ সিরিয়াস। ঠাট্টা নয়, বেশ আন্তরিক আবেদনেই বললেন, আহ কর না, কর না। অনুপবাবু আবৃত্তি করলেন সলিল চৌধুরীর শপথ কবিতাটি। বেশ বড় কবিতা। পুরোটাই স্মৃতি থেকে উদ্ধার করলেন তিনি। এঁদের অনুপ্রেরণায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আরো একজন আবৃত্তি করলেন, তিনি তাপস পাল। তাপস সদ্য-বিবাহিত হয়ে শিমূলতলায় এসেছেন।

সন্তু মুখার্জি



সকলে ভেবেছিলেন কোনো রোম্যান্টিক কবিতা শোনাবেন তিনি। তাপস শোনালেন একেবারেই ভিন্ন ধরনের কবিতা।

এ দিনের আসরে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল উৎপল দত্তের অংশগ্রহণ। তরুণবাবুর অনুরোধে তিনি আবৃত্তি করে শোনালেন শেক্সপীয়র থেকে। চোখ বুজলে এখনো তাঁর উচ্চারণভঙ্গি কানে গমগম করে বাজে। সত্যি স্মরণে গেঁথে রাখার মত এক অভিজ্ঞতা।

এ দিনের এই আড্ডা ভাঙতে ভাঙতে বেশ রাতই হল। বেশ কাটানো গেল এঁদের সঙ্গে দুটো দিন। আগামীকাল আমি ফিরে যাবো কলকাতায়। সেকথা ভেবে মনটা একটু খারাপই লাগছে। এখানে এঁদের কাজ চলবে আরো কয়েকটা দিন।

' যে কথা বলছিলাম, গ্ল্যামারের ঘেরাটোপের মধ্যে থাকলেও মনে রাখা দরকার, এঁরাও সুখে-দুঃখের মানুষ, এদেশে 'ডিগনিটি অব লেবার' ইদানীং যদিও বা কিছুটা স্বীকৃত, 'ডিগনিটি অব আর্ট' এখনো তেমনভাবে সমাদৃত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু হওয়াটা খুব দরকার। যাঁরা আমাদেরকে নানানভাবে আনন্দ দেন, আমরা যেন তাঁদের শুধুই আমাদের গসিপের বিষয়বস্তু করে না তুলে যথাযোগ্য সম্মান দিতে পারি। শিল্পীর জীবনে গ্ল্যামার থাকবেই। এ প্রসঙ্গে, অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় একবার আমাকে কয়েকটি কথা বলেছিলেন, এখানে সেটা স্মরণ করছি। তাঁর মতে : ফিল্মের সঙ্গে গ্ল্যামার বরাবরই আছে। এটা নতুন কিছু নয়। যেদিন থেকে ফিল্ম-মিডিয়াম তৈরি হয়েছে সেদিন থেকেই আছে। গ্ল্যামারটাকে কোনোমতেই বাদ দেওয়া যাবে না। মিডিয়ামটা এমনই অদ্ভুত যে, অন্ধকারের মধ্যে ডুবে থেকে রুপোলি পর্দায় যে অভিনেতা অভিনেত্রীদের দেখেন দর্শক, তাদের সঙ্গে 'অতিমানবিক' সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দর্শকমনে অভিনেতা-অভিনেত্রী-দের ঘিরে গ্ল্যামারের সূত্রপাত কিন্তু এই অতিমানবিক সম্পর্ক থেকেই। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে এটাকেই নানান দিক থেকে বজায় রাখার চেষ্টা চলে, অনেক ক্ষেত্রে ফেনিয়ে তোলা হয়। কারণ, শুনতে খারাপ লাগলেও বলি, সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রী তো আফটার অল পণ্যবস্তুই! ফিল্মের পর্দায় বিভিন্ন চরিত্রের রূপদানেএই মানুষগুলোকে আমরা জানি একরকম ভাবে,কিন্তু আন্তরিক মেলামেশায় ঘরোয়া ঘনিষ্ঠ পরিবেশে জানা যায়, এঁদের স্ব-স্ব চরিত্রটি। আমার এই লেখার মূল উদ্দেশ্য ছিল সেটাই তুলে ধরা, গল্পের ছলে তার সামান্যও যদি প্রকাশ করতে পারি, তবে সেটাই হবে এই প্রতিবেদনের সার্থকতা।

[শেষ]

ফটো : অর্ধেন্দু রায়

লাইব্রেরিয়ান

শিক্ষিকার মতো লাইব্রেরিয়ানের চাকরিও মহিলাদের পক্ষে বেশ আকর্ষণীয় এবং সম্মানজনক। স্কুল, কলেজ, ব্যাঙ্ক, রিসার্চ ইন্সটিটিউট, সরকারি এবং বেসরকারি অফিস – সর্বত্রই লাইব্রেরির প্রয়োজন আছে। এমন কি, পল্লীগ্রামে সাধারণ পাঠাগারও গজিয়ে উঠছে দিনে দিনে। সেইসঙ্গে 'লাইব্রেরিয়ান'-এর চাকরির সম্ভাবনাও উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে।

'লাইব্রেরিয়ান' পদে মেয়েরা বেশ উপযুক্ত এবং কাম্য। মেয়েদের মধ্যে যাঁরা একটু সুশ্রী অথচ পরিশ্রমী তাঁদের এই চাকরিতে সুযোগও অনেক।

লাইব্রেরিয়ানের কাজ হচ্ছে নানা ধরনের বইয়ের শ্রেণীবিভাগ করা এবং 'ক্যাটালগ' তৈরি করা। তাছাড়াও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রকাশিত বই থেকে নানা তথ্য আহরণ করা, যেগুলি তাঁর নিয়োগ কর্তৃপক্ষের কাজে লাগবে। এককথায়, আধুনিক পন্থায় লাইব্রেরির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর প্রধান কাজ। ছোট ছোট পাঠাগারে লাইব্রেরিয়ানকে গ্রাহকদের বইও 'ইস্যু' করতে হয়। বড় লাইব্রেরিতে অবশ্য লাইব্রেরিয়ান ছাড়াও সহকারি লাইব্রেরিয়ান বা 'লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট'ও থাকেন।

যোগ্যতা

গ্রাজুয়েট (বি.এ /বি.এস.সি /বি.কম ইত্যাদি)

কোথায় কোথায় পড়ানো হয়, জানতে চান? ভারতের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েই লাইব্রেরি সায়েন্স-এ ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমা পড়ানো হয়। তার তালিকা নিচে দেওয়া হল –

১। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় – ১ বছরের ডিপ্লোমা

২। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় – ২ বছরের ডিগ্রি কোর্স

৩। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় – ২ বছরের ডিগ্রি কোর্স।

৪। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় – ১ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স।

৫। বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় – ১ বছরের ডিগ্রি কোর্স।

৬। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় – ১ বছরের ডিগ্রি কোর্স।

৭। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় – ১ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স।

৮। জয়পুর বিশ্ববিদ্যালয় – ১ বছরের ডিগ্রি কোর্স।

৯। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় – ২ বছরের ডিগ্রি কোর্স।

(মহীশূরে গ্রাজুয়েট লেভেলে 'লাইব্রেরি' থাকা চাই)

১০। SNDT Women's University, Bombay – ২ বছরের ডিগ্রি কোর্স এবং ১ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স

১১। বেনারস ইউনিভার্সিটি – ন'মাসের ডিগ্রি কোর্স
৯ মাসের পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স

১২। বরোদা ইউনিভার্সিটি – ১ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স

এছাড়াও নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানেও লাইব্রেরি সায়েন্স ও এ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় –

(১) ন্যাশনাল লাইব্রেরি, বেলভেডিয়ার, আলিপুর

(২) পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন, ১৩৪, নিউ সি.আই.টি. রোড, কলকাতা – ১৪

(৩) ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স ডকুমেন্টেশন সেন্টার, কলকাতা

(৪) ডকুমেন্টেশন রিসার্চ ট্রেনিং সেন্টার, বোম্বে



রিজিওন্যাল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে মহিলা কর্মপ্রার্থীদের ভিড়

সিনিয়ার 'লাইব্রেরিয়ান' পদে চাকরি পেতে গেলে অনেক সময় documentation-এ বিশেষ প্রশিক্ষণ দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকারি দপ্তরে লাইব্রেরিয়ানদের বেতন-ক্রম এইরকম –

(১) লাইব্রেরিয়ান – ৭০০–৪০–১১০০–৫০–১২৫০ টাকা + ভাতা

(২) সহকারি লাইব্রেরিয়ান – ৩৫০–১৫–৫০০–২০–৬০০ টাকা + ভাতা

বয়স – ৩০ বছরের মধ্যে হওয়া চাই।

সরকারি সংস্থা (public sector undertaking) এ –

(১) লাইব্রেরিয়ান – ৭০০–১৩০০ + ভাতা + অন্যান্য সুবিধা।

(ক) যোগ্যতা – B.A./B.Sc/B.Com + লাইব্রেরি সায়েন্সে ডিপ্লোমা।

(খ) অভিজ্ঞতা – পাঁচ বছর (বড় সংস্থায় কাজ করা চাই)

(গ) বয়স – ৩০ থেকে ৩৫ বছর।

সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থায় লাইব্রেরিয়ান পদ অফিসার তুল্য।

(২) অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান – ৫৫০–২৫–৭৫০–৩০–৯০০ টাকা + DA

(ক) বয়স – ৩০ বছর

(খ) যোগ্যতা – লাইব্রেরি সায়েন্সে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি।

(গ) অভিজ্ঞতা – ডিপ্লোমা প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে তিন বছর।

বেসরকারি সংস্থায়, ব্যাঙ্কে, রিসার্চ কেন্দ্রে, বাণিজ্যিক কোম্পানীতে প্রচুর লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ করা হয়। এইসব স্থানে তাঁদের 'অফিসার' মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে।

(১) লাইব্রেরিয়ান – ১২০০–৭০–১৫০০–৭৫–২০০০ (প্রথম মাসেই ১৭০০ টাকা)

(ক) যোগ্যতা – অর্থনীতি/বাণিজ্যে স্নাতক/লাইব্রেরি সায়েন্সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ।

(খ) বয়স – ৩৫ বছর।

(গ) কোনো বড় লাইব্রেরিতে পাঁচ বছরের কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকা চাই।

এইপদে Indian National Science Documentation Centre, Calcutta/Documentation Research Centre, Bombay-র ডিপ্লোমা থাকলে ভালো হয়।

(২) সহকারী লাইব্রেরিয়ান – ৭০০–৪০–৯০০–৫০–১১০০ E.B.–৬০–১৮০০ টাকা + ভাতা

(ক) যোগ্যতা – অর্থনীতি/বাণিজ্যে গ্রাজুয়েট অথবা লাইব্রেরি সায়েন্সে সার্টিফিকেট।

(খ) বয়স – ৩০ বছর।

(গ) লাইব্রেরিতে ৩ বছরের কাজ করার অভিজ্ঞতা চাই।

বি.দ্র. এ-সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন হলে S.V.G.O.-এর সঙ্গে দেখা করুন ৬৭, বেন্টিক স্ট্রিট, ৫ম তল, কলকাতা। সময় – ১১টা থেকে ৫টা পর্যন্ত, মঙ্গল/বৃহস্পতিবার।

কর্মখালির বিজ্ঞপ্তি

১। বোস ইনস্টিটিউট, পি-১/১২ সি.আই.টি. রোড,
স্কীম VIIM, কলকাতা ৫৪ থেকে রেজিস্ট্রার জানাচ্ছেন: তাঁরা নেবেন জুনিয়র লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট।

বয়স – ৩০ বছরের মধ্যে

বেতনক্রম – ৪৫০–১০০০ টাকা

'নির্দিষ্ট ফর্মে' উপরোক্ত ঠিকানায় দরখাস্ত করতে হবে। ১টাকা পোস্টাল অর্ডার জমা দিলে নির্দিষ্ট ফর্ম পাবেন। Payable to Bose Institute, Calcutta. ডাকে নিতে হলে পদের নাম এবং বিজ্ঞাপন নং Admn 4/85 লিখতে হবে। তার সঙ্গে self addressed খাম।

অসিতকুমার চৌধুরী

পরবর্তী আলোচনা – টেলিফোন অপারেটর

সংক্ষিপ্ত পাক্ষিক রাশি ও লগ্নফল

১৬ – ৩০ এপ্রিল ১৯৮৫

মেষ ঃ প্রিয়-পরিজনদের নিয়ে মোটামুটি সুখেই কাটবে। তবে শরীরের ব্যাপারে ভালমন্দ মেশানো ফল ভোগ করতে হবে। প্রণয়ের ক্ষেত্রে শুভ ফল আশা করা যায়। শুভ তারিখ – ২২, ২৩, ২৮ ও ৩০। মেষ লগ্নের জাতিকার দুর্বলতা বৃদ্ধির যোগ আছে। শারীরিক অসুস্থতা।

বৃষ ঃ অকারণে পরিবারের কিছু ঝামেলা মনকে বিব্রত করবে। নতুন কোনো কর্মোদ্যোগে লাভের প্রত্যাশা করা যেতে পারে। প্রণয়ে সফলতা আসবে। শুভ তারিখ – ২০, ২১, ২৭ ও ২৯। বৃষ লগ্নে জাতিকার আত্মীয়-বন্ধুসহ সুখেই কাটবে এ পক্ষটা।

মিথুন ঃ যে কোনো তুচ্ছ কারণে উত্তেজিত হওয়ার ফলে শারীরিক ক্ষতি ও আঘাতপ্রাপ্তির যোগ আছে। অবিবাহিতদের প্রেমে মন কিছুটা চঞ্চল হবে। শুভ তারিখ – ১৬, ২৩ ও ২৯। মিথুন লগ্নের জাতিকার শারীরিক অশুভ, তবে আর্থিক চিন্তা কিছুটা দূর হবে।

কর্কট ঃ গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় থাকলেও আপনাকে কিছু কাবু করতে পারে রক্তচাপ-বৃদ্ধি। পারিপার্শ্বিক শত্রুতা চলবে। প্রেম ও কর্মক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় কিছুটা শুভ। শুভ তারিখ – ১৭, ১৯ ও ২৩। কর্কট লগ্নের জাতিকার কোনো রোগে হঠাৎ নাজেহাল হতে হবে।

সিংহ ঃ মানসিক দৃঢ়তায় সবরকমের প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেন। সম্ভাব্যস্থলে বিবাহের যোগ আছে। সন্তানের জন্য চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। শুভ তারিখ – ১৯, ২০, ২৯ ও ৩০। সিংহ লগ্নের জাতিকার মানসিক অশান্তি চলবে। স্বামী ও সন্তান সচেষ্ট হলে আর্থিক শুভ ফল।

কন্যা ঃ অহেতুক বিষণ্ণতা ও শারীরিক দুর্বলতায় আক্রান্ত হতে পারেন। হঠাৎ রক্তপাত ও মানসিক আঘাতপ্রাপ্তির যোগ আছে। প্রেমের ক্ষেত্রে বদনাম রটতে পারে। শুভ তারিখ – ২১, ২৩ ও ৩০। কন্যা লগ্নের জাতিকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও অযথা মানসিক কষ্ট হবে।

তুলা ঃ পারিবারিক ব্যাপারে দুশ্চিন্তা। শারীরিক কারণে মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। সম্ভাব্যস্থলে বিবাহের যোগাযোগ হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধির যোগ আছে। শুভ তারিখ – ২৩, ২৪ ও ২৯। তুলা লগ্নের জাতিকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া ব্যাপারে সাবধান। দায়িত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক ঃ পারিবারিক জটিলতা দূর হবে, তবে কোনো সন্তানের দুর্ব্যবহারে মানসিক ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হতে পারে। শরীর পূর্বের তুলনায় ভাল। সম্ভাব্যস্থলে বিবাহের যোগাযোগ আছে। শুভ তারিখ – ১৬, ২৩, ২৬ ও ৩০। বৃশ্চিক লগ্নের জাতিকারা কারোর সাহায্য লাভ করতে পারেন।

ধনু ঃ পারিবারিক অযথা অশান্তির চাপ আপনার উপর পড়বে। শরীর পূর্বের তুলনায় কিছুটা ভাল। আর্থিক ব্যাপারে চিন্তা থাকবে। সন্তানের জন্য মানসিক অশান্তি ঘটতে পারে। শুভ তারিখ – ১৬, ১৮ ও ৩০। ধনু লগ্নের জাতিকার শারীরিক ও আর্থিক কিছুটা শুভ। দাম্পত্যসুখ কিছুটা বিঘ্নিত হবে।

মকর ঃ পারিবারিক অশান্তি ও আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে অযথা মতবিরোধে ক্ষতির আশঙ্কা। প্রেমের ক্ষেত্রে চিন্তা করে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। সন্তানের জন্য মানসিক ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হতে পারে। শুভ তারিখ – ১৬, ২০ ও ২৯। মকর লগ্নের জাতিকারা নিজগুণে বহু সমস্যা থেকে অব্যাহতি পাবেন।

কুম্ভ ঃ পারিবারিক ক্ষেত্রে শুভাশুভ মিশ্র ফললাভ। শারীরিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে মনের প্রসন্নতা নষ্ট হবে। কোনো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। অবৈধ প্রণয় থেকে সাবধান। শুভ তারিখ – ১৬, ২১, ২৮ ও ৩০। কুম্ভ লগ্নের জাতিকারা কোনো আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন।

মীন ঃ পারিবারিক অচলাবস্থা দূর হবে। শরীর কিছু ঝামেলা বাধাবে। চর্ম ও পাকস্থলীর রোগ সম্পর্কে সাবধান। আত্মীয় বিরোধিতা ও কলহ হতে পারে। কোনো ব্যক্তির সাহায্য লাভ করতে পারেন। শুভ তারিখ – ২৬, ২৭ ও ২৯। মীন লগ্নের জাতিকার আর্থিক টানাটানি কিছুটা দূর হবে। মূল কোষ্ঠীতে যদি শুভ থাকে তাহলে কর্মক্ষেত্রে সুপরিবর্তনের ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীগৌতম
ভক্তিসিদ্ধান্ত ভারতী

এ পক্ষের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান

মঞ্চ

১৬ এপ্রিল ঃ শিশির মঞ্চে মিত্রায়ন সংস্থার নৃত্যনাট্য, মুক্তাঙ্গনে অজান্তিক নাট্যসংস্থার নাটক ভূষণ্ডীর মাঠ, বিজন থিয়েটারে নাট্যধারা গোষ্ঠীর নাটক।

১৭ এপ্রিল ঃ রবীন্দ্রসদনে নাট্যার্য সংস্থার নাটক, অ্যাকাডেমিতে থিয়েটার ক্যাম্প-এর নাটক, বিজন থিয়েটারে বিনোদন গোষ্ঠীর নাটক।

১৮ এপ্রিল ঃ রবীন্দ্রসদনে সুরদাস সংগীত সম্মেলন শীর্ষক শাস্ত্রীয় সংগীতের আসর, অ্যাকাডেমিতে নান্দীকার-এর নাটক।

১৯ এপ্রিল ঃ রবীন্দ্রসদনে সুরদাস সংগীত সম্মেলন শীর্ষক শাস্ত্রীয় সংগীতের আসর, অ্যাকাডেমিতে থিয়েটার ওয়ার্কশপের নাটক,

২০ এপ্রিল ঃ রবীন্দ্রসদনে সুরদাস সংগীত সম্মেলন শীর্ষক শাস্ত্রীয় সংগীতের আসর, অ্যাকাডেমিতে পি. এল. টি.-র নাটক, মুক্তাঙ্গনে শৌভনিক-এর নাটক রামনাম কেবলম্।

২১ এপ্রিল ঃ রবীন্দ্রসদনে সকালে চিলড্রেন আর্ট থিয়েটার-এর অনুষ্ঠান – সন্ধ্যায় গীতমালিকা সংস্থার অনুষ্ঠান, অ্যাকাডেমিতে সকালে নান্দীমুখ-এর নাটক – সন্ধ্যায় বহুরূপীর নাটক।

২২ এপ্রিল ঃ অ্যাকাডেমিতে নাট্যায়ন-এর নাটক, শিশির মঞ্চে মৌনমুখর সংস্থার অনুষ্ঠান

২৩ এপ্রিল ঃ অ্যাকাডেমিতে চেতনা-র নাটক, শিশির মঞ্চে বাণীদীপা সংস্থার সংগীতানুষ্ঠান, মুক্তাঙ্গনে থিয়েটার ফোরাম-এর নাটক জরিপ।

২৪ এপ্রিল ঃ রবীন্দ্রসদনে সায়ক-এর নাটক, অ্যাকাডেমিতে শূদ্রক-এর নাটক, শিশির মঞ্চে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

২৫ এপ্রিল ঃ অ্যাকাডেমিতে সমকালীন শিল্পীদল-এর নাটক পরদেশী অয়দিপউস।

২৬ এপ্রিল ঃ অ্যাকাডেমিতে সন্দীপন-এর নাটক, মুক্তাঙ্গনে বেঙ্গল আর্ট কালচার-এর নাটক খুবাই।

২৭ এপ্রিল ঃ রবীন্দ্রসদনে হীরেন ঘোষ স্মৃতি সংসদ-এর অনুষ্ঠান, অ্যাকাডেমিতে নান্দীকার-এর নাটক, মুক্তাঙ্গনে শৌভনিক-এর নাটক।

২৮ এপ্রিল ঃ রবীন্দ্রসদনে সকালে খোয়াই-এর অনুষ্ঠান – সন্ধ্যায় নিবেদন-এর অনুষ্ঠান, অ্যাকাডেমিতে সকালে গান্ধার-এর নাটক – সন্ধ্যায় চেনামুখ গোষ্ঠীর নাটক।

২৯ এপ্রিল ঃ রবীন্দ্রসদনে পঞ্চবটী সংস্থার অনুষ্ঠান, অ্যাকাডেমিতে বহুরূপীর নাটক, শিশির মঞ্চে চিলড্রেন কালচারাল ফোরাম-এর নাটক।

৩০ এপ্রিল ঃ মুক্তাঙ্গনে থিয়েটার ফাইন-এর নাটক, বিজন থিয়েটারে অনামিকা থিয়েটার ইউনিট-এর নাটক।

বেতার

১৬ এপ্রিল ঃ কমলা বসুর রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, অপরাজিতা ঘোষের খেয়াল সকাল ৮-৩০।

১৭ এপ্রিল ঃ অরবিন্দ বিশ্বাসের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০।

১৮ এপ্রিল ঃ রূপু বড়ালের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সেতার সকাল ৮-৩০।

১৯ এপ্রিল ঃ বৈতানিক সংস্থার রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, কুমার মুখোপাধ্যায়ের খেয়াল সকাল ৮-৩০, রাত ৮টায় বাংলা নাটক অধিকারিণী, রচনা – নরেন্দ্র মিত্র, নাট্যরূপ – শ্রীধর ভট্টাচার্য, প্রযোজনা – সমরেশ ঘোষ।

২০ এপ্রিল ঃ গীতা ঘটকের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, মিলি বসুর বেহালা বাদন সকাল ৮-৩০, বিজয়কুমার কিচলুর খেয়াল দুপুর ১-০০।

২১ এপ্রিল ঃ তমালিকা গুহর খেয়াল সকাল ৭-৪০, পূর্ণিমা সেনের খেয়াল সকাল ৮-৪০, দুপুর ২-৩৫এ বাংলা নাটক।

২২ এপ্রিল ঃ প্রজ্ঞাপারমিতা রায়ের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, নিসার হোসেন খাঁর খেয়াল রাত ৯-০০।

২৩ এপ্রিল ঃ দক্ষিণীর রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, সমরেশ চৌধুরীর খেয়াল সকাল ৮-৩০।

২৪ এপ্রিল ঃ কেয়া মজুমদারের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, বিমল মুখোপাধ্যায়ের সেতার সকাল ৮-৩০, গোলাম আকবর খাঁর খেয়াল রাত ৯-০০।

২৫ এপ্রিল ঃ হেনা সেনের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, শচীনদাস মতিলালের খেয়াল সকাল ৮-৩০, রাত ১০-১৫তে বাংলা নাটক – অতিথি (আরব্য উপন্যাস অবলম্বনে), রচনা – তারাপদ রাহা, সংগীত পরিচালনা – প্রবীর মজুমদার, প্রযোজনা – অজিত মুখোপাধ্যায়।

২৬ এপ্রিল ঃ গীতা সেনের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০।

২৭ এপ্রিল ঃ চিত্রলেখা দত্তের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, সুনীলকুমার চক্রবর্তীর সেতার সকাল ৮-৩০, বিকেল ৩টায় বাংলা নাটক।

২৮ এপ্রিল ঃ কৃষ্ণা গুহঠাকুরতার রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, ঊষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের খেয়াল সকাল ১০-৫০, দুপুর ২-৩৫ এ বাংলা নাটক।

২৯ এপ্রিল ঃ প্রতিমা মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, শক্তি ঠাকুরের আধুনিক গান রাত ১০-৫০।

৩০ এপ্রিল ঃ ভারতী মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, কমল বসুর খেয়াল সকাল ৮-৩০।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোন ঃ ২৪-০১৯৯) থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, রেজিঃ অফিস, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ঃ ২৭-২১৬৯, ২৭-৯২৯২, ২৭-৯৩১১, ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১, Telex 021-5092 IPPL IN



যে টিপের বাহারে সবাই বলে আহা রে!
শিল্পা
স্টিকার টিপ
★ আমদানি করা ম্যাট ফিনিশের ভেলভেটের মত মসৃণ বাহার কুমকুম টিপের মতই চমৎকার
★ ছিমছাম সুন্দর কাটা
★ আর লাগানো যায় যত খুশি বার
★ দর্শনীয় প্যাক এতই সুন্দর সবারই মনোহর
★ টিপ্‌স অ্যান্ড টোজ্ কসমেটিক্স দ্বারা তৈরী করা, যাদের ওপর আপনাদের অগাধ আস্থা
★ আপনার সৌন্দর্য বাড়ায়.. নানান রঙ ছটায়
ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষিত,
ত্বকের জন্যে
নিরাপদ গঁদ যুক্ত
Shilpa
STICKER BINDI

SUKANYA 16 APRIL 1985 Regn. No. 42166/84 — RNI Postal Regn. No. WB/CC — 423 Rs. 3.50

